মৈত্রেয়ী দেবী

ন হন্যতে

আকাডেমী পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থ

আবেদন

Nook, Kindle, Kobo বা ট্যাব ছাড়া ই বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি, যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোনো অবসরেই পড়ে ফেলা যায়, আলাদা করে ই-বুক রিডার (Nook, Kindle, Kobo) কেনার কোন-ও প্রয়োজন নেই বা pdf এর মতো জুম করে ডান / বাম দিকে সরিয়ে পড়ার ও দরকার নেই, কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের pdf যাওবা পাওয়া যায়, epub অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে)ছড়িয়ে দিতে হবে॥

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ, ভূমিকা (যদি থাকে) ইত্যাদি প্রথম দিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই ভাবতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে॥

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের pdf নামিয়ে text এ রূপান্তরিত করা, এ কাজে vFlat এর এখনো কোনো জুড়ি নেই। এবার একে ms-word বা অন্য কিছুতে edit করে calibre এর সাহায্যে epub - এটাই সহজ পদ্ধতি॥

vFlat এর সাহায্যে pdf থেকে তৈরী, ভুল থাকলে জানান।

বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই পাওয়া যায়। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক, শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিক ভাবে বিতরণের জন্য নয়॥

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

এই আত্মা জন্মরহিত শাশ্বত ও পুরাতন
শরীরকে হনন করিলেও ইনি নিহত হন না

ন হন্যতে

আকাদেমী পুরস্কারে সম্মানিত এ কালের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

মৈত্রেয়ী দেবী

প্রাইমা পাবলিকেশনস্

৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড ।। কলিকাতা-৭০০০০৭

কপিরাইট : রূপা সেন

প্ৰথম প্ৰকাশ : অক্টোবর, ১৯৭৪

সপ্তম মুদ্ৰণ : মে, ১৯৮৩

অষ্টম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫

নবম মুদ্রণ : এপ্রিল, ১৯৮৭

দশম মুদ্রণ : মে, ১৯৮৮

একাদশ মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯

দ্বাদশ মুদ্রণ : নভেম্বর, ১৯৯০

ত্রয়োদশ মুদ্রণ : মে, ১৯৯২

চতুর্দশ মুদ্ৰণ : আগষ্ট, ১৯৯৩

পঞ্চদশ মুদ্রণ : জুলাই, ১৯৯৫

ষোড়শ মুদ্রণ : এপ্রিল, ১৯৯৭

সপ্তদশ মুদ্রণ : জানুয়ারী, ১৯৯৯

অষ্টাদশ মুদ্ৰণ : মে, ২০০০

ঊনবিংশ মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০০১

বিংশ মুদ্রণ : নভেম্বর, ২০০২

একবিংশ মুদ্রণ : মার্চ, ২০০৫

প্রকাশকঃ উপমা সেনগুপ্তা

প্রাইমা পাবলিকেশনস্

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্ৰক : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পীঃ সত্যজিৎ রায়

দাম পঁয়তাল্লিশ টাকা

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

উপন্যাসের কোনো ভূমিকার প্রয়োজন নেই, সে তার নিজের কথা নিজেই বলে। তবু আমাকে একটু কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছে। এ বইতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও এমন অনেকের নাম উল্লেখ করেছি যাঁরা একদিন জীবিত ছিলেন। এই কাহিনী গড়ে তোলবার জন্য তাঁদের প্রকৃত নাম উল্লেখের হয়ত তেমন সার্থকতা নেই। শুধু আমি একটি যুগের ছবি আঁকতে চাইছিলাম, যে যুগ এইসব যুগপুরুষ ও অসামান্যা নারীদের উপস্থিতিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল কোনো কাল্পনিক নাম ব্যবহার করে সেই যুগটি আমার কাছে সত্য হচ্ছিল না।

১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে বইটা লেখা হয়েছে, মাত্র দু'মাস আগে পাণ্ডুলিপি ছাপতে দিয়েছি। খুব শখ হয়েছিল পূজার আগে বইটি প্রকাশ হবে। প্রকাশক মশাই আমায় বলেছিলেন এত দ্রুত কাজ ভাল হয় না। কিন্তু আমার অতি আগ্রহবশত আমিই তাড়া করে দু’মাসের মধ্যে বাইশ ফর্মা বইটা ছাপিয়ে ফেললাম—ফলে দু-চারটি মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেল, যার জন্য প্রকাশক দায়ী নন, দায়ী আমি।

২রা অক্টোবর, ১৯৭৪ **মৈত্রেয়ী দেবী**

মৈত্রেয়ী দেবীর

অন্যান্য গ্রন্থ

মংপুতে রবীন্দ্রনাথ
রবীন্দ্রনাথ গৃহে ও বিশ্বে
হিরণ্ময় পাখি (কাব্যগ্রন্থ)
চীনে ও জাপানে
স্বর্গের কাছাকাছি

আমার মা

স্বর্গীয়া হিমানীমাধুরী দাসগুপ্তাকে

—১৫ই ভাদ্র, ১৩৮১

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭২

আজ আমার জন্মদিনের উৎসবে তোমরা এসেছিলে পার্বতী ও গৌতমী। তোমরাই উৎসব করেছিলে কিন্তু তোমরা জানতে না, তখনই—ঠিক তখনই, যখন এ ঘরে গান হচ্ছিল, গল্প হচ্ছিল, আমি হাসছিলাম, তখন আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছিলাম। সময়ের প্রবাহ আমার মনের মধ্যে উত্তাল, আমাকে তা ছুঁয়েছিল, আমি চলেছিলাম, চলেছিলাম ভবিষ্যতে নয় অতীতে।

এখন মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেছে, হয়তো দুটো বাজে—আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি—এখান থেকে পূর্ণ আকাশ দেখা যায় না, আধখানা সপ্তর্ষি অনন্ত প্রশ্নের মতো আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। প্রশ্ন, প্রশ্ন, প্রশ্ন, আজ এই প্রশ্ন কত যুগ পার হয়ে আবার কেন মনে এল? কেন আমার জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটল যার কোনো প্রয়োজন ছিল না? আবার দেখছি এর আরম্ভও নেই, শেষও নেই।

আকাশের তারাগুলি উজ্জ্বল, কত মানুষের কত যন্ত্রণার সাক্ষী ওরা। আমার সমস্ত মন ঐ আকাশটা টানছে— আমি যেন এখানে নেই,—এখানে নেই অথচ আমি তো এখানেই। এখান থেকে কি কোথাও যেতে পারি—এই তো আমার পরিচিত সংসার। শোবার ঘরে আমার স্বামী নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন। কী নিঃসংশয় আমার সম্বন্ধে, আমাকে উনি ভালোমতো চেনেন না, অথচ কী গভীর ভালোবাসেন, কী বিশ্বাস আমার উপরে! আমিই ওঁর সব। ওঁর পৃথিবীটা ঘুরছে আমাকে কেন্দ্র করেই, কিন্তু উনি যে আমার সব নয় একথা নিশ্চয়ই উনি কোনো একরকম করে জানেন, তবু তাতে ওঁর কোনো ক্ষোভ নেই। ক্ষোভ নেই আমারও। আমার জীবন নানাদিক থেকে কানায় কানায় পূর্ণ। সংসারকে যা দেবার ছিল, মনে হয়েছিল তা দিতে পেরেছি, ভালোবাসার যে মহিমা, মনে হয়েছিল তাও জানি, শ্রদ্ধা ও পূজার সঙ্গে মিশে তার অলৌকিক ঊর্ধ্বগামী নিবেদন আমার গুরুর প্রতি, আমাকে কৃতার্থ করেছে। তবু কাল থেকে আমার জীবনের আস্বাদ কি করে এমন বদলে গেল? কী দারুণ অতৃপ্তি, এক ধূ ধূ

সাহারার বালির আঁচলের মতো আমার শস্যশ্যামল সুন্দর পৃথিবীর উপর বিছিয়ে গেল! আমি জানি ওর নিচে সব আছে, ঠিক যেমনটি ছিল তেমনি। এখনও ওঁর অবচেতনে আমি তেমনি সত্য—আর উপরে মা-বাবার কোলের কাছে ঘুমিয়ে আছে আমার নাতি, কাল সকালে সে যখন নেমে আসবে, তখন তার নরম ছোট্ট হাত আমাকে তেমনি করে জড়িয়ে ধরবে—আমার পৃথিবী তেমনি আছে কোমল সজীব সবুজ। তবু এর উপর গলিত লাভা গড়িয়ে আসে কেন, আমার মুখে যে গরম বাতাসের তাপ লাগে। না, না, লাভা নয়, গলিত স্বর্ণও হতে পারে—এ তো ফিরিয়ে দেবার নয়, এতে যে আনন্দ আছে, এর যে মূল্য আছে। আমি জানি, এ ছাই হয়ে যাবে না, কারণ, 'ছাই হয়ে গিয়ে, তবু বাকি যাহা রহিবে' এ সেই অবশিষ্ট।

তবু আজ দুদিন থেকে কী কষ্ট, কী ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছি আমি। কি রকম কষ্ট? 'রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্' যে রকম মন ব্যাকুল হয়, জননান্তর সৌহৃদানি মনে পড়ে—'পর্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিতোহপি জন্তুঃ' সেই রকম কি? তাও তো নয়, এ তো জন্মান্তরের কথা নয়—এ তো এই সে দিনের কথা, মাত্র বেয়াল্লিশ বছর আগের কথা। মাত্র বেয়াল্লিশ বছর আমি পার হয়ে ফিরে গেছি—মানুষের কাছে এ অনেক সময়, কিন্তু অনন্তের কাছে?

সময়ের তো অবস্থান নেই, তার সামনেই বা কি, পিছনেই বা কি, পাশেই বা কি? তার উদয় অস্ত কোথায়—শুধু আমার সম্বন্ধে অনাদি অনন্ত মহাকাল খণ্ডিত—শুধু আমাকে প্রকাশের জন্য সে সীমাবদ্ধ, কিন্তু আজ হঠাৎ বেয়াল্লিশ বছরের গণ্ডী সে তুলে নিয়েছে—আমি মহাকালে অনুপ্রবিষ্ট—আমার সামনে পিছনে নেই—আমি স্থির ধ্রুব দাঁড়িয়ে আছি এই ১৯৭২-এ পা রেখেও ১৯৩০ সালে।

ঘটনাটা ঘটল কি করে, ঘটল কোন তারিখে?

১৯৭২ সালে ১লা সেপ্টেম্বর সকালে। আগের দিন আমার ছেলেবেলার বন্ধু গোপাল আমাকে ফোন করে বললে, "অমৃতা, তোমার ইউক্লিডকে মনে আছে?"

"হ্যা, একটু একটু—কেন?"

"ওদের দেশ থেকে একজন ভদ্রলোক এসেছেন, তার পরিচিত, ইউক্লিড তোমার বাবার ছাত্র, তা তিনি তো আর নেই, তাই তোমার সঙ্গেই এ ভদ্রলোক দেখা করতে চান।"

একটা ছোট্ট আনন্দের বিদ্যুৎ আমার শরীর মনের ভিতর এক মুহূর্তের জন্য ছুঁয়ে গেল।

গোপাল টেলিফোনের ওপার থেকে তাড়া দিচ্ছে—"চুপ করে কেন? ওকে নিয়ে আসব?"

"ন্-না আমিই যাব, ওর ঠিকানাটা দাও।"

সেদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছিল। কোনোমতে একটা ট্যাকসি জোগাড় করে গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হলাম। ভাবছি কেন বা এলাম! যে চিঠি লিখলে উত্তর দেয় না, তার খবর জেনে আমার কি হবে? কিন্তু কৌতূহল ছাড়তে চায় না। আমি ভাবছি আমি কৌতূহলী, পরিচিত একজনের খবর জানতে চাওয়া খুব কি অন্যায়?

সত্যভাষণের খাতিরে বলতেই হবে সাধারণ মেয়ের মতো আমি একটু সেজেও নিয়েছি, একটা ভালো কাপড় পরেছি। তবু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বড় দুঃখ হচ্ছে, চেহারাটা বড়ই খারাপ হয়ে গেছে। মহাকালের দাপটে কিছুই থাকে না—সব ভেঙ্গে চুরে জীর্ণ করে দেবে—কিন্তু তাই কি? কাল কি শুধু পুরানোই করে, নূতন করে না? চেহারাটা আমার পুরানো হয়ে গেছে বটে, কিন্তু মন? যে-মন আজ মির্চা ইউক্লিডের কথা জানতে চাইছে—সেই কৌতূহলী উৎসুকী মন নূতন, এও কালের সৃষ্টি। একদিন লিখেছি—

"যে কাল পিছনে ছিল
সে কাল সমুখে ফিরে আসে—
অনবগুণ্ঠিত মুখে তারকাখচিত পট্টবাসে—
কে তারে ভূষণ দিল, দিল অলঙ্কার
ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্যের বসন্তবাহার?
স্পর্শহীন স্রোতে তার রূপহীন আবেগে অতুল
কে ফোটাল ফুল?
শূন্যের সমুদ্র হতে নিমেষে নিমেষে ধরে কায়া
বেলাহীন বেলাতটে তরঙ্গের মৃত্যুময়ী মায়া।"

যখন লিখেছিলাম তখন জানতাম না পিছন কি করে সামনে আসে—পুরানো নূতন হয়, বা নূতন পুরানো বলে ভাবাটাই একটা ভ্রম মাত্র!

গাড়িতে বসে আমি হাসছি—আমার বেশ মজা লাগছে, কাণ্ডটা দেখ, আমার সাজবার দরকার কি ছিল? চেহারা নিয়েই বা আক্ষেপের কারণ কি? মির্চা ইউক্লিডের সঙ্গে তো আর আমার দেখা হচ্ছে না, দেখা হবে তার দেশের একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে!

দরজাটা খোলাই ছিল। লোকটি টেবিলের উপর ঝুঁকে লিখছিল। তার রঙ তামাটে, ইয়োরোপীয়দের মতো সাদা নয়, শরীর নাতিদীর্ঘ, মুখে বুদ্ধির ছাপ। আমার সাড়া পেয়ে সে উঠে দাঁড়াল, বললে, "আমি সেরগেই সেবাস্টিন।" তারপর হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার ডান হাতখানি ধরে তার পল্লবের উপর চুম্বন করলে, এ ওদের দেশের রীতি। এই অতি পরিচিত ভঙ্গী যেন বহুবিস্মৃত যুগের পদশব্দের মতো মনে হল। "তুমি অমৃতা?"

আমি জানি এই বিদেশী ব্যক্তিটি যার কথা বলছে, আমার দিকে তাকিয়ে যাকে সে দেখছে, সে আজকের ১৯৭২ সালের অমৃতা নয়। যে বিস্ময় তার ঐ ক্ষুদ্র প্রশ্নে ধ্বনিত, সে আজকের অমৃতাকে দেখে জাগবে না। আজ তার মুখে

বলিরেখা, চুলে সাদা রঙ, দেহ সৌষ্ঠবহীন, ও দেখছে স্থির দৃষ্টিতে, আমাকে পার হয়ে সে দেখা চলে গেছে বহুদূর, ও দেখছে ১৯৩০ সালের অমৃতাকে।

"তুমি আমাকে চেন?"

"তোমাকে আমাদের দেশে সবাই চেনে, তুমি আমাদের দেশে রূপকথার নায়িকা।"

"কেন মির্চার বই?"

"হ্যাঁ, ওর বই। সে তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, তোমার বাবা দিলেন না, তোমরা হিন্দু – সে ক্রিশ্চান।"

"বাজে কথা।"

"কি বাজে কথা?"

"হিন্দু-ক্রিশ্চান ওসব কিছু নয়। তাঁর দম্ভ।"

"আজ বেয়াল্লিশ বছর হয়ে গেল—মাঝে মাঝে শুনেছি ঐ বইয়ের কথা কিন্তু কখনো কাউকে জিজ্ঞাসা করিনি ঐ বইটি কি—উপন্যাস, কবিতা না প্রবন্ধ—আজকে বলো তো বন্ধু —ঐ বইতে কি আছে?"

প্রশ্নটা করে আমি হাসছি। এইতো কত সহজে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম, এতোদিন করি নি কেন? ওতো আর এক অমৃতা। চল্লিশ বছর আগেকার মানুষের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? তার কর্মফল আমাকে কি আর স্পর্শ করে? বারো বছর পরেই তো আর খুনের অপরাধে দণ্ড হয় না। আমার লজ্জাই বা কেন? লজ্জা এইজন্য যে, আমি মরালিস্ট। ন্যায়-অন্যায় উচিত-অনুচিত নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি, আমি কঠিনভাবে বিচার করি। দুর্বলতার প্রশ্রয় দিই না। আমার বন্ধুরাও আমার সামনে তাদের দুর্বলতার গল্প বলে না। আমি সম্মানের উচ্চাসনে বসে আছি, নিজেকেও তো কোনোদিন রেহাই দিই নি। যখনই মির্চার কথা মনে হয়েছে তখনই ভ্রূকুটি করেছি নিজেকে। কেন এমন একটা ঘটনা ঘটল, না ঘটলেই তো ভালো ছিল—তখনই লজ্জা, বিষম লজ্জা আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছে, ওর স্মৃতিকে অবচেতনের গভীরে নির্বাসন দিয়েছি।

কিন্তু আজ কত সহজে একে জিজ্ঞাসা করলুম ঐ বইটার কথা। মনে কোনো সংকোচ নেই।

সেরগেই বললে, "ও বই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস–" লোকটি ভালো ইংরেজি বলতে পারে না, ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে থেমে থেমে বলতে লাগল গল্পটা।

"জানো, ঐ বইতে ভারতবর্ষকে জেনে, কলকাতাকে জেনে, আমাদের দেশের লোক অবাক হয়ে গিয়েছিল।" ওর গলা শুনছি আর পরিচিত নামগুলি মনে পড়ছে, বুকে একটু একটু করে ধাক্কা লাগছে। যেন একটা একটা করে খড়খড়ি খুলছে–ঘরের ভিতর অন্ধকার, কিন্তু জানি ওখানে কি আছে। ওখানে ঢুকতে ইচ্ছে করছে কিন্তু ভয়ে আমার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে।

"সেরগেই, সত্য বলো ঐ বইতে আমার কথা কি আছে?"

ও মৃদু মৃদু হাসছে, তারপর ওর কন্টিনেন্টাল উচ্চারণে 'ত'-এর আধিক্য দিয়ে ও বলল,

"ফাস্ত শী লাভদ্ এ ত্রি– first she loved a tree."

আমি চমকে উঠেছি। বুকের ভিতর দপ্ করে একটা স্মৃতির দীপ জ্বলে উঠল। ঠিক, ঠিক, ঠিকই।–"আরো বলো সেরগেই, এমন কি কিছু আছে যাতে আমি লজ্জা পাব?" সেরগেই মাথা নিচু করে বললে, "সে লিখেছে রাত্রে তুমি তার ঘরে আসতে। অবশ্য আমি তো এতে লজ্জার কিছু দেখছি না।"

আমি তো স্তম্ভিত–"কী সর্বনাশ! কী অন্যায় ! বিশ্বাস কর সেরগেই, এ সত্য নয়, একেবারে সত্য নয়।"

ও আমাকে সাহস দিচ্ছে, "তা বোঝা যায়, তাই তো তোমায় বর্ণনা করতে পারে নি, লিখেছে তুমি অন্ধকারে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছ–ওর তো উপায় ছিল না, ওর যে তখন বড় কষ্ট।"

আমি অসহায় বোধ করছি, যেন জলে পড়েছি। অপ্রিয় সত্যকে গ্রহণ করবার জন্য মনকে প্রস্তুত করতে পারি কিন্তু অপ্রিয় মিথ্যার আঘাত তো অসহনীয়।

অ্যাশ-ট্রেতে সিগারেটটি নির্বাপিত করে এই ভালোমানুষ বিদেশী ব্যক্তিটি বললে, "ক্ষমা কর, আমি তোমায় সবটা বললাম, সত্য কথাই বলতে হল।"

"বলতে পার সেরগেই, কেন সে আমার নাম করে বইটা লিখেছে?"

'তোমার নামের বন্ধন সে এড়াতে পারে নি, তখন যে তার কষ্ট, বড় কষ্ট– তুমি বইটা পড়লে চোখের জলে ভাসবে।"

"তাই বলে এমন একটা মিথ্যা কলঙ্ক দেবে?"

"ওটা তার কল্পনা, তখন তার যন্ত্রণার হাত থেকে উদ্ধারের ঐ একটাই পথ ছিল। তোমাকে তো এখনও ভোলে নি।"

আমার দিশাহারা লাগছে, কি বলব আমি–"আশ্চর্য যুক্তি তোমার সেরগেই, যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া! আর এতই যদি তার ভালোবাসা ছিল তবে আমার বাবার একটি ধমক খেয়েই আমাকে ফেলে চলে গেল কেন? এমন কখনো হয়? শুনেছ কখনো?"

"হয় না? শুনি নি? এরকম দৃষ্টান্ততেই তো ইতিহাস ভরা। তুমি তখন ষোল বছরের একটি মেয়ে ছিলে, সে তেইশ বছরের তরুণ – আহা তোমার বাবা তোমার জীবনটা নষ্ট করে দিলেন।"

আমার শরীর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হল। এ মানুষটা বলে কি! "সেরগেই, তুমি আমার জীবনের কি জানো ! আমার জীবন নষ্ট করে সাধ্য কার! আমার সমৃদ্ধ জীবন। ছেলেমেয়ে নাতি নাতনী নিয়ে আমার আদর্শ সংসার। কত মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি, সম্মান পেয়েছি। সর্বোপরি আমার গুরু, যার সম্বন্ধে তোমার বন্ধুর অত ঈর্ষা, তাঁর আশ্চর্য স্নেহে অভিষিক্ত আমার মন এমন অতীন্দ্রিয় ভালোবাসার সন্ধান পেয়েছে যা বাক্য বা মনের অতীত বস্তু। ঐ একটা তেইশ বছরের ছেলের জন্য আমার এই আটান্ন বছরের জীবনে কোনো স্থান আছে না কি?"

আমি খুব উত্তেজিত হয়ে কথাগুলো বলছি, আমার মাথার মধ্যে শিরা উপশিরা দপদপ্ করছে, আর ভয়ও হচ্ছে, আমার যে বয়স অনেক, স্ট্রোক্ হয়ে যাবে না তো! সেরগেই বিপন্ন মুখে অপ্রস্তুত হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছে।

“না-না, জীবন নষ্ট নয়— জীবন অন্যরকম হতো।”

“তা বলতে পার। অন্য রকম, এই মাত্র!”

“তোমার প্রথম কবিতার বইখানা আমার কাছে আছে। ওকে যখন দেশ ছেড়ে যেতে হল তখন ওর সমগ্র লাইব্রেরী আমি নিয়ে এসেছিলাম, তার মধ্যে তোমার বইখানাও ছিল”

“বল তো কি রকম দেখতে?”

“নীল কাপড়ের শক্ত মলাটে বাঁধান, বড় একটা সোনালী রং-এর ফুলের নক্শা মাঝখানে?”

আমি হাসছি। “কি আশ্চর্য, ঠিক তো। সে যে কতকাল আগের কথা! কি করে জানলে ওটা আমার লেখা বই?”

“শেষের পৃষ্ঠায় তেরছা ভাবে একপাতা থেকে আর এক পাতায় চলে গেছে তোমার হাতের লেখা, তুমি লিখেছ – Mircea Mircea Mircea – I have told my mother that you have only kissed me on my forehead-”

সেরগেই-র মুখের কথাটা শেষ হয়নি— আমার পায়ের তলা শির শির করে উঠল। আমি একটা নিচু চৌকিতে বসে মাটিতে পা ছুঁয়েছিলাম—আমার মনে হল আমার পা আর মাটিতে নেই—এ ঘরের ছাত নেই। আমি শূন্যে মহাশূন্যে চলেছি—অথচ আমি জানি আমি সেরগেই-র দিকে তাকিয়ে আছি, সে মৃদু মৃদু হাসছে, আমিও হাসছি—কিন্তু কী আশ্চর্য সেই শারীরিক অনুভূতি—আমি দ্বিধাবিভক্ত! আমি এখানে, অথচ এখানে নেই। আমি আমাকে দেখতে পাচ্ছি ভবানীপুরের বাড়ির দোতালার বারান্দায়—বারান্দার মেঝেটা সাদা কালো চৌকো চৌকো পাথরে বাঁধানো, যেন সতরঞ্চ খেলার ছক, মসৃণ পাথরের মেঝের উপরে আমি উপুড় হয়ে আছি। আমার হাতে ঐ বইটা। ঐ তো আমি, ঐ তো আমি—আমি আমাকে দেখতে পাচ্ছি, আমার বুকের মধ্যে হঠাৎ জলপ্রপাতের শব্দে সেদিনের কান্না ফিরে এসেছে—কি আশ্চর্য, আমি কিন্তু সেরগেই-র সঙ্গে কিছু একটা কথা বলছি। সে তার পরিষ্কার উত্তর দিচ্ছে। আমার হাত চেয়ারের হাতলে কিন্তু আমি সেই পাথরের মেঝের মসৃণ স্পর্শ পাচ্ছি—আমার সামনে খোকা দাড়িয়ে আছে। আমি তার নোংরা নখওলা পায়ের

আঙুলগুলো দেখতে পাচ্ছি—ময়লা ধূতির একটা অংশ মাটি ছুঁয়ে আছে। এটা তো একটা সকাল! বোধ হয় ২০শে সেপ্টেম্বরের সকাল। ১৮ই সেপ্টেম্বর মির্চা চলে গেছে। খোকা আমায় বলছে, আমি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি—"রু তাড়াতাড়ি লিখে দাও ভাই" ––তারপর একটা মুখভঙ্গী করে ফিস্ ফিস্ করে বলছে, "চারদিকে স্পাই ঘুরছে" এটা ও ঠাট্টা করে বলছে, ও খুব মজা করতে পারে, হাসাতে পারে।

খোকা আমাদের কেউ নয়। কিন্তু ভাইয়ের মতো। ওরা বড় দরিদ্র, ওর মাকে আমার ঠাকুমা মানুষ করেছেন। তারপর তাঁর বিয়ে দেন। খোকার মাকে তাই আমরা পিসিমা বলি। পিসিমার আঠারটি সন্তান, তাই ওদের দারিদ্র্য কোনোদিন গেল না। খোকা আর তার বোন শান্তি আমাদের আশ্রিত। যদিও তাদের সঙ্গে আমাদের খুব ভাব, আমরা বন্ধু, খেলার সঙ্গী—তবু ওদের মর্যাদা নেই—আশ্রিতদের যেমন কপাল, দাক্ষিণ্য পেলেও মর্যাদা পায় না। এমন কি মির্চাও ওর উপর সন্তুষ্ট নয়। সেটা অবশ্য অন্য কারণে—কারণ খোকা আমাকে হাসায়। ও সামান্য বিষয়কে এমন করে বলে, এমন মুখভঙ্গী করে যে হাসতে হাসতে আমরা হয়রান হয়ে যাই। মির্চা অর্ধেক কথা বুঝতে পারে না তাই গম্ভীর হয়ে যায়। একদিন লাইব্রেরী ঘরে একটা নতুন পর্দা টাঙ্গিয়েছি, নানা রকম পর্দা দিয়ে ঘর সাজানো আমার একটা শখ। খোকা লাইব্রেরীতে পর্দা সরিয়ে ঢুকছে, এমন একটা ভঙ্গী করে যেন পাথর সরাচ্ছে, যেন ঢুকতেই পারছে না! ওর ভাবভঙ্গী দেখে আমি যত হেসে গড়াই দেখি মির্চার মুখ ততই ভার হয়ে যায়।

"ও লোকটা ওরকম করছিল কেন?"

"ঠাট্টা করছিল। রোজ রোজ পর্দা বদলানো দেখে ও বলে আমার যখন সংসার হবে সেখানে প্রত্যেক দরজায় এতগুলো করে পর্দা ঝুলবে যে একটা সরালেই আর একটা, সেটা সরালেই আর একটা, এমনি করে করে ক্লান্ত হয়ে যাবে মানুষ, কেউ আর ঘরে ঢুকতেই পারবে না। কি রকম অবস্থাটা হবে তাই ও ভঙ্গী করে দেখাচ্ছিল। এতে হাসি পায় না? মুখ ভার কর কেন?"

"এর কি কোনো ভিতরের অর্থ আছে?"

"দেখো একবার, এর আবার ভিতরের অর্থ কি? শুধু মজা করা।" মির্চার এই স্বভাব, সব কিছুর ভিতরে অর্থ খোঁজে!

"তোমার ওকে কি এত ভালো লাগে! বাফুন, জোকার, সঙ"—আহা, কি অদৃষ্ট ! আজ মির্চাকে সেই খোকার সাহায্য নিতে হচ্ছে। এখন ওই ওর একমাত্র বন্ধু। ও ছাড়া আর কেউ তাকে আমার খবর দেবে না। আমাকেই বা কে দেবে ! "খোকা, ভাই খোকা"

"রু, তাড়াতাড়ি লেখ ভাই, আমাকে এখানে দেখতে পেলে মামা ভীষণ রাগ করবেন। হয়তো আজই এখান থেকে তাড়িয়ে দেবেন।"

আমি লেখবার চেষ্টা করছি—কি লিখব ভেবে পাচ্ছি না—মির্চা আমার বইটা চেয়েছে। খোকা বলেছে ওর কাছে তোমার একটা বই নেই, বইটা দাও, তাই আমি বইটাতেই লিখছি, কি লিখব ভয়ে কাঁপছে আমার ভিতরটা। মির্চা যদি সব সত্যি কথা বলে দেয়? ও জানে আমি সহজে মিথ্যা বলি না। ওকেও তো জানি মিথ্যা বলে না। কিন্তু আমি মিথ্যা বলেছি, ওকে বাঁচাবার জন্যই বলেছি। এখন বুঝতে পারছি মিথ্যা সব সময়ই খারাপ নয়। কি আশ্চর্য, এমন একটা কথা কি করে আমার মনে এল? মা তাই বুঝি বলেন, একটা অন্যায় আর একটাকে ডেকে আনে— মিথ্যার পিছনে মিথ্যা দৌড়ায়, সত্য আর তার নাগালই পায় না! ছি, ছি, আমিও এত খারাপ হলাম। আমার গুরু কি বলবেন? আমি যে সূর্যের আলোতে মুখ তুলে আছি। আমি যে ভেবেছিলাম, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ থাকব। হল না, হল না। আমি দেখতে পাচ্ছি বইয়ের পিছনের পাতা খুলে আমি লিখছি—আমার হাত কাঁপছে। অক্ষরগুলো কাঁপছে। লাইন বেঁকে গেল। যেন কোনো অন্ধকারের ভিতর থেকে আমার ষোল বছরের শরীরটা ফুটে উঠেছে। আমার চুল অবিন্যস্ত, তিন দিন আমি আঁচড়াই নি, এই তিন দিন শরবৎ ছাড়া আমি কিছু খাই নি। খাব না। আমি মনে মনে বলছি, কোনো দিন খাব না, চুল কেটে ফেলব, পাড় ছিঁড়ে ফেলব তবে মার শিক্ষা হবে।

দিদিমা এসে যখন জিজ্ঞাসা করবেন, ওর কি হয়েছে? তখন তো মাকে বলতেই হবে। দিদিমা কি বলবেন? আমি জানি জানি জানি, তিনি মনে মনে বলবেন, এই মেয়ে স্বয়ংবরা হয়েছে, তার আর অন্য পতি হয় না। কিন্তু মুখে একটি কথাও বলতে পারবেন না। বাবার ভয়ে। একজন মানুষকে এত লোক ভয় করে।...মির্চাকে লিখলাম, সাবধান করে দিলাম। এর বেশি যেন না স্বীকার করে। বুঝবে তো? কী জানি। এর বেশি তো আমি লিখতে পারছি না, ইংরেজি কথাই আমার মনে পড়ছে না।

সেরগেই বললে, "মির্চা কিন্তু তোমার চেয়ে অনেক বুড়ো হয়ে গেছে।" আমি অবাক হয়ে চেয়ে আছি, আমার চোখে দৃষ্টি ফিরে এসেছে—সেরগেই বুঝতেও পারে নি, এতক্ষণ আমি এখানে ছিলাম না। আমি কি দেখছিলাম? কোথায় খোকা? সে তো এখন বৃদ্ধ জীর্ণ একটা মানুষ—কালীঘাটে না কোথায় থাকে, কত বছর তার খবরই রাখি না। এখানে সেই পাথরের বারান্দা কি ভ্রাম্যমান কার্পেটে ভেসে এসে পৌঁছেছিল? কী আশ্চর্য! কী বিস্ময়! এর ঘোর কাটতে চায় না। সেই গানটা মনে পড়ছে 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে অন্তরে আজ দেখব যখন আলোক নাহিরে'—আলো ছাড়া দেখা যায় তাহলে? আলোর তরঙ্গ ছাড়া আরো কোনো তরঙ্গ আছে? আছে, নিশ্চয় আছে। আমার অলৌকিকে বিশ্বাস হচ্ছে যদিও আমি নাস্তিক—কারণ এতক্ষণ বা একটি ক্ষণে একটি মুহূর্তে কিম্বা সময়ের অতীত কিছুতে যা ঘটল তা স্মৃতি নয়, মনে পড়া নয়, তা বাস্তব অনুভূতি। আমি ১৯৩০ সালের ২০শে সেপ্টেম্বরের সকালে উপস্থিত হয়েছিলাম—আমার হাতের নিচে পাথরের ঠাণ্ডা লেগেছিল, অবিশ্রাম কান্নায় আমার চোখ ভারি ছিল, তিনদিনের অনাহারে আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, forehead লিখতে গিয়ে একটু ইতস্তত করেছিলাম বানান নিয়ে, আমার সন্দেহ হচ্ছিল 'e' টা লাগবে কিনা। অতীতকালের এই প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে রূপ দেবার ভাষা আমার নেই। ১৯৭২ সাল ১৯৩০ সালে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। আমি সেরগেই-র সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলছি কিন্তু আমার ভিতরটা

কাঁপছে। ঝড়ের মুখে একটা ছোট্ট বিপন্ন পাতার মতো কাঁপছে। নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি এই এখানে আছি, এখুনি এখানে নাও থাকতে পারি। আমার মনে হচ্ছে আবার এমনি হবে— আবার আমি কালের মধ্যে পিছনে ফিরে যাব। কি করে সম্ভব হচ্ছে এটা? যদিও আমি বুঝতে পারি কালের কোনো উদয় অস্ত নেই, উদয় অস্ত আমারই—কিন্তু আমার এই পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে যে খণ্ডিত জগৎটাকে আমি চিনি, জানি, তার বাইরে পা দিতে আমার সাহস কোথায়? স‍ৈই অজ্ঞাত জগতে পা দিতে আমি ভয় পাই। আজকের যে অভিজ্ঞতাটা হল এটা ভয়ানক, এটা কষ্টকর, বিপর্যয়কারী। আমার সমস্ত ধারণা, আত্মবিশ্বাস গোলমাল করে দিচ্ছে। কে আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করবে? আমি সেই ১৯৩০ সালের মতোই আবার আমার গুরুকে ডাকতে লাগলাম, —'প্রভু আমায় পরিত্যাগ করো না।' 'নাথ হে ফিরে এস—আমার সব সুখদুখমন্থন ধন অন্তরে ফিরে এস'—আমি আর কিছু চাই না, কাউকে চাই না, আমার জীবনে আর কিছু নেই, আর কিছু ছিল না, আমার সমস্ত অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ জুড়ে তোমার গানে গানে এক জ্যোতিবিকীর্ণ মহোৎসব—আমার কোনো অভাব নেই দৈন্য নেই। আজ কি হঠাৎ কোথাকার অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি দুটো কথা বলে সব চুরমার করে দেবে! এতদিন পরে কি ধ্রুবতারকার জ্যোতি নিভে যাবে? আমি পথভ্রষ্ট হব?

আমাকে গাড়িতে তুলে দিতে এসে সেরগেই আবার আমার করপল্লব চুম্বন করল—

আমার পায়ের তলা থেকে একটা তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভূতি উঠে এল। আমি বহুকষ্টে নিজেকে সংবরণ করে নিলাম। এটা গোলপার্ক—১৯৭২ সাল; ১৯৩০ সালে এ জায়গাটা জঙ্গল ভরা ছিল। আমি গাড়িতে উঠে দরজাটা শক্ত করে ধরে বলতে লাগলাম—"এটা একটা ট্যাকসি, শেভরলে নয়।"

আমাদের প্রথম গাড়িটা ছিল শেভরলে, হুড খোলা, উঁচু। এখনকার রুচিতে সুন্দর নয়, কিন্তু আমাদের তখন কি সুন্দরই লাগত। গাড়ি থেকে নামবার সময়

মির্চা সব সময় হাত বাড়িয়ে দেবে।

"কেন এইটুকু নামতে সাহায্য লাগে নাকি?"

"আমাদের দেশের এই নিয়ম, মেয়েদের গাড়ি থেকে হাত ধরে নামাতে হয়। আর অভ্যর্থনা ও বিদায় অভিনন্দন জানাতে করপল্লব চুম্বন করতে হয়।"

"নিয়ম?"

"হ্যাঁ নিয়ম। না করলে লোকে তাকে বর্বর বলবে। তোমাদের এরকম কোনো নিয়ম নেই?"

"না। বড়দের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে। সমবয়সীদের নমস্কার করা আছে। তা বড় একটা কেউ করে না। ঠাকুরবাড়ি থেকে এসব আদবকায়দা শুরু হয়েছে। শান্তিনিকেতনে রবিঠাকুর শেখাচ্ছেন ওখানকার ছাত্রছাত্রীদের। ওরা সবাইকে হাতজোড় করে নমস্কার করে। ছাত্ররা পরস্পরকে নমস্কার করে। দেশের অন্যত্র সবাই এতে হাসে!"

"ঐ একজন লোকই কি তোমাদের সব কিছু করবেন?"

"হ্যা তাই, হ্যা তাই, ঐ একজন লোকই আমাদের আকাশ জুড়ে আছেন, আমাদের মুখে কথা দিচ্ছেন, আমাদের মনে ভালোবাসা দিচ্ছেন, সে আছে বলে আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে, প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে।"

মির্চা স্তম্ভিতবিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে আছে—"এ আবার কি, একজন মানুষ সম্বন্ধে এরকম করে বলছ! আমি তোমায় বুঝতে পারি না।"

"বয়ে গেল?"

বাড়ি এসে পৌঁছেছি। আমার পুত্রবধূ লেখা আমায় বললে, "হঠাৎ কোথায় চলে গেলেন? আজ 'খ' বাবুর আসবার কথা ছিল না? কাজের জন্য একজন লোক নিয়ে?"

এই কন্যাটিকে আমি ভয় করি। প্রখর বুদ্ধিমতী মেয়ে আর সর্বদা আমার কাছে থাকে, কী যে বুঝে নেবে কে জানে! আমাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে।...আমি খুব হাসি হাসি মুখে খ-বাবুর বক্তব্যগুলো শুনলাম। কিন্তু কোনো কথা আমার কানে ঢুকছে না—আমার চোখে জল আসছে, বুকের ভিতরটা কাঁপছে। এরকম হলে তো চলবে না। এ আবার কি এতদিন পরে? আমি হাসছি, একটু অসঙ্গত রকমই হাসছি। বিকালে আমার জন্মোৎসব সে সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করছি—কিন্তু আমার কোনো কৌতূহল নেই, কিছু জানতে চাই না। আমি বুঝতে পারছি না এত অল্প সময়ে জগৎটা বদলে গেল কি করে! এত কষ্ট কেন?...আমার বন্ধুরা আমার জন্মোৎসব করবে এতে আমার গর্ব নেই—ওরা আমাকে আদর করে কি করবে? আমায় কি শান্তি দিতে পারবে? আমি বুঝতে পারছি সেরগেই এসে আমার শান্ত স্রোতহীন স্থির জীবনের মাঝখানে একটি লোষ্ট্রপাত করে যে তরঙ্গবলয় সৃষ্টি করেছে এ আমাকে সহজে ছাড়বে না, থামবে না এর আবর্ত। শান্তির আশা এখন বহুদূর। আমি চোখ বুজে চেয়ারে পড়ে আছি। কি চাই আমি? কিছু না, কর্ম, সমাজসেবা, দেশের উন্নতি জাহান্নামে যাক্, কিছু চাই না—নিয়ে চল সেই ১৯৩০ সালে আর একবার ওকে দেখব। মির্চা, মির্‌চা, মির্‌চা!

হঠাৎ মুখ তুলে দেখি, লেখা আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে—"মা আপনার কি চোখে আবার কষ্ট হচ্ছে? জল ভরে আছে কেন? ওষুধ দেব?"

"হ্যা দাও।"

জন্মদিনের বিপজ্জনক সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। নিজের কৃতিত্বে আমি খুশি। আমি নূতন শাড়ি পরেছি, ফুলের মালা পরেছি, কবিতা আবৃত্তি করেছি, গান

শুনেছি, কেউ কিন্তু বুঝতে পারে নি আমার ভিতরটা সর্বক্ষণ কিরকম থরথর করে কাঁপছে! এ কথাটা উপমা দিয়ে বলা নয়—সেই কম্পন যদি শরীরে দেখা যেত লোকে মনে করত আমার পারকিনসন্স রোগ হয়েছে।

রাত্রি দুটোয় বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি—এখন ভোর হয়ে এল। তারাগুলো একদিক থেকে অন্যদিকে চলে গেছে। এ বাড়িতে ছাতে ওঠা যায় না, এই এক বিপদ। ভালো করে আকাশ দেখতে পাই না। আমি চিরদিন আকাশের নিচে শুয়ে থাকতে ভালোবাসি। মির্চাও ছাতে বেড়াতে খুব ভালোবাসত। প্রথম দিন ছাত দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। "জানো আমাদের দেশে ছাতে ওঠা যায় না ?"

"সে আবার কি! তোমরা সূর্য তারা দেখ কি করে!"

"সূর্য তারা দেখে অ্যাস্ট্রনমাররা, সাধারণ লোকে সে কথা ভাবেই না।"

"আমাদের দেশে লোকে সকালে প্রথমেই সূর্য প্রণাম করে।"

"তুমি কর ?"

"আমার সূর্য ভিতরেও আছে বাইরেও আছে। আমি সব সময়ই প্রণত। সকাল-বিকাল নেই।"

"তার মানে? বলো, বলো, হাসছ কেন, বলতেই হবে।"

"না বলব না। তুমি বুঝবে না।"

"তুমি আমায় অপমান করছ—বুঝতেই পারব না?"

"বলতেই হবে ভিতরের সূর্য কে।"

"আমার গুরু। তিনিই আমায় এই সুন্দর পৃথিবীটা দেখাচ্ছেন।"

"তিনি কি শুধু নিজেকেই দেখান, না আরো কিছু দেখান?"

"সমস্তই দেখি তাঁরই আলোকে।"

"যেমন?"

"যেমন এই তোমাকে দেখছি।"

ও সেদিন খুশি হয়েছিল—"আজ সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে হুইটম্যান পড়বে ?"

"দুর্ অত নীরস লেখা বুঝতেই পারি না। তার চেয়ে শেলী পড়ব—সেন্সেটিভ প্ল্যান্ট।"

যাই গিয়ে শুয়ে পড়ি। কাল কত কাজ আছে—বিকালে মিটিং আছে। বিয়াল্লিশ বছর আগেকার কথা মনে করে লাভ কি! কোথায় বা সে মির্চা, আর সে কোন অমৃতা, দেখলে হয়তো চিনতেই পারব না কেউ কাউকে !

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। আমি কিছুতেই আমার বর্তমানে স্থির থাকতে পারছি না। বারে বারে কখনো দিনে কখনো রাতে আমি ফিরে ফিরে চলে যাচ্ছি ভবানীপুরের বাড়িতে, ১৯৩০ সালে।

আমার মনে পড়ে না সেটা কোন মাস যে-দিন মির্চা ইউক্লিড প্রথম আমাদের বাড়ি এল, অর্থাৎ আমি প্রথম লক্ষ্য করলাম তাকে। আমার বাবা পণ্ডিত ব্যক্তি, মাত্র ছয় বছর আগে তিনি পূর্ববঙ্গের একটা মফঃস্বল কলেজে অধ্যাপনা করতেন, তারপর কলকাতায় এসেছেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কলকাতা শহরে বিদ্বৎ-সমাজে সম্মানের উচ্চচূড়ায় পৌঁছে গেছেন। সবাই তাঁকে চেনে। তিনি পণ্ডিত এবং অসাধারণ পণ্ডিত। সেজন্য অনেকেই তাঁকে ভয় করে, ঐ পাণ্ডিত্যের একটা আক্রমণকারী রূপ আছে। যে কোনো ব্যক্তিকে অল্প সময়ের মধ্যে বিতর্কে হারিয়ে তাকে মূর্খ প্রতিপন্ন করে দিতে পারেন এবং এ খেলায় তিনি বেশ আনন্দ পান। কিন্তু এ সত্ত্বেও তাঁর আকর্ষণী শক্তি অদ্ভুত। তিনি যাদের অপমানিত করেন তারাও তাঁর কাছ থেকে পালায় না। তাঁর ছাত্রছাত্রীরা তাঁর জন্য অনেক ত্যাগ করতে প্রস্তুত, তিনিও তাঁদের ভালোবাসেন কিন্তু সে ভালোবাসা আমাদের সাধারণ মানুষের ভালোবাসার মতো নয়। তাতে অপর পক্ষের প্রতি সমবেদনা নেই। ভালোবাসাটা তাঁর নিজের জন্যই, যেমন আমাকে ভালোবাসেন, খুবই ভালোবাসেন, সেটা আমার জন্য যত না তত নিজের জন্য—এই দ্যাখো আমার কন্যাটি কী অমূল্য রত্ন, দেখতে কী সুন্দরী, কী চমৎকার কবিতা লেখে, কী সুন্দর ইংরেজী বলে—এ তো আমার মেয়ে, দ্যাখো

দ্যাখো তোমরা! আমাকে নিয়ে মেতে আছেন বাবা। কিন্তু জানি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটু নড়লে আমাকে চূর্ণ করে দিতে তাঁর বাধবে না। আমি কিসে সুখী হব সেটা তাঁর কাছে অবান্তর।

আমার মা একেবারে বিপরীত। আমার মা, পরমাসুন্দরী। ঐ সময়ে তাঁর সৌন্দর্য অলৌকিক, স্বর্গীয়। তাতে বাবা খুব গর্বিত কিন্তু মার কোনো খেয়ালই নেই—মা কোনোদিন প্রসাধনে যত্ন করেন না, নিজের কোনো সুখস্বাচ্ছন্দ্য, ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই বললেই হয়। বাবাকে সুখী করাই তাঁর একমাত্র কাজ। সেই কাজে বাবা তাঁকে যথেষ্ট ব্যাপৃত রাখেন—বিশেষ করে সামান্য একটু অসুখ করলে হৈ চৈ করে এমন অবস্থা করে তোলেন যে মার মনে সর্বদা ভয় এই বুঝি তাঁর স্বামীর ভয়ানক একটা কিছু হল। মা বৈষ্ণবসাহিত্য পড়তে ভালোবাসেন; দুটো লাইন তিনি প্রায়ই বলেন—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে কহি কাম
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।

শুধু যে স্বামীকে প্রীত করবার ইচ্ছা তা নয়। চার পাশের প্রত্যেকটি লোকের জন্য মায়া-মমতার সুধাপাত্র মার হাতে ভরাই আছে।

সে সময়ে আমাদের বাড়িতে সর্বদা বিদেশীরা যাতায়াত করতেন। নানা বিষয়ে আলোচনা হতো, যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে বিদূষী স্টেলা ক্রামরিশ ও অধ্যাপক তুচির কথা সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে, ফর্মিকিও বোধ হয় এসেছিলেন। অধ্যাপক তুচি পরে ভালো বাংলা শিখেছিলেন—তাঁকে দেখতে ছাত্রের মতো ছিল — কচি মুখের উপর অবাধ্য চুলগুলো কপালে এসে পড়ত বার বার। তাঁর স্ত্রী বেশ চৌকো চৌকো চেহারা, গলায় মুক্তার মালা। তাঁদের আসা-যাওয়ার জন্য বাড়ির চেহারা ক্রমে বদলে যাচ্ছিল। বাঙ্গালীয়ানার উপর সাহেবিয়ানার ছোঁয়াচ লাগছিল। বছরখানেক আগে আমার ঠাকুমা মারা গিয়েছিলেন তাই এই উন্নতি সম্ভব হয়েছিল, নইলে হতো না। বেশ মনে আছে ১৯২৪ সালে প্রথম যেদিন খাবার ঘরে বিরাট মেহগনি টেবিল এল, ঠাকুমা অনেকক্ষণ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন, তাঁর হাতের সোনার জপের মালা থেমে গিয়েছিল—"কী, এর উপর খাওয়া হবে কেন? শুলে কি দোষ হয়? এটা তো একটা খাট-ই!" তারপর যখন দেখলেন কোনো উপায় নেই, কথা টিকবে না, তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ‘বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নেই।' তিনি পারতপক্ষে ও-ঘরের কাছেও যেতেন না। আর যেদিন কাঁটাচামচ দেখলেন, সেদিনের কথা ভুলব না, ভ্রুকুটি করে মাকে বললেন, ‘ভাত খাওয়ার জন্য অতগুলো যন্তর লাগবে।' প্রতিশোধস্পৃহা এতদূর বেড়ে গিয়েছিল যে প্রায়ই আশা প্রকাশ করতেন যে ঐ কাঁটা দিয়ে ‘জেহ্বাটা’ এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হলে তবে শিক্ষা হয়! ঠাকুমার সংস্কারগুলো যে কত অনড় আর তাঁর পক্ষে কত সত্য তা তিনি তাঁর মৃত্যুশয্যায় দেখিয়ে গিয়েছেন। কলেরা রোগাক্রান্ত হয়ে তিনদিন ভুগে তিনি মারা যান। প্রথম দুদিন মা সমস্ত সেবাটা করলেন, কাকা তাঁকে সাহায্য করলেন। মা তখন গর্ভবতী ছিলেন— ডাক্তার খুব রাগ করতে লাগলেন, শেষপর্যন্ত বাবাকেও বকাবকি শুরু করলেন, অবশেষে মাকে সরে যেতে হল—নার্স এল, ক্রিশ্চান নার্স। তাকে শিখিয়ে দেওয়া হল ঠাকুমা জাত জিজ্ঞাসা করলে বলবে ‘ব্রাহ্মণ’—।

রুগী অর্ধচৈতন্য চোখ ঈষৎ উন্মীলিত করে বললেন, 'জল'—-নার্স জল নিয়ে এগিয়ে এল— "এই যে জল খান, মুখ খুলুন"—মুমূর্ষ নারী মুখ খুললেন না, চোখ খুললেন, তাঁর মৃত্যুআচ্ছন্ন কানে গলার স্বরটা অপরিচিত ঠেকেছে, "তুমি কে মা?"

"আমি নার্স।"

"আচ্ছা থাক একটু পরে জল খাব।" কলেরা রোগাক্রান্ত রুগীর মুহূর্মুহু তৃষ্ণা। তিনি আবার বললেন—"জল"...

"এই তো জল এনেছি খান", ফিডিং কাপটা এগিয়ে ধরেছেন নার্স—

"আমার বৌমাকে ডেকে দাও"

"তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আমার কাছেই জল খান না।"

"তুমি কি জাত?"

"ব্রাহ্মণ।"

"সধবা না বিধবা—"

"বিধবা"—এবারে মৃত্যুপথযাত্রিনী ভালো করে তাকালেন, ইনি সব জানেন—তাঁর কি রোগ, রোগের গতি কি, এখন কি অবস্থা কিছুই তাঁর অজ্ঞাত নয়—কারণ তিনি কবিরাজ বাড়ির বধূ—চিকিৎসকদের সঙ্গেই জীবনের অনেক দিন কেটেছে। "দ্যাখো নার্স আমার পেট ফেঁপেছে, কলেরা রুগীর পেট ফাঁপলে আর বাঁচে না—" মুমূর্ষ রুগীর এখন টনটনে জ্ঞান ফিরে এসেছে। কোমার ব্যাপারই ঐ, মাঝে মাঝে রুগী সজাগ হয়ে যায়। "ও নার্স তুমি খেয়েছ ত? কি দিয়ে ভাত খেলে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো মাছের ঝোল ভাত খেয়ে এসেছি।"

আর বলতে হবে না, যা সন্দেহ হয়েছিল তার নিরসন হল, "দ্যাখো নার্স, তুমি ব্রাহ্মণের বিধবা, মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে এসেছ, মৃত্যুকালে তুমি আর আমার মুখে জল দিও না মা, আমার বৌমাকে ডেকে দাও।"

বৌমাও ছুটে এলেন, "সারাজীবন ওর সেবা করলাম। আর এখন এই শেষ সময়ে মনোকষ্ট দেওয়া—আমার যা হয় হবে।"

ঠাকুমা চলে যাবার পর এ বাড়ির চেহারা বদলে গেল ভিতরে ও বাইরে। ব্রত পূজা, কালীঘাট, পুরোহিত, ছুঁৎমার্গ, এঁটো প্রভৃতি বিরাট বিরাট সমস্যা যা সারাদিন মাকে হয়রান করত, সব যেন এক ফুঁয়ে উড়ে গেল। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত জঞ্জালের স্তূপ সরিয়ে আমরা নূতন দিগন্তের দিকে মুখ ফেরালাম।

আমার এ পরিবর্তন খুব ভালো লাগছিল। আমি শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে যতই এগোচ্ছি ততই ক্রমে ক্রমে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মানুষদের দেখতে পাচ্ছি। আমাদের মফঃস্বলের বাড়িঘরের চেয়ে এঁদের বাড়িঘর আচার-আচরণ কত না পৃথক ! তখন একটা কথা শুনতাম 'এলিট' এখন যেমন শুনি 'বুর্জোয়া'। 'বুর্জোয়া' কথাটার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে, কেমন যেন ঝগড়ার আভাস পাওয়া যায়, 'এলিট' তা নয়। আরো একটা কথা শুনতাম 'ক্রিম অফ ক্যালকাটা', এখন তো দুধে সরে মিশে একাকার। এই উচ্চ সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমার তের বছর বয়স থেকে বাবা আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতেন, আমি যাতে তাঁকে আমার কবিতা দেখিয়ে নিই সেজন্য। আমি কোনোরকমে সেই কাজটা সংক্ষেপে সেরে তাঁর কবিতা তাঁকে আবৃত্তি করে শোনাতাম, আমি খুব ছেলেবেলা থেকে কবিতা আবৃত্তি করতে ভালোবাসি। আমার মুখে নিজের কবিতা শুনতে রবীন্দ্রনাথ ভালোবাসতেন। মাঝে ম::ঝে আমাকে উৎসাহ দেবার জন্য তিনি বলতেন, "তুমি আমার চেয়েও আমার কবিতা ভালো পড়"—জানি এ কথা আমাকে খুশি করবার জন্যই তবু আমার মন পূর্ণ হয়ে যেত কানায় কানায়, আমি ভাবতাম, এঁর কাছ থেকে আমি কত পাই, এখানে একবার এলে এঁর অস্তিত্বের আস্বাদই কি মধুর—কিন্তু আমার তো ওঁকে দেবার কিছুই নেই। এই একটি জিনিসই দিতে পারি। তাই যদিও সেই বিরাট প্রতিভার সামনে আমার সঙ্কোচ ও লজ্জার অন্ত ছিল না, অনেক সময় মুখ তুলে কথাও বলতে

পারতাম না, কিন্তু কবিতা আবৃত্তি শুরু করলে আমার লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ কেটে যেত। মনে আছে একবার 'সোনার তরী', 'কৌতুকময়ী', 'জীবন দেবতা', 'হৃদয় যমুনা' আবৃত্তি করছি পর পর—উনি মৃদু মৃদু হাসছেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"এসব কবিতা তুমি বুঝতে পার?"

আমি খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঘাড় নাড়লাম 'হ্যাঁ' — তারপর সোনার তরীর নিহিতার্থ, জীবন দেবতার দর্শন, বাবার কাছে যেমন যেমন শুনেছিলাম গড় গড় করে বলতে শুরু করলাম—উনি আমায় মধ্যপথে থামিয়ে দিলেন। আমার কচি মুখে উচ্চ দর্শনশাস্ত্র কি রকম শোনাচ্ছিল এখন বুঝতে পারি। উনি বললেন, "থাক থাক, তুমি শুধু পড়—যখন সময় হবে, অর্থ আপনি বুঝতে পারবে। পাখি যে গান গায় তারও কোনো অর্থ আছে বিশ্ব ব্যাপারে, সে কিন্তু সেটা জানে না। তাতে ক্ষতি নেই, তেমনি মনের আনন্দে তুমি পড়, অন্যের ব্যাখ্যা তোমার কোনো কাজে লাগবে না।"

এ সময় একজন রুশ পণ্ডিত প্রায়ই আসতেন, তাঁর নাম আমার মনে পড়ে না, হয়তো তিনিই বগদানভ—শান্তিনিকেতনে যেসব বিদেশী পণ্ডিতব্যক্তি আসতেন যাবার আসবার পথে তাঁরা একবার আসতেনই আমাদের বাড়িতে। শাস্ত্র-আলোচনায় আমি সাহসের সঙ্গে যোগ দিতাম। তত্ত্বচিন্তার একটা আবহাওয়া, সেটা আমার মত অল্পবয়সীদের কাছে একটা কুয়াশা ছাড়া কিছু নয়—কিন্তু সেই প্রহেলিকাময় নীহারিকা আমার ভালো লাগত। সেই নীহারিকা ভেদ করে সূর্যের আলো অবশ্যই আমাকে উত্তপ্ত ও সজাগ করে রাখত। এক দিকে ব্যক্তিমানুষের জীবন্ত অনুভবের সত্য শিল্পের বেদনায় ঝঙ্কৃত, অন্য দিকে এক নিরন্তর অনন্ত জিজ্ঞাসার প্রহেলিকা আমার সেই উন্মুখ সতেজ নবীন মনের উপর আলোছায়ার খেলা করছিল। আমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের পরিবারের থেকে আমাদের বাড়িটা ছিল স্বতন্ত্র—আর আমার সমবয়সীদের কাছে, বিশেষত স্কুলের সহপাঠীদের কাছে আমি ছিলাম দুর্বোধ্য। তারা আমায় ক্ষেপাতো আমি

অন্যমনস্ক বলে। অন্যমনস্ক, অর্থাৎ যখন যেটাতে মন দেবার কথা সেটা ছেড়ে অন্য কিছু ভাবতাম।

আমাদের সময়ে ছেলেমেয়েদের মেশামেশি কম ছিল তবু আমরা পর্দানশীন ছিলাম না। আমার মা, বাবার সহকর্মীদের সামনে সব সময় না বেরুলেও ছাত্রদের সামনে বেরুতেন—আমি তো সকলের সামনেই বেরুতাম। মফঃস্বলে থাকতে মাকে দেখেছি চিকের আড়ালে বসে বসবার ঘরের সাহিত্য-আলোচনা শুনতেন ও আড়াল থেকে জলখাবার পান শরবৎ পাঠিয়ে দিতেন। কলকাতায় এসে সে আড়াল উঠে গেল। আমরা সর্বত্র যেতাম। সাহিত্যসভায় কবিতা আবৃত্তি করতাম, যেখানে একটিও মেয়ে নেই। এতটা তখনকার দিনে খুব কম মেয়েই করেছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও আমাদের মুখের উপর একটা অদৃশ্য ঘোমটা থাকত। আমরা সহজে কারুর সঙ্গে কথা বলতাম না। হয়তো বাবার কোনো ছাত্র তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমাদের সঙ্গে এগিয়ে এল, আমি মাথা নীচু করে হাঁটতাম, তার সঙ্গে কথা বলতাম না। সত্য কথা বলতে কি আমরা পর্দাবিহীন পর্দানশীন ছিলাম। কথা বলতে ইচ্ছে করত না তা নয়, খুবই করত, আমি জানতাম অপর পক্ষেরও ত::াই। তবে কথা বলতে বাধা কি? কেউ তো আর আমাদের বারণ করেনি। কিন্তু আমরা পারতাম না। আত্মীয়স্বজন ছাড়া অন্য পুরুষ মানুষদের সামনে, বিশেষতঃ যুবকদের সামনে আমরা একেবারে পাথর হয়ে যেতাম। তারাও তাই। যেন কেউ কাউকে দেখতেই পাচ্ছি না। কত যুগযুগের সঞ্চিত নিষেধের প্রভাব আমাদের রক্তস্রোতে বইছে, একে পার হওয়া দুষ্কর, কিন্তু আজকের দিনে কেউ হয়তো বিশ্বাসই করবে না যে এই নিষেধটা কেন, এর ভিতরের কারণটা কি সে সম্বন্ধে আমরা, অন্তত আমি বিশেষ কিছু জানতাম না। এই সব শিক্ষিত উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে যৌন ব্যাপার সম্বন্ধে কোনো আলোচনা হতো না। আভাসে ইঙ্গিতে, একটা ঢাকনা পরা লুকানো জগৎ আছে, সেটা অবশ্যই আমরা বুঝতাম কিন্তু সেখানকার ব্যাপারটা কি তা জানা ছিল না। আমাদের বেছে বেছে উপন্যাস পড়তে দেওয়া হতো। বিশেষ

বিশেষ কতগুলি বিখ্যাত বই একেবারে নিষিদ্ধ, তার মধ্যে ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’, ‘চোখের বালি’ ও ‘চরিত্রহীন’। ‘নৌকাডুবি' পড়বার অনুমতি ছিল। ‘নৌকাডুবি’র মলাটটা খুলে নিয়ে ‘চোখের বালি’তে লাগিয়ে পড়ে ফেলেছিলাম। অবশ্য কেন বইটা এত নিষিদ্ধ তা বুঝতে পারিনি।

যদিও বাবার বাঙালী ছাত্রদের সঙ্গে বেশি কথা বলার সাহস হতো না কিন্তু বিদেশী ছাত্রদের সম্বন্ধে অন্তরে এ বাধা অনুভব করতাম না। বাবাও অনায়াসে ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে মিশতে দিতেন। এই সময়ে এক রুশ-দম্পতি কলকাতায় এসেছিল। তারা গ্লোবে নানারকম জাদুবিদ্যা দেখাচ্ছিল। তাদের নিয়ে শহরে খুব সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বাবা বললেন, "চল, বুজরুকিটা দেখে আসি"—গ্লোব থিয়েটারে স্টেজের উপর চোখে কালো রুমাল বেঁধে আভূমিলুণ্ঠিত কালো গাউন প'রে একটি সুন্দর মহিলা এসে দাঁড়াতেন, আর তাঁর স্বামী দর্শকদের ভিড়ের মধ্যে নেমে আসতেন। ভদ্রমহিলা দর্শকদের বলতেন প্রশ্ন করতে। দর্শকদের মধ্যে থেকে দাঁড়িয়ে উঠে কেউ প্রশ্ন করলে তাঁর সুবেশ তরুণ স্বামী সেই ব্যক্তির নাড়ি ধরতেন, তখন মহিলাটি স্টেজের উপর থেকে তাঁর অনুচ্চারিত প্রশ্ন এবং উত্তর গড়-গড় করে বলে যেতেন। প্রশ্নগুলো কখনো ঠকাবার জন্য করা হতো, কখনো বা কোনো মর্মান্তিক গোপন খবর জানবার জন্য। যেমন, একজন উঠে দাঁড়াতেই চোখবাঁধা মহিলাটি বললেন, 'তুমি জানতে চাও তোমার পকেটে যে দেশলাইয়ের বাক্সটা আছে তাতে ক'টা কাঠি আছে?—বাহান্নটা। কিংবা 'তুমি জানতে চাও তোমার স্ত্রী তোমার প্রতি অবিশ্বাসিনী কি না? তিনি তো ঠিকই আছেন, তুমিই অবিশ্বাসী—' এই না শুনে সারা হলসুদ্ধ লোকের উচ্চ হাসিতে ভদ্রলোক অপ্রস্তুত। বাবা বললেন, "এই মেয়েটা তো জাঁহাবাজ, একে একটু বাজিয়ে দেখতে হবে।"

আজকাল, অর্থাৎ এই ঊনিশ শ' শতকের শেষের দিকে এদেশে যে রকম অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতের দিকে ঝোঁক হয়েছে উচ্চবিত্ত শিক্ষিত সমাজেও, আমাদের সময় যতদূর মনে পড়ে এটা কম ছিল। এখন ঘরে ঘরে ছবি থেকে ভস্ম পড়ে, অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসপত্রর আবির্ভূত হয়, এসব গল্প বিদ্বান বৈজ্ঞানিকেরাও সহজে বলেন, তখন তা হতো না। শিক্ষিত লোকেরা কোনো আজগুবি অতিপ্রাকৃত ঘটনা বিশ্বাস করতে ইতস্তত করতেন, অন্তত মনে মনে যাই হোক মুখে তা স্বীকার করতেন না। আমার বাবাও যে একেবারে

কুসংস্কারমুক্ত ছিলেন তা নয়, কিন্তু তাঁর প্রকাশ্য মন তা স্বীকার করত না। অতএব পরীক্ষা করবার জন্য ঐ রুশ-দম্পতিকে নিমন্ত্রণ করা হল। বাবার ধারণা দর্শকদের মধ্যে ওদেরই লোক ছিল। আমি বললুম, "তাহলে তুমি কিছু জিজ্ঞাসা করলে না কেন?"

"বাবারে, যা জাঁহাবাজ মাইয়া, কি জানি কি কইয়া দিব!"

আমাদের বাড়িতে চায়ের বৈঠকে বেশ কয়েকজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি এলেন, অধ্যাপক, লেখক ইত্যাদি, চায়ের সঙ্গে এই মজার খেলা চলতে লাগল। ভদ্রলোক নাড়ি টিপে ধরেন, ভদ্রমহিলা তাঁর মনের কথা বলে দেন। অবশেষে আমার পালা এল, আমি ভাবলাম একটু ফাঁকি দেবার চেষ্টা করা যাক, বাংলা কথা কি করে বলবে? মনে মনে বললাম, "আমার শেষ কবিতাটার নাম কি?" ভদ্রমহিলা ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে বললেন, "ভোগপাত্র"—উচ্চারণবিকৃতি ছিল কিন্তু বলেছিলেন ঠিকই। একজন তরুণ অধ্যাপক বললেন, "থট্‌রিডিং ছাড়া আর কিছু নয়।"

বাবা বললেন, "বেশ, তাতেই সব ব্যাখ্যা হয়ে গেল নাকি?"

এই রুশ-দম্পতিকে নিয়ে আমরা একদিন এম্পায়ার থিয়েটারে ইটালীয়ান অপেরা দেখতে গেলাম। বাবা, মা, আমি ও ওরা দুইজন। সেই সময়ে এ-দেশে ইয়োরোপীয় সঙ্গীতে কান অভ্যস্ত ছিল না — সাধারণত তা শেয়াল কুকুরের চীৎকার বলেই অভিহিত হতো। এখন ট্রানজিস্টারের কল্যাণে বস্তির রোয়াকেও জাজ সঙ্গীত তো বাজছেই, বীঠোভেনও বাজছে। তখন এটা কল্পনাতীত ছিল। দু-তিন পুরুষ ধরে যাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় তামিল পেয়েছেন, যাঁদের বলা হতো ইঙ্গবঙ্গ সমাজের লোক, তাঁদেরই বাড়িতে ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের চর্চা হতো, মেয়েরা টুং-টাং পিয়ানো বাজাতেন—অতিথি অভ্যাগত, বিবাহোপযোগী পাত্র এলে ড্রয়িংরুমে পিয়ানো বাজিয়ে কৃষ্টির পরিচয় দিতেন, কিন্তু সেটা একেবারে শিশুসুলভ ব্যাপার ছিল। অতএব বোঝাই যাচ্ছে ইটালীয়ান অপেরা আমার কাছে খুব একটা উপভোগ্য হচ্ছিল না। কিন্তু জানি সে কথা

কাউকে বলব না, কারণ এই তো সবে এসব জায়গায় আসছি। এতে বড় হয়ে ওঠার গৌরবটা অনুভব হচ্ছে। তাছাড়া নিজেকে বেশ বোদ্ধা প্রমাণ করতেই চাই, অজ্ঞ বলে নয়। যাই হোক, অন্যমনস্কভাবে অপেরা দেখছি যেন ওষুধ খাচ্ছি। হঠাৎ ঐ রুশ ভদ্রলোক, তখন তাকে অ-ভদ্রলোকই বলব,দক্ষিণ হাতটি বাড়িয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন। আমি তো আঁতকে উঠলাম। যদিও এসব বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা যথেষ্ট ছিল তবু স্বাভাবিকভাবে আমরা ঠিক মতোই ব্যবহার করতাম। আমি এক ঝাঁকানি দিয়ে তার হাতটা সরিয়ে দিলাম, আবার যেন স্প্রিং-দেওয়া কলের মতো সে ব্যক্তি সেটি ফিরিয়ে আনল। ভাবলুম কি করা যায়—এখানে তো চেঁচামেচি করা যাবে না। নিচু হয়ে পায়ের নাগরাটা খুলে আস্তে আস্তে ওর হাঁটুর উপর রাখলাম, এবার সেও আঁতক উঠল, আমি খুব ধীরে ধীরে বললাম, "তোমাকে জুতো মারব।" তখন স্প্রিংটা অন্যদিকে কাজ করল, সে তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিল। বাড়ি ফিরে এই গল্পটা বলাতে, মা বাবার উপর ভারি রেগে গেলেন, যাকে তাকে এতটা বাড়ির ভিতরে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু বাবা খুব হাসছেন। পাশ্চাত্য জগৎটা তিনি চিনতেন ভালোই, তাই একটুও আশ্চর্য হন নি। মাকে বলতে লাগলেন, "অমৃতাকে নানা অবস্থায় নানা লোকের সঙ্গে মিশতে শিখতে হবে, ও তো তোমার মতো ঘরে বসে থাকবে না। যদি একটু চেষ্টা করে ও একদিন সরোজিনী নাইডু হবে।"

যাই হোক এই কাণ্ডের পরও যে কাজটা তখন মার এবং আমার কাছে ভয়ানক খারাপ এবং অক্ষমনীয় মনে হয়েছিল এবং আমরা দুজনেই খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম যে, বাবা ওদের সঙ্গে কিছু খারাপ ব্যবহার করলেন না। এমন কি রবিঠাকুরের কাছে নিয়ে যাবার যে কথাটা ছিল সেটাও স্থির রাখলেন। আমি তাঁর কাছে এদের জাদুবিদ্যার গল্প করেছিলাম। উনিও এদের দেখবার জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন। অলৌকিক অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস না থাকলেও রবিঠাকুর মনে করতেন সব বিষয়েই পরীক্ষা করে দেখবার চেষ্টা করা উচিত।

সেটাই বৈজ্ঞানিক। অনুসন্ধান করব না কেন? তাই একটা দিন ঠিক হয়েছিল রুশ-দম্পতিকে নিয়ে যাবার জন্য।

"বাবা, আমি ওদের সঙ্গে যাব না, লোকটা ভারি বিশ্রী""

"তা কি হয় মা—সব ঠিক হয়ে আছে এখন তুমি না গেলে কবি কি ভাববেন? তাছাড়া জীবনে কত রকম অবস্থায় কত রকম মানুষের সঙ্গে দেখা হবে, নিজের শক্তিতে বুদ্ধিতে সব সময়ই তুমি ঠিক পথে স্থির থাকবে, এ তো আমি জানিই। জগতে খারাপ লোক আছে বলে কি তুমি গর্তে ঢুকে থাকবে?"

দুপুরবেলা বাবা ও আমি রুশ-দম্পতিকে নিয়ে কবির কাছে গেলাম—ওদের দোতলার পাথরের ঘরে বসিয়ে আমি তিন তলায় ওঁকে খবর দিতে গেলাম। পাথরের সেই ঘরটা চোখের সামনে ভাসে—নিচু নিচু চৌকিতে গদীগুলি জাপানী মাদুর দিয়ে মোড়া আর কুশনগুলিও জাপানী মাদুরের। ঐ ঘরের পরে বহু পরিবর্তন দেখেছি—ঐ ঘরেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়েছে। উপরে গিয়ে দেখি তিনি তৈরী হয়েই আছেন, একটা কাগজে কয়েকটা প্রশ্ন লিখে নিয়ে কাগজটা বইয়ের মধ্যে পুরে উঠে দাঁড়ালেন, "চল জাদুকরীকে দেখা যাক।" ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে আমরা নেমে এলাম। ওরা অপেক্ষা করছিল, দু-চার কথার পর মেয়েটি চোখে কাপড় বাঁধল, তার স্বামী এসে ওঁর নাড়ি ধরল। মেয়েটি কিছু বলতে পারল না কিন্তু সে যে চেষ্টা করছে বোঝা গেল। কবি তো ওদের অপ্রস্তুত করতে চান না, ব্যাপারটা বুঝতে চান, তিনি বলতে লাগলেন— "কি করলে সুবিধা হবে—আমি যদি কাগজে লিখি সুবিধা হবে?" মেয়েটি বললে, "হতে প◌ারে।" উনি তখন কাগজে লিখে কাজগটা উল্টে রাখলেন। তবুও কিছু হয় না। মেয়েটির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমা হল। সে উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারী করতে লাগল—তারপর বারান্দায় চলে গেল—"There is a wall before me, there is a wall before me—আমার সামনে একটা দেওয়াল, সামনে একটা দেওয়াল—" বলতে বলতে বারান্দায় দৌড়াতে দৌড়াতে আরো জোরে জোরে বলতে লাগল—"আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না", তার কপালের ঘাম ঝরে

পড়ল, নিঃশ্বাস দ্রুত হল, তারপর ঐ রকম বলতে বলতে ঘরের বাইরে এসে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গলি দিয়ে দৌড়ে চলে গেল—ওর হতবুদ্ধি স্বামীও ওর পিছন পিছন ছুটল, চিৎপুরের রাস্তায় সাহেব মেমের এই দৌড় দুপাশের দোকানদারেরা কি রকম উপভোগ করছে ভেবে আমার হাসি পেয়েছিল খুব। আমি মুখে কাপড় দিয়ে হাসছি। বাবা বললেন, "তুই এখানে থাক। আমি ওদের পৌঁছে দিয়ে আসি।" কবি আমাদের পিতা-পুত্রীর বুদ্ধির উপর যথেষ্ট কটাক্ষ করলেন এবং অধ্যাপকদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কি প্রত্যাশা করা যায়, তাও বললেন। এদিকে বাবাও ক্ষুব্ধ, তাঁর ক্ষোভের কারণ ওরা কবির কথা বলতে পারল না, আর তাঁরটা পারল! রুশ জাদুকরের উপাখ্যান এইভাবে শেষ হল।

এই সব ঘটনা যখন চলছিল, তখন মির্চা ইউক্লিড আমাদের বাড়ি আসত কিন্তু সে সময়ে তাকে লক্ষ্য করি নি। আমার সঙ্গে কোনো কথা হয়েছে বলেও মনে পড়ে না। যেদিনের কথাটা মনে আছে সেটা একটা বিকেল। বাবা তাঁর লেখবার টেবিলে বসেছিলেন। আর উল্টোদিকের একটা চেয়ারে বাবার দিকে মুখ করে সে বসেছিল। বাবা আমাকে ডেকে পাঠালেন—"এই আমার মেয়ে অমৃতা, এই আমার ছাত্র মির্চা ইউক্লিড"—সে উঠে দাঁড়াল। আমি ওকে একপলক দেখলাম। ওর চোখে পুরু চশমা, চুল হালকা, চোয়াল উঁচু, মুখ চৌকো। বিদেশীদের এই অভ্যাসটা আমার খুব ভাল লাগে, মেয়েদের দেখলে ওরা উঠে দাঁড়ায়। আর আমাদের ছেলেরা? হয় তো পায়ের উপর পা তুলে বসে থাকবে, নয় তো ন্যাকামি করবে, বা এমন ভাব করবে যেন মেয়েদের উপস্থিতি টেরই পাচ্ছে না।

বাবা বললেন, "ইউক্লিড যেখানে থাকে সেখানে ওর খুব অসুবিধা হচ্ছে তাই আমি ওকে এখানে থাকতে বলছি, ওর জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দাও।"

এক মুহূর্তের জন্য আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল, আমি বললাম—"বাবা বাড়িতে আবার একজন ইংরেজ কেন?" বাবা আমার আপত্তিতে বেশ একটু বিরক্ত হলেও খুব সাবধানে বাংলায় বললেন—"এ ইংরেজ নয়, ইউরোপের একটা ছোট্ট দেশের মানুষ । আর ইংরেজ হলেই বা কি, এই তোমার শিক্ষা হল ?"

এইবার আমি মির্চা ইউক্লিডের দিকে তাকালাম। বিদেশী নাম সম্বন্ধে আমার তখনও কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। নইলে হয়তো নাম শুনেই বুঝতাম যে ওটা অ্যাংলো- স্যাক্সন নাম নয়—যা হোক চেহারা দেখে বুঝলাম এ ইংরেজ নয়। রঙ যদিও সাদা, চুল কালোই, লালচে নয়,—ব্যাকব্রাশ করা, কপালের দুধার দিয়ে উঠে গেছে। গালের হাড় উঁচু, একটু পাহাড়ীদের মতো। সে চকিতে একবার আমার দিকে চেয়ে চোখ সরিয়ে নিল।

আমার আপত্তি অবশ্য ঠিক ইংরেজ বলে ছিল না, কিন্তু এটা বলাই ভালো মনে করে বলেছিলাম। এ সময়ে বিদেশীদের যাতায়াত ও কলকাতার 'এলিট'দের সঙ্গে মেলামেশার জন্য আমাদের বাড়ির সাজগোজ বদলান হচ্ছিল একটু একটু করে। এ বিষয়ে আমিই অগ্রণী ছিলাম, মা এসব একেবারেই পারতেন না। বাবা আর আমি এগবার্ট এন্ড্রুজ নামে একটা নীলামের দোকান থেকে নিত্য নূতন আসবাব নিয়ে আসতাম। দিল্লী কানপুরের পিতলের জিনিস পালিশ করা, দরজার হাতল থেকে ছিটকিনি পর্যন্ত, আমাকেই করতে হতো। এই বাড়ি পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ আমাদের মতো আধাসাহেবী বাড়িতে যথেষ্ট কষ্টকর ছিল। একে তো বাড়িতে অনেক লোক, তাছাড়া গ্রাম থেকে যখন তখন গ্রাম্য আত্মীয়স্বজন রোগের চিকিৎসা করাতে, গ্রহণের গঙ্গাস্নান করতে, কালীঘাটে পূজো দিতে উপস্থিত হতো সদলবলে। আমার মা কাউকে ফেরাতেন না। রোগ নিয়ে কেউ এলে মা সুপটু নার্সের মতো তাদের সেবা করতেন। মার নিজের কোনোদিন কালীঘাটে যাবার ইচ্ছা ছিল না। মার বাপের বাড়ি সম্পূর্ণ ব্রাহ্মভাবাপন্ন—কিন্তু গ্রামের কোনো বৃদ্ধা আত্মীয়া এলে আমাদের শেভরলে গাড়ি করে প্রতিদিন তাঁকে কালীঘাট পাঠাতেন—গাড়ি করে ঘড়া ঘড়া গঙ্গাজল আনতেন। মার দরজা সর্বদা সবার জন্য খোলা থাকত। কিন্তু এর ফলটা আমার পক্ষে খুব ভালো হতো না। কারণ আমি অল্প কিছুদিন হল একলার জন্য একটি ঘর পেয়েছি— অবশ্য সম্পূর্ণ একলা নয়—এ ঘরে আমার সঙ্গে রাত্রে শান্তি এবং আমার এগার বছরের ছোট বোন সাবিত্রী অর্থাৎ 'সাবি' শুতো। কিন্তু ঘরটা আমারই – আমি ঐ ঘর সুন্দর করে সাজিয়েছি। সব নিচু নিচু আসবাব করেছি—খাটের পা কেটে সেটা নীচু করা হয়েছে। আসবাব অবশ্য সামান্যই। সাদা কালো দাবার ছকের মতো পাথরের মেঝে, পালিশ করা। ধূপ আর ফুলে সর্বদা সুগন্ধি রাখতাম সে ঘর। যে কেউ আসত, বলত—ঘর তো নয়, মন্দির। মাঝখানের দেওয়ালে রবিঠাকুরের একটা ছবি ছিল— মাথায় টুপি পরা—সেই

ছবিটা আমার ভারি আশ্চর্য লাগত, ঘরের যে কোণেই তুমি থাক, মনে হবে তোমার দিকে তাকিয়ে আছেন। এড়াবার পথ নেই।

অবশ্য যখনই দেশ থেকে আত্মীয়স্বজন তাঁদের পোঁটলাপুটলি নিয়ে উপস্থিত হতো তখনই আমার ঘর ছেড়ে দিতে হতো, কারণ বাড়ির মধ্যে বাড়তি ঘর ঐ একটাই। তারা দেওয়ালে হাতের ছাপ লাগিয়ে, পর্দায় হাত মুছে, টেবিলে জলের দাগ করে, গ্রহণের স্নানপুণ্যে তৃপ্ত হয়ে যখন চলে যেত তখন আবার আমাকে নূতন করে কাজে লাগতে হতো। মার এ সবে কিছু এসে যায় না। বাহ্যবস্তুর দিকে তিনি তাকান না, মানুষই তাঁর কাছে মূল্যবান। মানুষের মনে কষ্ট দিয়ে ঘর সাজাতে হবে এটা তাঁর একেবারেই মনে আসে না।

কিন্তু আমার আসে যায় – আমি সাজানো গোছানো বাড়িতে বসে কবিতা পড়তে এবং লিখতে ভালোবাসি। আর ভালো লাগে কাকার কাছে স্বাধীনতা যুদ্ধের গল্প শুনতে। যে যুদ্ধটা আমাদের চারপাশে চলেছে অথচ আমাদের গায়ে আঁচ লাগছে না। কাকা আমার বাবার জ্যাঠতুতো ভাই, ওদের বাড়িতেই একটু আধটু এদিকে ঝোঁক আছে। কাকার বড়দাদা জেলে আছেন সেটা আমার খুব গর্বের বিষয়। আমি সহপাঠীদের তাঁর গল্প করি। কিন্তু আমাদের বাড়িতে এসব নেই, অর্থাৎ বাবা এসবের আমল দেন না। আজকে যখন পিছন দিকে তাকিয়ে ভাবি তখন বেশ মনে পড়ে বেশির ভাগ উচ্চশিক্ষিত উচ্চবিত্ত লোকেরা সে সময়ে স্বাধীনতার সম্ভাবনার কথা ভাবতেই পারতেন না। একটা কথা প্রায়ই শুনতাম–"এই করে এরা ইংরেজ তাড়াবে। তাহলেই হয়েছে!" কি করে তাড়াবে সে সম্বন্ধে অবশ্য তাঁদের কোনো পরিকল্পনা শুনি নি। যাহোক অল্পবয়সীদের মনে এই সব দুঃসাহসিক ঘটনার বৃত্তান্ত মোহ সৃষ্টি করছিল–ডাণ্ডি মার্চ ও দপ্তরে ঢুকে সাহেব নিধনের নানা ঘটনাবলীর উত্তাপ পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা ছাড়িয়ে আমাদের মনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেত। একটা কাজ আমরা করতে শুরু করেছিলাম, সম্পূর্ণভাবে বিলাতি দ্রব্য বর্জন। তাই আমার মুখে ও-কথাটা নেহাৎ বেমানান

ছিল না—"বাড়িতে আবার একজন ইংরেজ কেন?" যদিও কিন্তু আমার আপত্তির আসল কারণ ছিল পাছে এর জন্যও আমার ঘরটি ছাড়তে হয়।

বাবা আমায় নিশ্চিন্ত করলেন, "একতলার সামনের ঘরে ও থাকতে পারবে, ঘরটাকে পার্টিশন করে দিলে সামনের দিকে লোকজন এসে বসতে পারে বা তোর কাকা থাকতে পারে আর ভিতরের দিকে ইউক্লিড থাকবে।"

সেই দিন সন্ধ্যেবেলা 'ন্যাশনালিজম' প্রবন্ধটা দিলেন বাবা, বললেন—"এ বইটা পড়। ইংরেজ হলেই কি সে শত্রু? এমন দিন একদিন আসবে যেদিন প্যাট্রিয়টিজম একটা অপরাধ বলে গণ্য হবে।" সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত আমি বইটা নাড়াচাড়া করলাম, ভালো করে কিছুই বুঝলাম না। বাবা সব সময় আমাকে এ রকম নাগালের বাইরের বই দিতেন। আমিও না বুঝেই পড়তে ভালোবাসতাম, এই বোঝা না-বোঝার আলোছায়াময় জগৎটা আমার সব সময় ভালো লাগতো। যেন বুঝতে পারছি অথচ পারছি না, অপার রহস্যময় ঘোমটা পরা এই বিশ্বের অধরা ছায়াই তখন আমার কবিতার প্রেরণা ছিল।

দু-তিন দিনের মধ্যেই সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেল, পার্টিশন করেও ঘরটা খবু ছোট নয়, একটা ছোট খাট, টেবিল, চেয়ার, একটা বড় বেতের সোফা, একটা পিয়ানো ও টুল আর মাঝখানে একটা গোল টেবিলের পাশে দাঁড় করানো ল্যাম্প—গৃহসজ্জা মন্দ কি? পর্দাও টানিয়েছি একটা গলির দিকের দরজায়। এই ঘরটা আমার ঘরের ঠিক নিচে।

সকালবেলা খাবার টেবিলে মির্চা ইউক্লিডের সঙ্গে বাবা নানা বিষয়ে গল্প করতেন, কি পড়বে বলতেন। একদিন বাবা বললেন, "তোমরা দুজনে আমার কাছে 'শকুন্তলা' পড়, 'হিতোপদেশ' থেকে সংস্কৃত শিখে লাভ নেই। একটা উপভোগ্য বই হলে ভালো লাগবে।" পরের দিন থেকে আমাদের একসঙ্গে পড়া শুরু হল। মাদুর পেতে মাটিতে বসে সাহেবের সঙ্গে সংস্কৃত পড়া দেখতে সেকালের মানুষদের কেমন লাগত কে জানে! আমি দেখেছি বাবার বাঙালী ছাত্রদের চোখে ঈর্ষামিশ্রিত বিস্ময়, আমি দেখেছি বর্ষীয়সী মাতৃস্থানীয়াদের মুখে

চোখে সন্দেহ ও আপত্তি আর সমবয়সীদের চোখে কৌতুক। বাবার কিন্তু ভ্রূক্ষেপ ছিল না। মা ও বাবা দুজনেই খবু সহজভাবে ওর উপস্থিতি মেনে নিয়েছিলেন। সে ক্রমে ক্রমে বাড়ির একজন হয়ে যাচ্ছিল।

বাবার কাছে পড়বার সময় আমি ইচ্ছে করেই মাদুরে বসতাম। বাবা বসতেন আমাদের দুজনের মাঝখানে—একটা সোফায়। আমি বুঝতাম মাদুরে বসতে মির্চার খবু ভালো লাগছে, একে নূতনত্ব তারপর আমাদের সঙ্গে একাত্ম হবার ইচ্ছা। ও প্রত্যেকটা জিনিষ দেখে, খুঁটিয়ে দেখে। আমাদের সব কিছু জানতে চায় আর প্রত্যেকটা ব্যাপারে একটা অর্থ খুঁজে বের করে।

মা বলতেন, "ইউক্লিড খুব ভালো ছেলে, ভদ্র শান্ত বিনীত। তুমি আমায় মা বলো না কেন মির্চা, মিসেস সেন বলো কেন? মা বলবে।"

তারপর থেকে সে মা বলতো। কিন্তু সে আমায় বলেছিল ওদের দেশে এত অল্পবয়সী মেয়েদের কেউ মা বলে না, তারা রাগ করে। আমার মার বয়স তখন কতই বা, বত্রিশ কি তেত্রিশ হবে। কিন্তু লালপেড়ে শাড়ি, কপালে সিঁদুর আর পায়ে আলতা-পরা পরমাসুন্দরী আমাদের মা কেবলই মাতৃমূর্তি, তাঁর বয়সের কথা কে ভাবে! কি জানি, ওদের দেশটা তো ভারি অদ্ভুত, মেয়েদের মা বললে রাগ করে! সেজন্য বয়সের হিসাবের দরকার কি!

সকালবেলা খাবার টেবিল থেকে সকলে উঠে চলে যেত। আমরা বসে বসে গল্প করতাম। তারপর আর একটু উঠে লাইব্রেরীর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করতে করতে ঘণ্টা দুই কেটে যেত প্রায়ই, কেউ লক্ষ্যই করত না। তিনটে ঘর জুড়ে বাবার সাত-আট হাজার বইয়ের লাইব্রেরী—ঐখানেই আমাদের গল্প চলত। সিঁড়ি দিয়ে বাবা নেমে গেলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না, এ রকম কত দিন হয়েছে। এমন কি, আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করছ কেন—তাও নয়। যদি মীলুর সঙ্গে কিম্বা গোপালের সঙ্গে গল্প করতাম তাহলে ঠিকই বকুনি খেতাম। কিন্তু মির্চা ইউক্লিডের সঙ্গে নিশ্চয় শাস্ত্র আলোচনা করছি, পরস্পরের উন্নতি হচ্ছে!

বই হাতে করে আমি উপর থেকে নেমে আসছি মির্চা আমার পথের মাঝখানে ধরল—"তুমি নাকি কাল একটা দার্শনিক কবিতা লিখেছ?"

"হ্যাঁ"—আমার গতকালের কবিতাটি নিয়ে বাবা খুব উচ্ছ্বসিত। ওর মধ্যে একটা লাইন আছে—"কালের যবে হারিয়ে যাবে মুহূর্ত নিমেষ", এ-লাইনটা বাবার খুব ভালো লেগেছে, এর মধ্যে একটা বিরাট তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন আছে—প্রশ্নটাই হচ্ছে তত্ত্ব। আমার বয়স যখন চৌদ্দ অর্থাৎ দু-বছর আগে, পুরীর সমুদ্রের তীরে বসে আছি সন্ধ্যেবেলা, আমার হঠাৎ মনে হল এটা সকাল—একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল, সেটা আমি কবিতায় লিখেছিলাম—'লহ মোরে, লহ মোরে, মোরে চল লয়ে, আমার এ স্বপ্নস্রোতে যেথা গেল বয়ে।' সে দেশটা কি রকম?— 'আশাহীন ভাষাহীন শেষ যেথা সব, পান্থহীন পথ পরে নাহি কলরব। জন্মহীন মৃত্যুহীন নাহি রবে কাল, নাহি রাত্রি নাহি দিন না হয় সকাল!' বাবা বলেন 'কাল' সম্বন্ধে রু'র অনুসন্ধানী চিন্তা রীতিমত শাস্ত্রমুখী। 'কাল কি?' বাবার এই উচ্ছ্বাসে আমি খুব গর্বিত! কিন্তু যখন বাবা আমাকে নির্দেশ দেন, তুমি এই রকম লিখে আন, তখন আমার ভালো লাগে না। কবিতার স্বাভাবিক গতি বন্ধ হয়ে যায়—একটা ডানা মেলা পাখি ডানা ভাঁজ করে পায়ের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে। 'ভোগপাত্র' কবিতাটি লিখে তাই আমি খুশী নই।

মির্চা মুচকি হেসে বললে, "তুমি কি দার্শনিক কবিতা লিখবে এতটুকু মেয়ে!"

"আমি মোটেই এতটুকু নই...তাছাড়া আমি তো দার্শনিক।"

"তুমি দার্শনিক?"

"নিশ্চয়ই। যে দেখে বা দেখতে চায় সেই দার্শনিক! আমি তো দেখি, দেখতে চাই।"

"আচ্ছা চল, তোমার কবিতা শোনাবে।"

আমি ওর ঘরে ঢুকলাম। আমি কয়েকদিন হল ওর ঘরে ঢুকছি, কেউ আমাকে বলেনি যে ওর ঘরে ঢোকা ঠিক নয়, তবু পায়ে একটু বাধা আসে। এটা কি? আমি বুঝতে পারি না এই ঈষৎ বাধা আর সংকোচটা কি। আমি স্বচ্ছন্দ নই তবু খুব স্বচ্ছন্দ ভাব দেখিয়ে বসলাম বড় বেতের চৌকিটাতে। মাঝখানে টেবিল তার ওপাশে হেলান দিয়ে ও ওর বিছানায় বসেছে।

"বোঝাও তোমার দার্শনিক কবিতা।"

"না না, আমি রবীন্দ্রনাথের কবিতা বলি শোনো—নতুন তাঁর যে বইটা বেরিয়েছে ওটা তো উনি আমাকে উৎসর্গ করেছেন, সেই কবিতাটি শোন!"

"সে কি? তোমাকে উৎসর্গ করেছেন!"

"অত চমকে উঠলে কেন? পারেন না কি?" আমি মনে মনে হাসছি, ও বিশ্বাস করেছে, সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছে, ওকে ঠকাব। পরে কাকার কাছে জানতে পারে জানুক—

"তুমি কি শুনেছ মোর বাণী,

হৃদয়ে নিয়েছে তারে টানি,

জানি না তোমার নাম, তোমারেই সঁপিলাম

আমার ধ্যানের ধনখানি।"

থেমে থেমে অনুবাদ করলাম, অনুবাদ যে কি পদার্থ হল, বোঝা শক্ত নয়। ও ভ্রুকুটি করে রইল। কথাটার ভিতরের অর্থ বোঝবার চেষ্টা করছে। আমি উঠে পড়লাম। ও বললে, "জানি না তোমার নাম-লিখলেন কেন?" ও বুঝতে পেরেছে আমি ধোঁকা দিয়েছি।

"ঐটাই তো গোপনীয়।"

এই রকম কথাবার্তা মির্চা ইউক্লিডকে বিভ্রান্ত করে, একে ভাষার বাধা তো আছেই দুপক্ষেই—তাছাড়া ভাবের বাধাও। আমরা ঠিক কি ভাবি, ও বোঝে না। সেই না-বোঝার অন্ধকারে ও হাতড়ে বেড়ায়, ওর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, ওর

গলার স্বর কাঁপে—‘ধরা দেবে না অধরা ছায়া...রচি গেল প্রাণে মোহিনী মায়া’—এর মধ্যেও মোহিনী মায়া নেমে আসছে কি? কি জানি!

"ঐ মালতী লতা দোলে—পিয়াল তরুর কোলে- বাড়ির ভিতর থেকে বাইরে যেতে গেলে মির্চার ঘরের সামনের একটা সরু গলি দিয়ে যেতে হয়—ঐ গলির পূব দিকে উঠোন। ঐ উঠোনের থেকে সিঁড়ি দিয়ে গলিতে উঠতে হয় আর খাবার ঘরেও। মির্চার ঘরের ঠিক উপরে আমার শোবার ঘর। বাইরের দিকে অর্থাৎ দক্ষিণের দিকে নিচেও একটা বারান্দা আছে, উপরেও একটা। নিচের বারান্দার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটা মালতী নয়, মাধবীলতা নিচ থেকে উপর পর্যন্ত উঠে গেছে। সেটা বারমাস ফুলে ভরে থাকে, সাদা লাল রঙের মঞ্জরী, আমি ঐ লতাকে দোলাই। ওর ঘরের সামনের গলিটা পেরিয়ে বারান্দার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে ঐ লতাটার আশ্রয়ে এসে দাঁড়ালে আমি জানি একটু পরে মির্চা উঠে আসবে, পর্দার ফাঁক দিয়ে আমাকে আসতে ও দেখেছে। আমি যে ওর জন্য অপেক্ষা করে আছি, সেটা আমি স্পষ্ট করে জানি না, কারণ জানতে চাই না—তবু আমি উৎকর্ণ—ও কেন আসছে না, দেখতে পায় কি? কি করা তাহলে, এখানে একটা গ꞉ান গুনগুন করব, না, কবিতা? কী অন্যায়! কী অন্যায়! এমন তো হওয়া ভালো নয়—যা ভালো নয় তা কখনো করব না, আমি দার্শনিক হব। দার্শনিক যে সত্যাশ্রয়ী, সত্যসন্ধানী। সে কখনো লুকোচুরি করে না, তাই নয় কি? আমি লতাটা ধরে আছি— আমার ভিতরটা মৃদু মৃদু কাঁপছে আশায় ও আশঙ্কায়। এমন সময় রাস্তা থেকে সিঁড়ি দিয়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী গায়ে, চটির বিশ্রী শব্দ করে 'ম'-বাবু উঠে এলেন। 'ম' বাবু আমার এক নিকট আত্মীয়ার দেবর। আমি জানি ওর মনের ইচ্ছাটা কি—ওর সঙ্গে আমি কথা বলি, কারণ ও তো আমাদের একরকম আত্মীয়ই।

"এই যে নমস্কার—"

"নমস্কার।"

"আমি সামনের মাসে ইংল্যাণ্ড যাচ্ছি।"

"ভালোই তো।"

"কি জানি কতদিন লাগবে ব্যারিস্টারী পাশ করতে।"

“মন দিয়ে পড়লে বেশিদিন তো লাগবার কথা নয়!”

“মন কি আর দিতে পারব?”

এই সেরেছে! এইবার শুরু হবে স্তবগান। এই সব প্যানপ্যানে খোসামুদে ছেলেগুলোকে দুচক্ষে দেখতে পারি না। এ-রকম বেশ কয়েকটি আছে। মীলু আর আমি খুব হাসি এদের নিয়ে। কিন্তু আজ আমার ভয় করছে। মির্চা যদি বেরিয়ে এসে একে দেখে তাহলে ভ্রূকুটি করবে। মুখ অন্ধকার হবে। ও কি ভেবে নেবে কে জানে!

যা ভয় করেছি তাই। পর্দা সরিয়ে মির্চা বেরিয়ে এল, এক পা এগিয়ে ওকে দেখেই আবার ঘরে ঢুকে গেল। রীতিমত অভদ্রতা। ‘ম’ বাবু কি ভাবল! মহাবিপদ এদের নিয়ে, এরা সবাই সমান। আমি অস্থির হয়ে উঠলাম, “যান না উপরে, মা উপরে আছেন, এখানে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যাথা করবার দরকার কি?”

“আপনার পা ব্যাথা হয় না? না,কারোর জন্য অপেক্ষা করছেন? আমি প্রতিবন্ধক?” ‘ম’ বাবু ভিতরে চলে গেল, আহত, বাণবিদ্ধ।

আমার কান্না পাচ্ছে, খুবই কান্না পাচ্ছে, এদের কথা আমার ভাববার দরকার কি ! এরা কে কি ভাবল তাতে কি এসে যায়। আমার কি ভাববার কিছু নেই? কতদিন হয়ে গেল আমি শান্তিনিকেতনে যাইনি!

ওখানে না গেলে আমার মন শান্ত হবে না। শান্তিনিকেতনে ছাতিমতলায় যে পাথরের ফলকে লেখা আছে—

“তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।” মহর্ষিদেব ঈশ্বরকে চিনতেন, তিনিই তাঁর প্রাণের আরাম ছিলেন — হবেও বা। আমি তো ঈশ্বরকে চিনি না। বাবা সেদিন থিয়লজিয়ানদের যুক্তি বোঝাচ্ছিলেন—কানের ভিতর যে যন্ত্রটা নিপুণভাবে তৈরী, যে হ্যামার আর এনভিল বসানো আছে, সে কি অমনি হয়েছে? কেউ তো করেছে, সে কে? এটাই একটা ঈশ্বরের অস্তিত্বের অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ। অমন করেও হয়তো ঈশ্বরের প্রমাণ হয়, কিন্তু সে

ঈশ্বর কি প্রাণের আরাম হতে পারে? যাকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়,যাকে দেখলে বাতাস মধুর হয়—দূর ছাই, শ্রাদ্ধের মন্ত্র মনে আসে কেন কে জানে— আসলে এটা তো প্রেমের মন্ত্র। সেদিন স্টোর রোডের বড় লাল বাড়িটাতে আমরা গিয়েছিলাম, কলকাতার সব 'এলিট'রা এসেছিলেন অতুলপ্রসাদ সেনের গান শুনতে, অতুলপ্রসাদ সেন হারমনিয়াম বাজিয়ে গাইছিলেন—" তুমি মধু, তুমি মধু, তুমি মধুর নিঝর, মধুর সায়র আমার পরাণ বঁধু—"উনি নিশ্চয় ঈশ্বরের কথা বলছিলেন। বৈষ্ণবসাহিত্যে বঁধু তো ঈশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর, রাধাও ঈশ্বর। সভায় সবাই চোখ বুজে বসে আছে, কারু কারু চোখ দিয়ে জল পড়ছে—কেন? ওরা কি ঈশ্বরকে বুঝতে পারছে? বাজে কথা, আমি তো জানি 'এলিট' হলে কি হবে, একেক জন কি মিথ্যাবাদী আর স্বার্থপর! আমার যতদূর ধারণা মিথ্যেবাদীদের সঙ্গে ঈশ্বরের যোগাযোগ নেই। আর মীলু? ওর কি দৌড় আমার জানা আছে। ঈশ্বর আমারও ধারে কাছে নেই, ওরও না। আমি চোখ বুজলাম—গানটা কিন্তু খবু সুন্দর গাইছেন। ভদ্রলোকের গলায় কি দরদ! 'দরদ' কথাটা ভালো, ঠিক মানেটা বোঝায়— আমার কিন্তু ওঁর মুখের দিকে দেখবার ইচ্ছে নেই—আমিও চোখ বুজে আছি—কি চমৎকার গলা, সত্যিই "বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী— ঐ সুরের আলোয় আমার ভিতরটা উজ্জ্বল, আমি দেখতে পাচ্ছি অন্য একটা দেশ, নিচু একটা বারান্দার ছাতের এক পাশে উঠে গেছে নীলমণি লতা, তাতে গুচ্ছ গুচ্ছ নীল ফুল, ওর ইংরেজী নাম উইস্টেরিয়া— আর বারান্দার টেবিলের উপর ঝুঁকে একজন লিখছেন তার সাদা কোঁকড়া চুলের উপর ভোরের আলো পড়েছে—তিনি লিখছেন আর গুনগুন করে গান গাইছেন, সে গানটা অন্য, কিন্তু দুটো গান আমার মনের মধ্যে মিশে যাচ্ছে—"তখন অনলে অনিলে জলে, মধু প্রবাহিনী চলে, বলে মধুরং মধুরং।"

দেখ তো, কেন এদিনটা ভুলেছিলাম। আমার পক্ষে একজন মানুষ ছাড়া এমন শান্তির উৎস, প্রাণের আরাম আর কেউ নেই—থাকতে পারেনা, হওয়া

উচিত নয়। আমার ভিতরটা কাঁপছে, মনে হচ্ছে নিজের কাছে যেন সত্যভঙ্গ করছি! কি সে সত্য? আমি জানি না, জানি না।

মির্চার কাণ্ড দেখেছ! অভদ্র, অভদ্র। ওর ঘরের সামনে দিয়ে 'ম' বাবু চলে গেল তবুও বেরিয়ে এল না—আমিও ওর ঘরে যাব না। আজ এ-প্রতিজ্ঞাটা রাখব, রাখবই রাখব। তাতে ওর সঙ্গে যদি একেবারে বরাবরের মতো কথা বন্ধ হয়ে যায় তাও ভালো। আমি অন্যমনস্ক হয়ে মাধবীলতা থেকে একটা বড় গুচ্ছ ছিঁড়ে নিয়ে উপরে যাব বলে এগিয়ে গেলাম। ওর ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখি তিনি নিবিষ্ট মনে বই পড়ছেন—কে সামনে দিয়ে এল বা গেল দেখতেই পাচ্ছেন না! আমি পর্দাটা ফাক করে ফুলটা ছুঁড়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছি—পিছন থেকে ওর ডাক শুনতে পেলাম—"অমৃতা! অমৃতা!"

"মা...মা...মা..." ডাকটা যেন মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ভেসে এল। মহাসিন্ধু নয়, মহাজগৎ থেকে, সামনে তাকিয়ে দেখি আমার ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। আমার হাতটা টেলিফোনের উপর—টেলিফোন বাজছে—"মা তুমি টেলিফোনটা তুলছ না কেন?" বহু কষ্টে টেলিফোনটা তুললাম— আমার হাত অসাড়, আমি অস্থির, একই সঙ্গে একই মুহূর্তে এত দূরত্ব পার হওয়া যায়? আমি তো এখানে ছিলাম না, কখনই নয়।

এটা স্মৃতি নয়। আমার শরীর এইখানে চেয়ারে নিশ্চয় পড়েছিল কিন্তু আমি মহাকালে অনুপ্রবিষ্ট, যার সামনেও নেই পিছনেও নেই। যেখানে 'নাহি রাত্রি, নাহি দিন, না হয় সকাল'। এই শরীর ও মনের বিচ্ছেদ, এই একই সঙ্গে দুই সময়ে, অর্থাৎ আমরা যা দুই সময় বলে দেখতে অভ্যস্ত, সে-রকম দুই সময়ে উপস্থিতি নিশ্চয় শরীরকে আঘাত করে। তাই আমি অবসন্ন। আমার ছেলের বয়স ত্রিশ বছর, সে একজন বয়স্ক মানুষ, ছেলেমানুষ নয়, সে কি ভাবছে কি জানি—কিন্তু ও ওর বাবার মতো, না বললে কিছুই জিজ্ঞাসা করবে না। আস্তে আস্তে ও ঘর থেকে চলে গেল। আমি ওর অপসৃয়মান মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছি! কে গেল, কোথায় গেল, এর পরে কি, বুঝতে পারছি না।

লেখা এসে টেলিফোনটা তুলে নিল আমার হাত থেকে–ওপারে কেউ ছিল—তাকে বলল, ‘মা তো শুয়ে পড়েছেন,' তার নম্বরটা নিল। এখন আমি সব বুঝতে পারছি—ঐ লোকটার সঙ্গে কথা বলার দরকার, কিন্তু ভালোই হয়েছে। কি কথা বলব, যদি ভুল হয়। লেখা বললে, “মা আপনি শুয়ে পড়বেন চলুন। আমি আপনাকে বলছি, আপনি কারুর সঙ্গে কথা বলুন।”

“আমার কিছু হয়নি লেখা, কিছু না।”

“দেখি তুলে তার বুকের আচ্ছাদন,
সেখানে এখনও বাস করে কিনা মন,
হন্যমান এ শরীরের মাঝে যার
অজর অমর সত্তার সম্ভার
পদে পদে গায় অসম্ভবের গান,
তাই শুনতেই আজো পেতে আছি কান”

অসম্ভব, অসম্ভব। জীবন কী অসম্ভবের সম্ভাবনায় পূর্ণ—এত কাল পরে কি এমন করে সব মনে আসতে পারে—এত বেদনা নিয়ে, এত রক্তক্ষরণ হয়?...

“মা, কি বলছেন চোখ বুজে—মন্ত্র জপ করছেন নাকি?”

“কবিতা, কবিতা, অনেক দিন পরে কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে

“শস্ত্র ছেঁড়ে না, অগ্নি দহে না যারে
দেখব তারেই অশ্রুর পারাবারে
পাগলের মতো দু-হাত বাড়ায়ে ধরে
অধরা প্রাণের আবার স্বয়ংবরে
চলো যাই দূরে যেখানে দাঁড়ায়ে কাল
ভেঙ্গে চুরে দিয়ে ঝেড়ে ফেলে জঞ্জাল
শুধু হাতে নিয়ে মুক্ত প্রাণের দীপ
নূতন বধূর কপালে পরাবে টিপ...

সেখানে যাবই যেখানে রয়েছে থেমে

বাসররাত্রি, অবিচল কারু প্রেমে..."

এতক্ষণে বুঝতে পারছি কেন আজ এক বছর ধরে আমার মনে মনে ক্রমে ক্রমে কোথাও যাবার ইচ্ছাটা এত প্রবল, এত দুর্দমনীয় হয়ে উঠছে। কেবল মনে হয় কোথাও যাই, কোথাও যাই, দূরে—অনেক দূরে—আর এখন মনে হচ্ছে এই বারান্দাটা দিয়ে বেরিয়ে আকাশে ভেসে কোথাও চলে যাই—

লেখা বলছে, "শুতে চলুন।"

আমি বলছি, "চলো যাই, চলো যাই, চলো যাই।"

আমি হাসছি। লেখাও হাসছে—"চলুন, শুয়ে পড়বেন চলুন।"

রাত্রি অনেক হয়েছে, আমার স্বামী ঘুমোন নি। সেপ্টেম্বর মাসে সেরগেই এসেছিল, আজ অক্টোবর শুরু। এই এক মাস পর উনি লক্ষ্য করেছেন আমি এখানে নেই। কি হয়েছে উনি জিজ্ঞাসা করতে পারছেন না। সেটা ওঁর স্বভাব নয়—এই দীর্ঘ আটত্রিশ বছর আমাদের বিবাহ হয়েছে, এর মধ্যে আমাদের যুক্ত জীবনে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। উনি নিশ্চয় কোনো এক রকম করে জানেন যে এই সংসারে আমি একান্ত সংসারী গৃহিণী হয়েও আমার কিছুটা বাকি আছে—যার খবর উনি জানেন না। তাতে ওঁর কিছু আসে যায় না, কারণ উনি দিতেই জানেন, দাবী করতে জানেন না। আমি জানি ওঁকে সংশয়ে রাখা উচিত নয়। আমার কিছু বলা উচিত, কিন্তু এতদিন পরে আমি কি বলব? ওর বইটার কথা কি করে বলব? মির্চা, তুমি এত মিথ্যা কথা লিখলে কেন? যা সত্য ছিল তাই কি যথেষ্ট নয়? মিথ্যা কথা লেখা হয়েছে গল্প বাজারে কাটবে বলে। আজকাল তো দেখি অসভ্যতা না করলে বইয়ের কদর হয় না— তোমাদের দেশ থেকেই তো রুচিবিকার আমদানি হয়েছে—কদর্য, দেহবদ্ধ প্রেমের নির্লজ্জতা। হায় হায়! তুমি শেষটায় আমায় তার মধ্যে নামিয়েছ। সত্যের দায় আমি নিতে পারি, মিথ্যার দায় বইব কি করে? আমার ভবিষ্যৎ আছে, নামখ্যাতি আছে,

ছেলেমেয়ে আছে, আমি ভারতীয় নারী, সুনাম নষ্ট হওয়া তো মৃত্যুর অধিক। অপমানে আমার সারা শরীর গরম হয়ে যায় – আমি মুখে চোখে জল দিয়ে আসি। আজ এক মাস হয়ে গেল, একটি রাতও আমি ঘুমোতে পারছি না। ক্রোধের দাহ জ্বলছে। সে জ্বালায় জ্বলছে অনেক কিছু। আজ চল্লিশ বছর ধরে আমার যে মান সম্মান সম্ভ্রম, সমস্ত নষ্ট হতে চলেছে–তোমার বইয়ের কুড়িটা এডিশন হয়েছে, বহুজনের সামনে তুমি আমায় বিবস্ত্রা করেছ–একে ভালোবাসা বলে নাকি? বইটা আমি পড়িনি তবে যা শুনলাম তাতে তাই তো মনে হচ্ছে–বইটা যোগাড় করে পড়তে হবে। কিন্তু পড়ে দেবে কে? ঐ ভাষা তো আমরা কেউ জানি না। আমি যন্ত্রণায় ছটফট করছি। ওর মুখটা মনে করবার চেষ্টা করছি, মুখই যদি মনে না পড়ে তবে ঝগড়া করব কার সঙ্গে? আমার ওর মুখ ভালো করে মনে পড়ছে না–সে যে অনেক দিন হয়ে গেল–কেবল দেখি পার্টিশনে হেলান দিয়ে ও বসে আছে, ওর সেই বকের পালকের মতো সাদা পা দুটো।...আমি জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। আজকাল জানালায় শিক থাকে না, থাকে গ্রীল–ওটা ধরে দাঁড়ান যায় না। উন্মুখ মন যখন জানালা দিয়ে বেরিয়ে যেতে চায় তখন গরাদ ধরে শক্তি পাওয়া যায়। নন্দলালের একটা ছবি আছে, রাত্রির অন্ধকারের আবছা মূর্তি বন্দিনী সীতা একটা গরাদ ধরে আছে–আমার নিজেকে তেমনি মনে হচ্ছে–এই গরাদ খুলে দাও—যাই, যাই, সময়ের সমুদ্র পেরিয়ে, আমার এই চল্লিশ বছরের সংসার ছেড়ে, আমার নাম খ্যাতি কর্তব্য ছেড়ে চলো যাই, চলো যাই, চলো যাই–মির্চা তোমায় একবার দেখতে চাই।

আমি বাবাকে বললাম, "রবীন্দ্রনাথ বিদেশে যাবার আগে আমরা কি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব না?"

"নিশ্চয়ই, ইউক্লিডও যেতে চায়।" তাঁকে লেখা হল– যথারীতি একদিন পরই উত্তর এল–"তথাস্তু। সকন্যক, সশিষ্য, এসো।"

সে বারে আমরা বড় গেস্ট হাউসে উঠেছিলাম। সকালবেলা উত্তরায়ণে দেখা করতে যাব আমরা তিনজন, আমি মির্চা আর বাবা। আমি আর মির্চা একটু আগে বেরিয়ে পড়েছি, বাগানে টেনিস কোর্টের কাছে পায়চারী করছি, বাবা আর আসছেনই না, সম্ভবত পথে ক্ষিতিমোহন সেনের সঙ্গে দেখা হয়েছে– ভালোই হয়েছে, তাতে আমরা ক্ষুণ্ন নই। কি সুন্দর সকালটা—কলকাতার পর, শান্তিনিকেতন আমাদের দুজনকে যেন আলিঙ্গন করছে, 'তার আকাশ ভরা কোলে মোদের দোলে হৃদয় দোলে–।'

বাবা এলেন, "চল"। আমি বললাম, "আমি পরে যাব, তোমরা যাও। আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে আসি–" আমি ওঁদের সঙ্গে যাব না। আমার একলা কথা বলার আছে। আমি অবশ্য কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি না। এখানে আমার কোনো বন্ধু নেই–আমি দু-তিন দিনের জন্য আসি, তখন আবার কোন্ বন্ধুর সন্ধানে যাব? একটি যে আছেন একাই একশ! মাত্র একশ?

কবির কাছ থেকে এসে বাবা মির্চাকে নিয়ে লাইব্রেরী দেখাতে গেলেন। ও পুঁথির সংগ্রহ দেখবে। জ্ঞানের জন্য ওর আকণ্ঠ তৃষ্ণা। বাবা এই ছাত্র নিয়ে খুব গর্বিত। বাবার প্রদর্শনীতে আমরা দুজনেই দ্রষ্টব্য বস্তু!

কবি বড় জানালার কাছে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিলেন, আমি নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে পায়ের কাছে একগুচ্ছ ফুল রাখলাম। উনি হাত বাড়িয়ে দিলেন–"হাতে দাও।"

আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন! মৃদু মৃদু হাসছেন অর্থপূর্ণ হাসি –"কি গো, সাহেবের সঙ্গে কি গল্প হচ্ছিল? কত কথা বলছিলে? কথার

ফুলঝুরি। আমি সাহেবকে বলেছি, মেয়েদের কথা খানিকটা বাদ দিয়ে বিশ্বাস করবে। যত পদচারণা তত বাক্যচারণা।”

“আপনি কি করে দেখতে পেলেন?”

“কেন দেখতে দিতে চাও নি নাকি? তাহলে আর একটু সাবধান হতে হতো,।” আমি লক্ষ্য করলাম জানালা দিয়ে নিচের বাগানের হাতাটা দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ।

“আঃ আমার রাগ হচ্ছে।”

“তাতো হচ্ছেই, কি রকম রাগ?”

উনি আমার কাপড়ের আঁচলটা ধরে বললেন, “একি নীলাম্বরী?” তার পর গান করে, “পিনহ চারু নীল বাস, হৃদয়ে প্রণয় কুসুম রাশ” – আমার কান ঝাঁঝাঁ করছে, বুক ধ্বক ধ্বক করছে, পরিহাসটা ভালো লাগছে কিন্তু সহ্য করতে পারছি না, মাথাটা সামনে ঝুঁকে পড়েছে, উনি আমার বিনুনীটা ধরে টান দিয়ে মুখটা ঊর্ধ্বমুখী করে দিলেন। আমি চোখ বুজে আছি। ওঁর চোখের দিকে তাকাবার আমার সাহস নেই– আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। এইবার উনি আমার বিনুনীটা ছেড়ে দিলেন–”দ্যাখো কাণ্ড! কাঁদে কেন?”

আমি যা যা বলব ভেবেছিলাম সব ভুলে গেলাম। কিছু আমার মনে পড়ছে না, আমি ওঁর হাঁটুর উপর মুখ রাখলাম। উনি আমার মাথায় তাঁর অভয় হস্ত রেখে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, “অমৃতা তোমার বয়স অল্প। মনটাকে নিয়ে এত নাড়াচাড়া করো না, সেটা স্বাস্থ্যকর নয়। মনটা স্বচ্ছ কাকচক্ষু সরোবরের মতো স্থির রাখ, তার নিচে বহুদূর গভীরতা, কিন্তু এখনই তাকে চঞ্চল করে উত্তাল করার দরকার নেই–শান্ত হয়ে থাক। সে মনে বাইরের নানা ছায়া পড়বে সহজভাবে তা গ্রহণ কর, সেই যে আমি লিখেছি–‘সত্যেরে লও সহজে’– তোমার নিজের ভিতরে যে মাধুরীলতা আছে দূরে নেমে যাবে তার মূল তার উপরে ফুল ফুটবে। অপেক্ষা কর। এখন উঠে বসো একটু গল্প করা যাক।...তোমার ছাতিমগাছটা কেমন আছে?”

"আমরা তো এখন আর সে বাড়িতে নেই।"

আমাদের আগের বাড়িতে একটা ছোট্ট ছাতিমগাছ ছিল। আমি সেই গাছটার উপর একটা কবিতা লিখেছিলাম, কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছিল। মির্চা সেই কবিতা শুনে অবাক, বলে 'প্যানথীঈজম'। প্যানথীঈজম, বস্তুটি কি তখন জানতাম না। 'গাছের সাথে একটি মেয়ের প্রেমের কথাটিকে' এই লাইনটা ওকে ভাবিয়েছিল, এর অর্থ কি! এটা যে কোনো ইজম নয়, কেবল মাত্র কবিত্ব, তা ও বুঝতে পারে না।

সেদিন গেস্ট হাউসে ফিরে বাবার কাছে প্রচণ্ড বকুনী খেলাম, দেরী করেছি বলে– দেরী হওয়াতে কিন্তু কিছুই ক্ষতি হয় নি—ট্রেনও ফেল করব না, বা কারু কোনো বিপদও হচ্ছে না। তবু হঠাৎ চটে গেলেন। বাবা যখন রেগে যান তখন কোনো জ্ঞান থাকে না।

আমাকে এত বকতে লাগলেন যে আমি অপদস্থ বিপর্যস্ত হয়ে গেলাম, মির্চাও করুণভাবে আমার অবস্থা দেখতে লাগল। সকালবেলার সুন্দর সুরটা কেটে গেল। সুর কাটতে, তাল ভাঙ্গতে, বাবার জুড়ি নেই–ইন্দ্রসভা হলে ওঁর মর্ত্যে নির্বাসন হতো। কিন্তু এটা তো ইন্দ্রসভা নয়–ওরই নিজের সংসার। এখানে সকলকেই মাথা নিচু করে সয়ে যেতে হয়।

সেদিন ট্রেনে উঠে বাবা ক্রমাগত শান্তিনিকেতনের নিন্দা করতে লাগলেন, 'এ প্রতিষ্ঠান টিকবে না, টিকতে পারে না, কবি যেদিন চক্ষু বুঝবেন তার পরদিনই উঠে যাবে'। মির্চা চুপ করে শুনছে, মাঝে মাঝে সায়ও দিচ্ছে। বাবা আরো বলে চলেছেন—এইবার প্রতিষ্ঠান ছেড়ে কাব্য নিয়ে পড়েছেন, 'প্রার্থনা' কবিতার ঐ লাইনটা' দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়, অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়' –ঐ চরিতার্থতা' শব্দটা নাকি যথেষ্ট কাব্যগন্ধী নয়। ওটার প্রয়োগ একেবারে ভালো হয় নি। তা হতে পারে। আমি এখন কাব্যবিচার শুনতে চাই না। আমি রেলগাড়ির জানালায় মাথা রেখে ওঁদের দিকে পেছন ফিরে বসে দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে রয়েছি। রেলগাড়ির চাকা ধ্বক্-ধ্বক চলেছে। গাড়ির চাকা

কথা বলে, গান করে। আমার মনে একটা গান গুন গুন করছে—কোন দূরের মানুষ যেন এল আজ কাছে...তিমির আড়ালে...এ...এ... নীরবে দাঁড়ায়ে আছে'—তখন রবীন্দ্রনাথের গান এত শোনা যেত না, ক'জন গাইত? হঠাৎ কখনো ওঁর গান শুনলে বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠত—এ গানটা মাত্র গত সপ্তাহে শুনেছি, কালিদাসবাবুর কাছে। কালিদাসবাবু খুব মিষ্টি গান করনে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ি গিয়েছিলাম, উনি সেকালের ঠাকুরবাড়ির গল্প করেন— আমি প্রায়ই বিকেলে ওখানে যাই। সেদিন তিনি ছিলেন না অপেক্ষা করে করে সন্ধ্যা হয়ে গেল, তাই কালিদাসবাবু আমায় পোঁছে দিয়ে গেলেন। রমেশ মিত্র পার্কটা পার হতে হতে গুনগুন করে উনি গাইছিলেন—'বুকে দোলে তার বিরহব্যথার মালা গোপন মিলন অমৃত গন্ধ ঢালা' — আমার কানে সুরটা রয়েছে আমি গুনগুন করে গলায় তোলবার চেষ্টা করছি। তিমির আড়ালে... রেলের চাকা বলছে...নীরবে দাঁড়ায়ে আছে। বাবা উঠে বাথরুমে ঢুকলেন—মির্চা এসে আমার পিছনে দাঁড়াল, "অমৃতা—"

"বলো-"

"এদিকে তাকাও"—-আমি ঘুরে বসে ওর দিকে তাকালাম- -ও স্থির অপলক আমার দিকে চেয়ে রইল সম্মোহিত দৃষ্টি। আমি দেখতে পাচ্ছি ওকে, এখনও ঠিক তেমনি দেখতে পাচ্ছি—ওপরের বাঙ্কের দড়িটা ধরে একটু ঝুঁকে আমার দিকে চেয়ে আছে। একটু পরে আমরা দুজনেই হেসে ফেললাম।

"কি ভাবছিলে এতক্ষণ?"

"একটা গান মনে করবার চেষ্টা করছিলাম।"

বাবা বেরিয়ে এলেন—"কি বলছিস তোরা ?"

"বাবা ইউক্লিডকে ঐ গানটা অনুবাদ করে দাও না, আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে।"

"তুমি কর, তুমিই বা পারবে না কেন—" তারপর এ আমার অসাধ্য বুঝে বাবা বলতে লাগলেন, "আচ্ছা, 'বুকে দোলে তার বিরহব্যথার মালা...গোপন

মিলন অমৃত গন্ধ ঢালা'...বর্ষার বর্ণনায় বিরহের কথা আসতেই হবে—বর্ষা বিরহীর মনকে সন্তপ্ত করে, পর্যুৎসুকী করে"—বাবা মেঘদূতের কথা বলতে লাগলেন—"এদিকে বলা হচ্ছে, 'বিরহ ব্যথার মালা' অন্যদিকে 'গোপন মিলনের' কথা! মিলন ও বিরহ এই দুই বিপরীত ভাব দিয়ে একটা সম্পূর্ণতা বোঝান হচ্ছে।" রবীন্দ্রকাব্য বিপরীতের প্রয়োগ সম্বন্ধে বাবা খুব ভালো করে বলতে লাগলেন।

কিন্তু আজকের দিনে এই দ্বিতীয়বার তাল কাটল। এত কথার দরকার কি—আজ যে মুহূর্তে মির্চা আমার চোখের দিকে তাকিয়েছে আমি বুঝতে পেরেছি বিরহ ও মিলন একসঙ্গে কি করে থাকে, আর তার ব্যাকুলতাই বা কি। আমি ওর ফর্সা গলার উপর সেই অদৃশ্য মালার সুগন্ধ পাচ্ছি...'গোপন মিলন অমৃত গন্ধ ঢালা'.......

মির্চা আমাদের বাড়ি আসবার কত পরে আমার ঠিক মনে নেই, ও প্রথম একটা কাণ্ড করল। খাবার টেবিলের এক মাথায় বাবা বসে আছেন, উল্টো মাথায় মা, মাঝখানে মুখোমুখি ও আর আমি। সে আস্তে আস্তে তার পা বাড়িয়ে দিয়ে আমার পায়ের উপর রাখল। আমি পা সরিয়ে নিলাম, আমি ভাবতে চাইলাম দৈবাৎ লেগে গিয়েছে—যদিও আমার শরীর-মন চমকে উঠল, কিন্তু কি আশ্চর্য সেই মুহূর্তে ওর দিকে চেয়ে আমার হঠাৎ মনে হল—এ চলে গেলে আমি বাঁচব কি করে? খাবার টেবিল থেকে সবাই উঠে গেলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"তোমার পা কি হঠাৎ লেগে গিয়েছিল? তা তো নয়।"

"না, তা নয়।"

"কী স্পর্ধা! কী সাহস! যদি বাবার পায়ে লাগত কি হতো তাহলে?"

"কিছুই হতো না। আমি তৎক্ষণাৎ প্রণাম করতাম।"

"তুমি বুঝতে কি করে?"

"হাঃ, হাঃ, হাঃ, তোমার বাবার পা আর তোমার পা বুঝতে পারব না!" এই বলে সে তার পা দুটো বাড়িয়ে দিয়ে আবার আমার পায়ের উপর রাখল।

তেতাল্লিশ বছর আগের ঘটনা! কী আশ্চর্য! কী বিস্ময়! আমি সেই টেবিলে বসে আছি—আমি ওকে দেখতে পাচ্ছি। ও একটা পাঞ্জাবী পরেছে, ওর বুকটা খোলা, ওর ফর্সা গলাটা আমি দেখছি—ওর হাত দুটো টেবিলের উপর, আমার হাত ধরবার ওর সাহস নেই। আমি পা দুটো সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছি— পারছি না, পারছি না, একি অন্যায়! একি পাপ? কি করি এখন? মা বলেছিলেন অনাত্মীয় কোনো পুরুষ মানুষকে ছোঁবে না, তাহলে শরীর খারাপ হয়ে যায়—কথাটা ঠিকই। আমার শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে কিন্তু ও পা সরাচ্ছে না—আমার পায়ের উপর তা দৃঢ়সংবদ্ধ, এখনও, এই এখানে, এইখানেই—

আমার কপালের উপর একটা ঠাণ্ডা হাত কে রাখল, আমি যুগান্তরের ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। পাশে দাঁড়িয়ে আছে লেখা। সে আস্তে আস্তে বললে, "মা আপনার এমন কেউ নেই, যাকে মনের কথা সব বলতে পারেন?

বোনকে, মেয়েকে, বন্ধুদের? আপনার কি হয়েছে কাউকে না বললে তো হবে না।”

স্বাধীনতা-যুদ্ধের নানা রকম হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে, হিংস্র এবং অহিংস দুই-ই। প্রেসিডেন্সি কলেজে হাঙ্গামা লেগেই আছে। একদিন ছেলেরা অধ্যক্ষ স্টেপলটনের রক্ত চেয়েছিল। আজকালকার মতো সে রকম ঘটনা তখন হামেশা ঘটত না। যদিও বাবার সাথে স্টেপলটনের শত্রুতা খুবই, তবুও সেদিন তিনি তাঁকে বাঁচিয়েছিলেন। কলেজের হাতার মধ্যে পুলিশের গুলিতে একটি ছেলে আহত হলে ক্রুদ্ধ ছাত্রের দল কলেজ ঘিরে ফেলে। তখন পুলিশ চলে গেছে, ছাত্রদের দাবী ঐ আহত ছেলেটির রক্তের সঙ্গে স্টেপলটনের রক্ত মেশাতে হবে। তখন বাবা মধ্যস্থতা করেন যে স্টেপলটনকে নিরাপদে বের করে নিয়ে আসবেন যদি তিনি ঐ আহত ছেলেটির কাছে ক্ষমা চান। সে সময়ে ঐটুকুতেই হতো। স্টেপলটন রাজী হলেন, তারপর গাড়িতে উঠেই অন্য মূর্তি, বলেন কি আমি পরে ক্ষমা চাইব। বাবা তখন বললেন, “ঠিক আছে তাহলে আমি এখনই নেমে যাচ্ছি, তুমি ছাত্রদের সঙ্গে বোঝাপড়া কর।” স্টেপলটন বাবাকে কিছুতে ছাড়বেন না। উনিও নেমে যাবেনই, তখন তিনি তাঁর কোট ধরে ঝুলে পড়লেন, বাবা নিরুপায় হয়ে কোটটি খুলেই গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তিনি ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই কোট ধরে ঝোলার হাস্যকর ব্যাপারটি বাবা সেদিন খাবার টেবিলে সবিস্তারে বলে আমাদের খুব হাসিয়েছিলেন। মির্চা তখনই ঠিক করল যে পরের দিন ‘রেভলিউশন' দেখতে যাবে।

বলা নেই কওয়া নেই সকালে সে বেরিয়েছে, সারাদিন কেটে গেল, সবাই উদ্বিগ্ন। মা ঘর-বাইর করছেন, পরের ছেলে বিপদে পড়ল কিনা। কাকা যখন পুলিশে খবর দিতে যাবেন এমন সময় মূর্তিমান এসে হাজির, ধূলি-ধূসরিত, সারাদিন ঘুরে উস্কো-খুস্কো এবং নিরতিশয় হতাশ। যেখানে সেখানে পিকেটিং হচ্ছে ঘুরেছে, পথে পথে ঘুরেছে বিপদের সন্ধানে কিন্তু কোনো বিপদ হয়নি। উপরের জানালা দিয়ে কেউ একজন একটা দই-এর ভাঁড় ফেলেছিল, সেটাও ওর গায়ে পড়ল না, পড়ল কিনা সামনে। এমন কিছু ঘটল না যাতে দেশে ফিরে গিয়ে কোন চিহ্ন দেখাতে পারে। ওর ভয়, দেশে সবাই বলবে, ভারতে

যখন রেভলিউশন হচ্ছিল তখন তুমি কোন গর্তে লুকিয়েছিলে? সে যে ভারতে এসেছিল এটা নিজের দেশের লোককে কি করে বিশ্বাস করাবে এই ওর এক ভাবনা। কারণ ওর দেশ থেকে এই প্রথম কেউ ভারতে এসেছে। এদিকে চামড়াও যথেষ্ট রোদে পোড়া হচ্ছে না। তাই একদিন সকালে উঠে একটি মাদুর নিয়ে ছাতে চলে গেল, সেখানে মুখের উপর একটা তোয়ালে চাপা দিয়ে বেলা দুপুর অবধি শুয়ে রইল। তারপর বিকেলবেলা তার সারা গায়ে ফোস্কা পড়ে গেল। আমরা ছোটরা খুব হাসছি, বিশেষ যে সহানুভূতি আছে তা নয়। মা খুব উদ্বিগ্ন, এ ছেলে তো পাগলামি শুরু করেছে। ইয়োরোপের একটি দুরন্ত ছেলেকে সামলোনো কঠিন, বিশেষ করে ভাষাটাও তেমন রপ্ত নেই। চাঁদসীর মলম এল। মা দেখিয়ে দিলেন, কাকা লাগাতে লাগাতে মার ভ সনাগুলি ইংরেজিতে অনুবাদ করতে লাগলেন।

বাবা পরে ওকে বোঝালেন, “দেখ মির্চা, তুমি যে ভারতে এসেছ তা তোমার কথা শুনেই সবাই বুঝতে পারবে, তোমার ভিতরেও পরিবর্তন আসবে। সেটাই তো আসল। গায়ের রং ব্রাউন তো অন্যত্রও রোদে শুয়ে থেকে করা যায় – কিন্তু আসল পরিবর্তন করবে ভারতীয় দর্শন, তুমি যা পড়েছ তাতেই রূপান্তর হবে।

তাছাড়া রেভলিউশন? রেভলিউশন দেখার জন্য দৌড়াদৌড়ি করে লাভ নেই। ভারতে এখন সর্বত্র রেভলিউশন হচ্ছে। পিকেটিং আর কাঁদুনে গ্যাসই কি একমাত্র দ্রষ্টব্য বস্তু ? এই যে তুমি আমাদের বাড়ি আছ, এটাই তো একটা রেভলিউশন–আমার বাবার বাড়িতে কি থাকতে পারতে? তাহলে আমার স্ত্রী তোমার সামনে মুখ ঢেকে বেরুতেন, আর এই অমৃতা, ছেলেদের কলেজে গিয়ে কবিতা পড়ে, এ কখনো হতে পারত? তোমার বাসন আলাদা হতো, তুমি ছুঁয়ে দিলে ভাত ফেলা যেত–সে এক ব্যাপার, সে অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে আজ এই বাড়িই একটা রেভলিউশন।”

সাহিত্য পরিষদের প্রকাণ্ড সাহিত্যসভা হবে, এখন যেখানে গোখেল মেমোরিয়াল স্কুল সেইখানে। এই প্রথম আমি স্বরচিত গদ্য প্রবন্ধ পড়ব—বিষয়বস্তু 'সুন্দরের স্থান কোথায়?? সুন্দর কি বাইরে আছে? না মানুষের মনে? কথাটা নিয়ে এত ঘোরপ্যাচের দরকার কি? সুন্দর তো বহির্বস্তু হতেই পারে না, মানুষই সুন্দর দেখে তার চোখে অর্থাৎ মনে নীলাঞ্জন মায়া। এই প্রবন্ধের জন্য আমি রীতিমত পরিশ্রম করছি— যা লিখছি বাবার পছন্দ হচ্ছে না—যা হোক শেষ পর্যন্ত খাড়া হয়েছে। এখন একটা পরীক্ষা সামনে। ঐ সভায় রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্ব করবার কথা ছিল কিন্তু তিনি আসতে পারবেন না, হায়দ্রাবাদে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এই নিয়ে অকুস্থলে অর্থাৎ সাহিত্যসভায় খুব নিন্দা হবে তাঁর। রবীন্দ্রনাথকে দু-কথা শোনাতে কেউ ছাড়ে না এদেশে। আমি অবাক হয়ে দেখি তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলতে, তাঁর কাছে একবার যেতে সবাই উদগ্রীব, সামনে গেলে তো বিগলিত কিন্তু আড়ালে নিন্দা করতে সহস্রমুখ। ওঁর সম্বন্ধে বাবারও অনেকটা এরকম ভাব আছে। বাবা এত পড়েছেন রবীন্দ্রকাব্য, এত আলোচনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আকর্ষণেরও অন্ত নেই, অথচ সমালোচনা চলে নিরবচ্ছিন্ন, বিশেষ করে আমাকে বিধিয়ে বিঁধিয়ে শোনানো হয়, যেন আমি তাঁর 'স্খলন-পতন-ত্রুটির' জন্য দায়ী।

সভাক্ষেত্রে হলও তাই। নানা অপ্রীতিকর মন্তব্য হল— আমার মনটা বিষণ্ন, যদিও ঐ দিন আমি খুবই পুরস্কৃত হয়েছি—এতবড় সভায় এর আগে আমি কখনো গদ্য প্রবন্ধ পড়ি নি। কবিতা অবশ্য পড়েছি অনেক, সেনেট হলেও। সেদিন আমিই কনিষ্ঠ সাহিত্যিক, জ্যেষ্ঠা ছিলেন মানকুমারী বসু—মধুসূদনের ভাইঝি। বিধবার থান বাংলা করে প'রে খালি পায়ে তিনি সভাস্থ মঞ্চে কবিতা পড়লেন। দুই যুগের কী পরিবর্তন! আমি ভাবলাম মির্চা এ রেভলিউশনটা দেখলে বুঝত।

বাড়ি ফিরে দেখি সে চুপচাপ বসে আছে। এখানে ও একা, বন্ধুবান্ধব নেই আমরা ছাড়া। তাই ওকে বললাম চল বারান্দায় বসে গল্প করা যাবে।

নানা কথার মধ্যে মির্চা হঠাৎ আমায় জিজ্ঞাসা করলে, “তুমি এত বিষণ্ন কেন?” আমি ওকে বললাম সভায় যা যা হয়েছে—সভায় কিভাবে তাঁকে নিন্দা করা হয়েছে, তিনি কথা রাখতে পারেন নি বলে। এবার বিষণ্ন হবার পালা ওর। দু-একটা কথার পর বলল—”একজন সত্তর বছরের বৃদ্ধ মানুষকে তুমি এইটুকু মেয়ে এত ভালোবাস কি করে?” রাগে আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করছে, “কেন? বেশি বয়স হলে মানুষ ভালোবাসা পাবার অযোগ্য হয়ে যায় নাকি?”

ও একটু উত্তেজিত, “দেখো অমৃতা—হয় তুমি নিজেকে চেন না, নয় তুমি নিজেকে ঠকাও, কারণ সত্যকে দেখবার সাহস তোমার নেই, কিম্বা জেনেও মিথ্যা কথা বলছ।”

“মির্চা, আমার অসম্ভব মাথা ধরেছে তুমি একটু চুপ কর।”

বাবা বলেছেন, "রু, তুমি মির্চার কাছে একটু ফ্রেঞ্চ শেখ, ফ্রেঞ্চ না শিখলে একমপ্লিশমেন্ট পূর্ণ হয় না।" বাবা আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। অনাদি দস্তিদার বাড়িতে আসেন গান শেখাতে, রমেন চক্রবর্তী আসেন ছবি আঁকা শেখাতে, একজন গোয়ানিজ মাস্টার ভায়োলীন বাজান শেখাতে! এত বিদ্যা সামলানই আমার দায় হয়েছে, এদিকে আমার কিছু ভালো লাগে না এসব করতে, আমার কোনো অধ্যবসায় নেই --কবিতার বই হাতে নিয়ে জানালার ধারে বসে–মন ভেসে যায় কোন সুদুর – । যাক, মির্চা আমার কাছে বাংলা শিখবে, আমি ওর কাছে ফ্রেঞ্চ। খুব সাধু সংকল্প নিয়ে পড়তে বসা হয়, পড়া আর এগোয় না। কেন যে এগোয় না কে জানে! ওর ঘরেই আমরা পড়তে বসি, মাঝখানে একটা বাতি জ্বলে, স্ট্যান্ডিং ল্যাম্প, কতদিন কত রাত হয়ে যায়–বলাকার কবিতা পড়ি আমি, ও শুনতে ভালোবাসে কিন্তু অন্য ভাষায় ঐ কবিতা বোঝানো কি আমার সাধ্য—একটা কবিতা ও বুঝতে পেরেছে, ওর খুব ভালো লেগেছে–

"পাখিরে দিয়েছ গান পাখি গায় গান।
তার বেশি করে না সে দান।
আমারে দিয়েছ স্বর আমি তারও বেশি করি দান
আমি গাই গান।"

মানুষ যা পেয়েছে শুধু সেইটুকুতে সন্তুষ্ট নয়, সে যে সৃষ্টিকর্তা। দুঃখকে আনন্দ করবার ভার তার হাতে।

"দুঃখখানি দিলে মোর তপ্তভালে থুয়ে
অশ্রুজলে তারে ধুয়ে ধুয়ে
আনন্দ করিয়া তারে ফিরায়ে আনিয়া দিই হাতে-
দিনশেষে মিলনের রাতে।"

এ কবিতা আমি পড়ি তবু এর তাৎপর্য বোঝবার বয়স আমার নয়। তবে আনন্দ আর দুঃখ যে মিলে মিশে যায় এটুকু আমি বুঝতে পারছি।

একেক দিন অনেক রাত অবধি আমরা পড়ি; ন'টা দশটা, কেউ কিছু বলেন না—বাবা মা কিছু বলেন না কিন্তু আমার নিজের একটা সঙ্কোচ অস্বস্তি হয়, কেউ যদি কিছু ভাবে! আমি দেখেছি ভৃত্যকুলের চোখে কৌতূহল আর আমার এগারো বছরের ছোট বোনের চোখে একটা সন্দেহ ও তীক্ষ্ণতা। মিষ্টি মেয়ে সাবি কিন্তু ওর সব সময় দুঃখ এবং অভিযোগ ওকে কেউ ভালোবাসে না, দিদিকেই সবাই ভালোবাসে। এখন মির্চা ইউক্লিডও সেই দিকে যাচ্ছে এটা ও বুঝতে পারে, তাই সাবি বলছে সেও ওকে বাংলা পড়াবে। ভালোই। ওর কাছে পড়লে তবু বিদ্যা হতে পারে—আমাদের পড়াশুনো তো বিশেষ এগুচ্ছে না। তবু মাস্টারমশাইয়ের কাছে সংস্কৃত পড়া হয়। মির্চা খুব ধাতুরূপ মুখস্থ করছে, ও আমায় হারিয়ে দেবে। ওর মতো অধ্যবসায় আমার নেই।

আমাদের বাড়িতে অনেক লোক একসঙ্গে বাস করি। এরা কেউ ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নয়। তবে সেটা আমরা জানি না। সকলেই আপন। ও এটা ঠিকমতো বোঝো না। ওদের দেশে ‘কাজিন’ আর ‘ভাই’ দুটো কথা। যার সঙ্গে সম্পর্কও নেই সেও যে আমাদের ভাইয়ের মতোই আপন হতে পারে এটা ও বোঝে না। আমাদের যে বসুধৈব কুটুম্বকম্। তাই তো ওকে, সম্পূর্ণ বিদেশী হলেও বাড়ির সকলে এত আপন করে নিয়েছে।

কাকা আমাকে খুব স্নেহ করেন। আমরা যখন মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়ি তখন কাকা এসে গল্প জুড়ে দেন। মাস্টারমশাই গৌরমোহন ঘোষকে কাকা খুব ক্ষেপান। একদিন সকালে মাস্টারমশাই কপালে একটা চন্দনের টিপ পরে এসেছেন। গঙ্গাস্নান করে টিপ পরে তাঁকে বেশ পবিত্র দেখাচ্ছে। কাকা এসে ঝুপ করে হাঁটু গেড়ে বসে কৃতাঞ্জলি হাতে বলতে লাগলন, “মাস্টারমশাই আমি বড় পাতকী, একটু পদরেণু”- মাস্টারমশাই বিব্রত হয়ে পা সরিয়ে নিচ্ছেন—”আঃ শ্রীশবাবু কি ছেলেমানুষী হচ্ছে।”

"মাস্টারমশাই পাপীতাপীকে ত্রাণ করবেন না?" কী করুণ আকুতি! আর আমরা দুই ছাত্রছাত্রী হেসে হেসে হয়রান হয়ে যাচ্ছি।

উপরে যেতে আমার মেজমাসী আমার দিকে ভ্রুকুটি করে চাইলেন। উনি গতকাল এসেছেন। গতকাল থেকেই ওঁর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দেখছি আমি। বিরক্তিকর। মাসী বললেন, "ওই সাহেব ছোঁড়াটার সঙ্গে অত কী হি হি করছিলি?"

আমিও দমবার পাত্রী নই। "সাহেব ছোঁড়া আবার কী? ওর নাম নেই নাকি!"

"এ্যাঃ নাম? একটু বেশি ধিঙ্গি হয়ে পড়েছ। নরেনবাবু মাথায় তুলে সর্বনাশ করছেন।" মরুকগে, আমি আর এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে চাই না। ওঁর সঙ্গে তর্ক করে একটা বিশ্রী ব্যাপারও করতে চাই না। পালানই ভালো।

মির্চার ঘরের সামনের সরু গলিটা দিয়ে বেরিয়ে যে বারান্দা সেইখানে 'চিঠির বাক্স'—ডাকওলা চিঠি দিয়ে যায় বাক্সটা চাবি বন্ধ, চাবিটা আমার কাছে থাকে—আমি দিনে দু-তিনবার ঐ বাক্সটা খুলে চিঠি সংগ্রহ করি। যদিও ডাকের তো একটা বিশেষ সময় আছে, যখন তখন বাক্স খোলার দরকার কি! কিন্তু আমি পারি না, দিনের মধ্যে অনেকবার মনে হয় যাই দেখে আসি চিঠি আছে কিনা। বিশেষত দুপুরবেলায় বাড়ি যখন শান্ত অর্ধস্তিমিত, অবশ্য নিদ্রিত নয়, আমাদের বাড়িতে কেউ দুপুরে ঘুমায় না, সবাই পড়ে, তখনই আমার ইচ্ছে করে চিঠির সন্ধানে যেতে। আমি জানি আমি কেন চিঠি দেখতে যাই, আমার তো বুদ্ধি আছে। নিজেকে আর কত ফাঁকি দেব? যদিও মির্চা বলেছে যে হয় আমি বোকা, নয় মিথ্যেবাদী। আমি জানি আমি কোনটাই নয়। আজকে দুপুরবেলা ক্রমাগত মনে হচ্ছে চিঠি এসেছে কি না দেখে আসি—বঙ্কিমচন্দ্রের গল্পের সুমতি কুমতির ঝগড়া চলেছে মনের মধ্যে—সুমতি বলছে, 'কখনো নয়, তুমি চিঠি দেখতে নয়, মির্চাকে দেখতে যেতে চাইছ—সত্যি কথা বল না কেন?' আর

কুমতি, মিথ্যেবাদী কুমতি বলছে, 'দূর তা কেন, একটা চিঠি কারুর আসতেও তো পারে।'

আমি উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম খিল লাগিয়ে। খাটের উপর বসলাম-নিজেকে আমার রক্ষা করতে হবে নিজের কাছ থেকেই। মহুয়াটা খুলে বসেছি—

“দূর মন্দিরে সিন্ধুকিনারে পথে চলিয়াছ তুমি—
আমি তরু, মোর ছায়া দিয়ে তারে
মৃত্তিকা তার চুমি,
হে তীর্থগামী তব সাধনার
অংশ কিছু বা রহিল আমার
পথ পাশে আমি তব যাত্রার
রহিব সাক্ষীরূপে—
তোমার পূজায় মোর কিছু যায়
ফুলের গন্ধ ধুপে।”

...এ আমার কথা নয়, এ আমার মার কথা। মা এই রকম ছায়া মেলে আছেন বাবার জীবনের উপরে, সন্তাপহরণ। নিজের জন্য কিছু চান না কিন্তু কি ভালোবাসা, কি ত্যাগ, কি অজস্র সেবা দিয়ে তাঁকে ঘিরে রেখেছেন। বাবার তীর্থযাত্রায় মার দান নিশ্চয় অনেক। মার জীবন উন্নত। স্বার্থহীন দানে পূর্ণ। কিন্তু আমি এটা চাই না। এ জীবন আমার কাম্য নয়। ‘সবলা’ কবিতা আমার কথা বলেছে। নিজে নিজের ভাগ্যকে জয় করব। ইস্ কি বল—একটুও বল নেই, শক্তি নেই, বুদ্ধি নেই, আমি তো পরাজিত। হঠাৎ আমার কান্না পাচ্ছে—খাটের উপর পড়ে আমি কাঁদছি—‘বল দাও মোরে বল দাও, প্রাণে দাও মোর শকতি...তব কাজ শিরে বহিতে সংসারতাপ সহিতে...' সংসারতাপটা কি? এই যে আগুনের ঝাপট আমার শরীরে মনে লাগছে এটাই কি ? তাহলে

লাগুক লাগুক উত্তাপ—আমি চাই এই উষ্ণতা...‘আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে...’

হঠাৎ কখন নিচে নেমে এসেছি জানি না। দেখি পর্দা তুলে মির্চা দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে, “কি চিঠি পেলে ?”

“নাঃ এল না, কি হতাশ যে লাগছে।”

“কার চিঠির অপেক্ষা কর?”

“কোনো অজানা জনের।”

“সে কে?”

“জানি না, তাকে চিনি না বলেই অপেক্ষা এত মধুর।”

আমি ‘ডাকঘরে’র কথা বলছি—ও বুঝতে পারছে না, ভ্রূকুটি করছে। কি হবে! এক সঙ্গে যদি সারাজীবন থাকতে হয়? অর্ধেক কথা না বলা থাকবে আর ক্রমাগত ডিকশনারী দেখতে হবে। এ আবার কি কথা মনে এল ? এর সঙ্গে সারাজীবন থাকব কি করে? এতো ক’দিন পরেই চলে যাবে। আমারও বিয়ে হয়ে যাবে। কোথায় বিয়ে হবে কে জানে—একটা লোকও মনে করতে পারছি না, যার সঙ্গে সারাজীবন বাস করা সম্ভব।

“ভিতরে আসবে না অমৃতা? তোমার জন্য ন্যুট হামসুনের ‘হাঙ্গার’ বইটা এনেছি।' এই প্রথম ও আমাকে একটা কিছু উপহার দিল। আমি ওর হাত থেকে বইটা নিলাম। বইটাতে আমার নাম লিখেছে আর ফরাসীতে একটা কথা ‘আমিতিয়ে-’

আমি দাঁড়িয়ে আছি। বসতে আমার সাহস হচ্ছে না। কেন কে জানে? সেও দাঁড়িয়ে আছে—আমি না বসলে তো বসবে না। আমি ওর দিকে পিছন ফিরে পিয়ানোর ডালাটা খুলে দাঁড়িয়ে আছি। আমি কি কিছুর জন্য অপেক্ষা করছি, একটা অসম্ভব কোনো ঘটনা কি ঘটবে? আমি কি তা চাই? ও আমার খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আমাকে স্পর্শ করেনি। আমার পিঠে ও হাত রাখতে

পারে কিন্তু রাখেনি। মাঝখানে একটুখানি আকাশ আছে, আমরা দাঁড়িয়েই আছি —আমার সর্বাঙ্গে আমি ওকে অনুভব করছি, মনের মধ্যে ওর অস্তিত্বের স্পর্শ লাগছে, এ কি ব্যাপার! আকাশ তো শূন্য নয়, ঈথারে পূর্ণ, ঈথার কি বস্তু আমি জানি না বটে তবু সে-ই নিশ্চয় অদৃশ্য হাতে এ সংযোগ করছে—আমার চারিদিক ওর নিশ্বাসের সুগন্ধে সুগন্ধি বায়ুমণ্ডল—

> "সায়ন্তনের ক্লান্ত ফুলের গন্ধ হাওয়ার পরে,
> অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে।"

উপর থেকে কে ডাকলো "রু রু রু-"

"যাচ্ছি"..

মির্চার বয়স তেইশ আর আমার ষোল। কিন্তু বয়সের পক্ষে আমরা দুজনেই একটু বেশী রকম তত্ত্বজ্ঞানী—বাবা আমাকে বলেন, “জ্যেষ্ঠতাত”। তা আমায় ‘জ্যেষ্ঠতাত' বানাচ্ছে কে? বাবাই তো। আর ওকেও তাই বানাচ্ছেন, সব সময় অষ্টাঙ্গযোগের কথা হচ্ছে। আর তন্ত্র সম্বন্ধে তো এ বাড়ির সবাই পণ্ডিত। কাকা যখন ওর সঙ্গে তন্ত্র নিয়ে আলোচনা জোড়েন গম্ভীর মুখে ‘হে বজ্রর’ রহস্য বিষয়ে, আমার রাগ হয়ে যায়। আমি তো জানি আমাদের বয়সী ছেলেমেয়েরা এর চেয়ে অনেক হালকা সুরে কথা বলে। আমারও খুব পণ্ডিত হ’তে শখ ছিল। কিন্তু এখন কমে যাচ্ছে। বিশেষ করে মির্চার তত্ত্বে রুচি এত বেড়ে গেছে বলেই। দেখা হলেই বিশ্বসাহিত্য আমায় পড়িয়ে ফেলবে। কাল সারাক্ষণ একটা অদ্ভুত অলৌকিক গল্প আমায় বলেছে যার কোনো মানেই বুঝলাম না। একটা লোকের ফাঁসির হুকুম হয়, সে যে মেয়েকে ভালোবাসত সে অনেক দূরে থাকে। ফাঁসির মুহূর্তে তার সেই মেয়েটিকে মনে পড়ল। তারপর দশমাস পরে সেই মেয়েটির একটি ছেলে হল সে ঠিক ঐ লোকটার মত দেখতে। এ গল্পের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। আমার ইচ্ছা একটু স্বাভাবিক গল্প করুক, একটু খোসামোদ করলেই বা দোষ কি? যেমন অন্যরা করে। তা হবার তো নয়ই, উল্টে কাল আমায় খুব রাগিয়ে দিয়েছে, বলে কি, “তোমার কি ধারণা তুমি খুব সুন্দর দেখতে?”

“আমার ধারণা হতে যাবে কেন? আরো অনেকেরই ধারণা।”

“কার কার?”

“চল না আমর সঙ্গে রাস্তায়, দুধারে লোকেরা কিরকম তাকিয়ে থাকে দেখবে।”

“ও সে তো থাকবেই—তোমাদের দেশে যে রাস্তায় মেয়ে দেখাই যায় না। জানো ইউরোপ থেকে এসে সব চেয়ে কি আশ্চর্য লাগে—মনে হয় এদেশে কি মেয়ে নেই?”

"মেয়ে থাকবে না কেন? তারা ফিটন গাড়ি করে যায়—পাল্কী গাড়ি করে যায় যাদের মোটর আছে মোটরে যায়, হেঁটে হেঁটে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে নাকি?"

"অন্য দেশে ঘোরে।"

"ঘুরুক। তুমি বুঝতে পার না আমি কালো কি ফর্সা? বাবা আমি সাবি মিলু মা সব এক? ঝড়ুও আমার মতো?"

"আমি কোনো রঙের তফাৎ বুঝতে পারি না"

"বেশ আমি চললাম।"

"বসো বসো লক্ষ্মীটি, আমি তোমাকে ভালো করে দেখি, বুঝতে পারি কি না।"

"ইস্ মাইক্রোসকোপ দিয়ে দেখতে হবে আমি সুন্দর কি না।"

"আমি তোমার বাইরেটা তো দেখি না, তোমার আত্মাকে দেখতে চাই।"

এবার আমার ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বলে গেছে, জ্যেষ্ঠতাত, এবার জীবাত্মা পরমাত্মার বিতর্ক নিয়ে না আসে। আমি রাগ করে চলে গেলাম। আমার খুবই মন খারাপ হয়ে গেল। আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, বুঝতেই পারছি না—সত্যই আমি সুন্দর কিনা। আমার খুব সন্দেহ হচ্ছে—সমস্ত খুঁতগুলো চোখে পড়ছে। মীলু এসে বললে, "কি দেখছিস অত ?"

"শোন ভাই আমাদের ভারতবর্ষে কত রকম পোশাক আছে—আমরা সব সময় এক রকম পোশাক পরি কেন? সেই এক হবল্ করে শাড়ি পরা কিংবা বাংলা করে?"

"সত্যিই রাজপুতানীদের ঘাগরা সুন্দর, মারাঠীদের মতো বড় শাড়িও মন্দ নয়।" মীলু আর আমি কিছুদিন থেকে গয়নার ডিজাইন নিয়ে পড়েছি। আমাদের সময়ে সাধারণত যেসব গয়না তৈরী হতো তা বিলাতী নক্শা থেকে খুব কাঁচা, অনুকরণ। তার সৌন্দর্য সৌকর্য কিছুই ছিল না। ঠিক সেই সময়টা অর্থাৎ আমাদের দু-তিন পুরুষ আগে থেকে শিল্পরুচির অধঃপতন হয়েছিল। ঠাকুরবাড়িতে তার পুনরুদ্ধার চলছিল। গৃহসজ্জায় বা দেহসজ্জায় খুঁজে খুঁজে

পুরানো নকশার জিনিসপত্র, পুরানো ছাঁদের গয়নার চলন হচ্ছিল। তাকে বলা হতো 'ওরিয়েন্টাল'। এ বিষয়ে স্টেলা ক্রামরিশ বিদগ্ধা—আমি আর মীলু সামান্যা নারী, আমরাও কিন্তু পুরানো রাজপুত রূপার গয়না থেকে নকশা নিয়ে, উড়িষ্যার রূপার গয়না থেকে নকশা নিয়ে, গয়না বানাতাম। খুব গয়না বানাতাম আমরা। কিই বা সোনার দাম ছিল, ১৮ টাকা ভরি! তারপর আমরা ঠিক করলাম রূপার গয়নাই বা পরব না কেন? সে সময়ে নিম্নবিত্ত মেয়েরা ছাড়া রূপার গয়না কেউ পরত না। আমরাই শুরু করেছিলাম, পরে খুব চলেছিল। গায়ের খাড়ুর সঙ্গে মখমলের চটি জুড়ে আমরা জুতো বানিয়েছিলাম, সেই 'বকচ্ছপ' বস্তুটি যে খুব চমৎকার হয়েছিল তা নয়, তবে লোকে তাকিয়ে থাকত ঠিকই। সেদিন আমরা ঠিক করলাম উড়িষ্যার মেয়েদের মতো সাজ করা যাক। শাড়ি খাটো করে অনেক গয়না পরা হল, আমার মার একটা সিঁথি ছিল। সিঁথির তিনটে ভাগ। সীমন্তের উপর দিয়ে একটা, আর দুপাশে দুটো হার, চলে গেছে– মাঝখানে একটা লকেট—কপালের উপর ঝোলে। বিয়ের সময় মাকে ঐ সিঁথি পরে দেখে বাবার এমন চোখে লেগেছিল যে সিঁথি সম্বন্ধে তাঁর মোহ ঘুচত না। মা তো আর পরতেন না, কিন্তু কোনো ছুতোয় আমায় ওটা পরাতে পারলে বাবা খুব খুশি হতেন। সেদিন আমি সিঁথি পরেছি, উড়িষ্যার শাড়ি পরেছি খাটো করে। কানের পাশ দিয়ে কদমফুল ঝুলিয়ে দিয়েছি। আর কদমফুলের রেণু আমরা মুখে মেখেছি। আমরা তো আজকাল সাবান মাখি না বিলিতি দ্রব্য ত্যাগ করেছি। মুখে মাখা হতো হেজলিন, আর জনসনের ট্যালকাম পাউডার। তাও আর স্পর্শ করা যাচ্ছে না। আপাতত কদমফুল পাওয়া গেছে, এ বেশ হয়েছে কিন্তু এ তো বেশি দিন থাকবে না।

"ভাই রু, সাবান মাখা ছেড়ে ভালোই হয়েছে—মশুরীর ডাল বাটা মেখে রঙ অনেক ফর্সা হয়েছে তোর।"

"যা যা বাজে কথা বলিস না। তোরা আমার রঙ আর চেহারা নিয়ে কিছু বলবি না। ভীষণ ভুল ধারণা হয়ে যায় আমার। তাতে ক্ষতি হয়।"

"তাই নাকি? আচ্ছা শোন্ পাউডার না হয় নাই মাখলাম– ঠোঁটে একটু আলতা লাগালে মন্দ হতো না।"

"ওরে বাবা, সাহস নেই বন্ধু, সাহস নেই।"

আমি সিঁথিটা পরছি ঠিক করে, আর মেঘদূত আওড়াচ্ছি– "ভাই মীলু, একটা পদ্ম পেলে সাজটা পুরোপুরি হত।"

"কেন, পদ্ম কি করবি?"

"আরে যে সে পদ্ম নয়, লীলাকমল।" মীলু মেঘদূত জানে না। "শোন বলছি–

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং

নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ

চূড়াপাশে নবকুরুবকং কর্ণে চারু শিরীষং

সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্-"

"আচ্ছা কুরুবক কি ফুল রে?"

"বক ফুল বোধ হয়।"

"দুর দুর, তা কখনো হয়। বক ফুল ভেজে খায়, তা নিয়ে কখনো কবিতা হয়?"

"কেন ভেজে খেলে তা নিয়ে কবিতা হবে না কেন?"

"শরৎচন্দ্র ও রবিঠাকুরের বিতর্কটা পড়ো না কেন? যা প্রয়োজনের বস্তু তা নিয়ে কবিতা হবে না।"

"তাই নাকি? সব ফুলই প্রয়োজনে লাগে।"

"যেমন?"

"ফল ধরাবার প্রয়োজন বন্ধু–ফল ধরাবার প্রয়োজন। এই যে তুমি ফুলের মতো..."

'অ' ঘরে ঢুকলো–'অ' আমার মা'র সম্পর্কিত ভাই কিন্তু বয়সে আমাদেরই কাছাকাছি, তাই আমাদের সঙ্গেও ভাইয়ের মতন সম্পর্ক। ওকে

আমরা খুব ভালোবাসি—খুব মিষ্টি স্বভাব, মনোহরণ বাঁশি বাজায়। বাঁশিটি দোলাতে দোলাতে ঘরে ঢুকে আমাদের সাজ দেখে তার চক্ষুস্থির।

“ব্যাপার কি, চলেছ কোথায়?”

“কেন, বাড়িতে কি একটু সুন্দর হয়ে থাকা যায় না?”

“যায় বৈকি। এখন বলো, সুন্দরের স্থান কোথায়?”

ও আমার প্রবন্ধটার কথা বলছে। তারপর ঘুরে ঘুরে আমায় দেখছে—”এ্যাঃ, সিঁথি পরা হয়েছে!”

মোতিম হারে বেশ বনাদে, সিঁথি লগাদে ভালে—
উরহি বিলম্বিত লোল চিকুর মম বাঁধহ চম্পক মালে।

গানটা করতে করতে ‘অ’ আমার খোঁপা ধরে টান দিল, “খুলে ফেল খোঁপা—” আর সমস্ত কাঁধ বুক ঢেকে ‘লোল চিকুর মম’ ছড়িয়ে পড়ল। সেই মুহূর্তে আমরা তিন জনে আয়নার মধ্যে দেখলাম—চমৎকৃত তাকিয়ে আছি আমরা- । সন্দেহ নেই, জ্যেষ্ঠতাত ভয় দেখিয়েছে আমায়।

একটার পর একটা ঘটনার মধ্যে আমি আবার কি করে প্রবেশ করছি—কি করে এই কাহিনী লিখতে পারছি-তেতাল্লিশ বছর আগের কথা। দশ বছর আগে কি পারতাম ? পনের বছর আগে? কুড়ি বছর আগে? কখনই না, তা হলে তো আমার জীবনই বদলে যেত। এতদিন আমি জানতামই না যে একটা বিয়োগান্ত উপন্যাস আমার সারা জীবনের মধ্যে ধীরে ধীরে অদৃশ্য কালিতে, অব্যক্ত ভাষায়, অশ্রুত স্পন্দনে লেখা হচ্ছিল। জীবনের বেয়াল্লিশটা বছর কেটে গেল, এ দৃশ্যগুলো বন্ধ ছিল। একেবারে গালামোহর লাগিয়ে তালাবন্ধ। মাঝে মাঝে এদিক ওদিক ধাক্কা লেগে বুঝতে পেরেছি ভিতরে কিছু জমা আছে, তার বেশি নয়। সেদিন হঠাৎ সেরগেই-এর মুখের একটি কথা—— ‘Mircea, Mircea, Mircea, I have told my mother that you have only kissed me on my forehead”—একটি ভীত বালিকার মিথ্যাভাষণ একটা সোনার চাবি হয়ে সেই দুর্গম গুহার দরজা খুলে দিয়েছে—

ভৈরব বেরিয়ে এসেছেন— আমি মহাকালের পায়ের শব্দ পাচ্ছি—নটরাজ নাচছেন। তাঁর এক পা অতীতে, এক পা বর্তমানে। 'তা তা থৈ থৈ'—আমার হীরা-পান্না ছড়িয়ে পড়ছে। হাসিকান্নার তরঙ্গ দুলছে—আমার বুকের হাড় গুঁড়িয়ে গেল, এ অসহ্য যন্ত্রণা। নটরাজ, তোমার নৃত্য থামাও, তুমি পা মুড়ে দাঁড়াও, কেশব হয়ে যাও, সব সন্তাপহারী শঙ্খ-চক্র- গদাপদ্মধারী, কিংবা বামনরূপে এস, তোমার তৃতীয় পা আমার মাথার উপর রাখ, আমি ঐ পশুর মতো তোমার পায়ের তলায় দলিত পিষ্ট হয়ে যাই!

সকল কলুষ তামসহর সদয়হৃদয় বুদ্ধ হতে পার না? আমার দাহ জুড়িয়ে দিয়ে মোহাঞ্জন মুছিয়ে দিয়ে 'কেশবধৃতবুদ্ধশরীর', মুক্তি দাও আমায়, আমি আর ওকে দেখতে চাই না। আমি ঘুম ভেঙে আমার প্রতিদিনের সাজানো সংসারে আমার স্বামীর বুকে সন্তানদের কোলে, আমার আপনজনের মধ্যে জেগে উঠতে চাই।

ঐ তো মির্চা হেঁট হয়ে গ্যাস রিং-এ কফি বানাচ্ছে, খাবার ঘরের একপাশে গ্যাস রিং। রান্নাঘরের দরজার সামনে ঝড়ু দাঁড়িয়ে আছে, ঝড়ু আমাদের বাবুর্চি, ভীষণ কালো গোলগাল চেহারা, বুকে কোঁকড়া কোঁকড়া কালো লোম, ক্ষুদ্র একটি বনমানুষ। কিছুতে জামা গায় দেবে না—ওকে সভ্য করা গেল না। — ও চিনি এগিয়ে দিচ্ছে। কফির ওপর ঘন ফেনা হলে তবে ওর ভালো লাগে, একে বলে টার্কিশ কফি, রোজ দুবেলা খাবার পরে ওর চাই। আমি ওকে দেখতে পাচ্ছি, ও পকেট থেকে রুমাল বের করে সসপ্যানের ডাণ্ডাটা ধরেছে, অন্য হাতে পেয়ালা। চিনি নিয়ে ঝড়ু পিছন পিছন আসছে। ওর ফর্সা মুখে, কালো চশমার ফ্রেমে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। ওটা কফির বাষ্প। মির্চা খাবার ঘরের টেবিলের কাছে চেয়ার টেনে বসল। আর ঠিক তখনই—

"নৃত্য পাগল নটরাজ যেন দুই হাতে দিয়ে তাল
দেখিনি আমরা তখনই সেখানে ঢুকেছিল মহাকাল

দেখব কি করে? আমরা তখন পরস্পরেরই দিদৃক্ষু
পতঙ্গ যেন বহ্নিমুখং বিবিক্ষু।
ভবানীপুরের খাবার ঘরের
টেবিলে সাজান চা
তুলে নিল কাল মহা অনন্তে
অব্যয় মহিমা!”

লাইব্রেরীতে ঢুকতে ঢুকতে আবার আমাদের ঝগড়া শুরু হল, শেষ হল উপরের বারান্দায়—মির্চা বললে, “কি, কথা বলবে না?”

“না, তুমি যদি ও-রকম কর তাহলে একেবারে কথা বলব না, তোমারই বা বলবার দরকার কি—আমি তো আর ভালো নই।”

“আমি তোমাকে খারাপ বলেছি?”

“নিষ্ঠুর হৃদয়হীন, একেবারে ভদ্রতা পর্যন্ত জানি না, এ যদি খারাপ নয় তবে কি?”

“তুমি কাল অমন করলে কেন?”

“কি করলাম?”

“অ’র সঙ্গে মীলু আর তুমি বেশ গলা জড়াজড়ি করে চলে গেলে, আর আমি তোমার একটু কাছে দাঁড়াতেই তুমি সরে যাও।”

“কী আশ্চর্য, ও যে আমাদের আত্মীয়, তুমি তো আত্মীয় নও।”

আমার মার উপদেশ মনে পড়ছে, আমি যখন বেশ ছোট অর্থাৎ বার বছর বয়স হবে তখনও ফ্রক পরি। আমাদের বাড়ি মায়ের এক আত্মীয় আসতেন। মার চেয়ে অনেক বড় তিনি। তাঁর বয়স কত জানি না, অত ছোটরা বড়দের বয়স বুঝতে পারে না। তবে তিনি অনেকের উপকার করতেন, সকলেই তাঁকে পছন্দ করত। বাড়ি এলে খুব হৈচৈ করে জমিয়ে তুলতেন আর আমাকে হাঁটুর উপর বসাতেন। আমি তো ফ্রক পরা একটা ছোট মেয়ে, কেউ কিছু মনে করত না—কিন্তু তিনি এক অদ্ভুত ব্যাপার শুরু করতেন—হঠাৎ হঠাৎ আমার সদ্যোদ্ভিন্ন বক্ষ স্পর্শ করতেন—। প্রথম দিন বুঝতে পারি নি। দ্বিতীয় দিনে মাকে বলে দিলাম। মা তো শুনে মাথায় হাত দিয়েছেন, "হা কপাল! বিয়ে করেও ওর স্বভাব শোধরাল না, হারামজাদাকে আর এমুখো হতে দিচ্ছি না।" মা কখনো এত অশ্লীল কথা বলেন না, আমাদের বাড়িতে মার জন্যই কেউ কোনো বিশ্রী কথা বলে না। অন্যদের বাড়িতে শুনেছি 'হারামজাদা', 'শালা', ইত্যাদি যথেচ্ছ ব্যবহার হয়, আমাদের বাড়িতে হয় না। আমাদের কানে গেলেও অসহ্য লাগে। মাকে প্রথম এই রকম একটা ভয়ানক কথা ব্যবহার করতে শুনলাম। এত রেগে গিয়েছিলেন যে, কোন সভ্য গাল খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তারপর মা আমায় বললেন, "রু, এরকম যদি আর কেউ কখনো করে, তখুনি এসে বলে দেবে। কখনো কোনো অনাত্মীয় পুরুষকে ছোঁবে না, ছুঁতে দেবে না। তাতে ফল খুব খারাপ হতে পারে। শরীর তো খারাপ হবেই, মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।"

কথাটা আমার ঠিক বিশ্বাস হয়নি, "মৃত্যু কি করে হবে?"

"অত সব তোমায় এখন বলতে পারছি না, কিন্তু যা বলছি শোনো, খুব সাবধানে থাকতে হয় মেয়েদের।"

একথা ঠিকই যে অনেক লোকই অতি অদ্ভুত ব্যবহার করে। যত দিন যাচ্ছে আমি অনেক বড় বড় লোকের চোখেও লোলুপ দৃষ্টি দেখেছি। গা ঘিন্ ঘিন্ করে, বিশ্রী লাগে। এই যেমন কমলবাবু অত শিক্ষিত, যাকে কালচার্ড বলা হয়ে থাকে, এলিটও, রীতিমত রবীন্দ্রভক্ত, বহু কবিতা ওঁর মুখস্থ, এলেই

আমায় বিরক্ত করবে। সেদিন আমি বসবার ঘরে কোমরে কাপড় জড়িয়ে ঝুল ঝাড়ছি, এমন সময় তিনি এসে উপস্থিত। আমায় ঐ অবস্থায় দেখে কবিতা আবৃত্তি শুরু করেছে—"রাজমহিমারে যে করপরশে তব পার করিবারে দ্বিগুণ মহিমান্বিত, সে সুন্দর করে ধুলি ঝাঁট দাও তুমি আপনার ঘরে—" কবিতা শুনলেই আমার ভালো লাগে তাই আমিও আবৃত্তি করছি—হঠাৎ ভদ্রলোক আমাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলেন। মনে হল যেন সাপ ছোবল মারতে উদ্যত, আমি কোনো রকমে নিজেকে ছাড়িয়ে পালালাম। মা শুনে বললেন, "বাহারে পাঞ্জাবী আর নাগরাই পরলেই ভদ্র হয় না।" মার কথা এখন আমি বুঝতে পারি। আমি জানি এ সবের পিছনে অদৃশ্য একটা গোপন জগৎ আছে, সেখানকার সবটা খবর আমি জানি না। মার কথা শুনে শুনে আমার খুব পাপবোধ জন্মাচ্ছে। ঠিকই কথা। 'অ'কেও আমার গলা জড়াতে দেওয়া ঠিক হয় নি। হলই বা দাদার মতো। আমার মনে মনে দ্রুত নানা কথা চলে যাচ্ছে—হঠাৎ দেখি মির্চা আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে—

"ক্ষমা কর"—এই বলে দুহাত দিয়ে সে আমার দুহাত ধরে করপল্লব চুম্বন করলে। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি চিত্রার্পিত। ও আমার হাত ছাড়ছে না। আমার হাতের পাতা দুটো ওর হাতের মধ্যে নিপীড়িত। গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। ও তার উপর মুখ রাখছে~-অনন্ত সময় চলে যাচ্ছে। কতক্ষণ কে জানে, ও ছাড়ছে না, আমি হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছি, পারছি না—আমি ঊর্ধ্বমুখে প্রার্থনা করবার চেষ্টা করছি। নিজের কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করছি, কারণ আমি তো এখন ছুটে পালাতে চাইছি না চাইছি ও ভুজবন্ধন। কিন্তু ও আমাকে আর একটুও কাছে টানে নি, আমাদের মধ্যে অনেক ব্যবধান, ও জানে আমি বাধা দিচ্ছি—"ছাড় ছাড় মির্চা, তুমি আমার হাত গুঁড়িয়ে দিয়েছ, একেবারে মেরে ফেলেছ আমায়।"

মির্চা মুখ তুলল। আমি অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে আছি, আমার একটুও সরে যেতে ইচ্ছে করছে না। শরীরের মধ্যে ঘুঙুর বাজছে—একে কখনো শরীর

খারাপ হওয়া বলে না। আমার দুধারে যেন প্রজাপতি পাখা মেলেছে– আমি উড়ে যেতে পারি। আমার হাতের উপর মির্চা আবার তার মুখ রাখছে–আকাশ নেমে এসেছে, রৌদ্রতপ্ত নীলাকাশ যেন মাটির উপর পড়ে গিয়েছে। ‘নীল অম্বর চুম্বন নত’ হয়ে স্থির হয়ে আছে আমার হাতের উপর।

সেদিন রাত্রিটা একটা আশ্চর্য রাত্রি। চারিদিক জ্যোৎস্না আলোছায়া মেলে কলকাতার ঐ রাস্তাটাকে ইন্দ্রপুরী করে তুলেছে। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি—ঘড়িতে বাজছে একটা, দুটো, ঢং ঢং— চাঁদ এদিক থেকে উঠে ওদিকে চলেছে —চলেছে কালপুরুষ— আমি দাঁড়িয়ে আছি বারান্দায় একা, আমার চুল বাঁধা হয়নি, চুল উড়ছে, আমার ছায়া পড়েছে পাশের দেওয়ালে—আমি নার্সিসাসের মতো নিজের ছায়ার দিকে চেয়ে আছি, 'পূর্ণ চাঁদের মায়া' জড়ানো আমার ঐ তন্বী দেহ-ছায়া আমাকে আশ্চর্য করে দিচ্ছে। ঐ শরীরে যে মন বাস করে সে কেমন? আমি তার সন্ধানে আছি—মির্চা আমার আত্মাকে দেখতে চায়—শঙ্কর বলেছেন আত্মা ছাড়া জগৎ মিথ্যা—সবই ঐ ছায়াটার মতন। কিন্তু ঐ ছায়াটাও তো মিথ্যা নয়- -ওর পাশে ঐ যে মাধবীলতাটা দুলছে ওটাও সত্য, জ্যোতির্ময় সত্তা।

আমার ভালো লাগছে, কি আশ্চর্য সুখে আমার দেহ মন ভরে রয়েছে —'আনন্দসাগরে ভাসা' কথাটা শুনেছিলাম, এই প্রথম বুঝলাম তার ঠিক অর্থটা কি। আমার মন ঐ জ্যোৎস্নার মতো হয়ে গেছে—সোমপায়ীদের মতো আমি জ্যোৎস্না পান করে আকাশগঙ্গায় ভাসছি—আমার হাতে তারার প্রদীপ, গলায় তারার মালা, উপরে লাল রঙের ব্রহ্মহৃদয় জ্বলছে, ঐ তো আমার টিপ — আমার পায়ে তারার ঘুঙুর বাজছে— রুমুক ঝুমুক রিমি ঝিম্—ওটা ঘুঙুর নয়, নিচে মির্চা পিয়ানো বাজাচ্ছে—ও নিশ্চয় অনেক রাত অবধি বাজাবে। ও ঘুমোতে পারবে না, আমিও যেমন পারছি না, আমি জানি ও কি চায়। অজ্ঞাত রহস্যলোকের পর্দাটা সরে যাচ্ছে—আমি বুঝতে পারছি তার ওপাশে কি আছে, আমার মার কথায় আমার অচল বিশ্বাস ছিল কিন্তু সে বিশ্বাস কমে যাচ্ছে—এখানে পাপ কিছু নেই, তাহলে তো আমি চিনতে পারতাম যেমন বহুবার চিনেছি উদ্যত সর্পকে, কিন্তু এ তো জ্যোৎস্নার বাগান, এ তো পদ্মের সরোবর কিংবা কবি যে লিখেছেন রূপসাগর—এই কি সে রূপসাগর? কোনো কিছু ভাবতে গেলেই আমার কবিতা মনে আসে, কবিতা মনে এলেই কবিকেও মনে

পড়ে। কতদিন আমি তাঁকে দেখি নি, কিন্তু সেজন্য আমার কষ্ট হচ্ছে না, এটা কি অন্যায়? এটা কি সত্যভঙ্গ? আমি কি কোনো প্রত্যূষে প্রথম সূর্যের দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম— 'ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা প্রভু তোমার পানে, তোমার পানে',—আমি আর কিছুকে আর কাউকে তোমার চেয়ে বড় হতে দেব না—আমি কি সে সত্যচ্যুত ? কয়েকদিন থেকে এই কথাটা আমার মনে যাওয়া আসা করছে, আমি উত্তর পাইনি—আজ আমি উত্তর পাচ্ছি—আজ উত্তর আনন্দের সিঁড়ি বেয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সত্য থেকে কি কেউ চ্যুত হতে পারে? সত্য সবাইকে ধারণ করে রাখে। আমার মনের সমস্ত তারগুলি তো তাঁরই সুরে বাঁধা, তিনিই বাজাচ্ছেন এই গান—আমার দেহ-মন জুড়ে সুরের তরঙ্গ তুলেছেন তিনিই তো— তাঁর গানের ভিতর দিয়েই আমার মন এই আশ্চর্য রহস্যলোকের ভিতর ঢুকছে—ঠিক যেমন লিখেছেন—'তোমার গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি, তখন তারে চিনি আমি তখন তারে জানি—' উনি ঈশ্বর সম্বন্ধে লিখেছেন আমি মানুষ সম্বন্ধে ভাবছি, আমি একটা ছোট্ট মেয়ে, মানুষই যথেষ্ট আমার পক্ষে—ঈশ্বরের দরকার নেই।

শান্তি আধঘুমে অপেক্ষা করে আছে ঘরের মধ্যে, এবার সে ডাকল—"রু, শুতে আসবে না ভাই।"

"যাচ্ছি ভাই যাচ্ছি।"

আমার ঘরে আমার এগার বছরের বোন সাবি আর শান্তি শোয়। শান্তি মাটিতে শুয়ে আছে—আমি আর সাবি খাটে শোব। কোনো কোনো দিন আমি মাটিতে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে থাকি, আমার ভালো লাগে। সাবি ঘুমোচ্ছে। আমি ওর পাশে বসে ওর গায়ের চাদরটা ঠিক করে দিলাম। কোঁকড়া কোঁকড়া চুলে ঘেরা ওর সুন্দর মুখের ওপর জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। কি সরল নিষ্পাপ ওর আলোয় ধোয়া মুখ। কিন্তু মানুষ কি সত্যই কখনো সরল থাকে? আজ সকালে লাইব্রেরী থেকে যখন বেরিয়ে এলাম ও সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিল, তখন আমি ওর উজ্জ্বল চোখে একটা তীক্ষ্ণতা দেখেছিলাম। সেটা কি? কথাটা মনে করে

আমার গায়ে কাঁটা দিল। একটা অজ্ঞাত অশুভ আশঙ্কা আমার আনন্দসাগরকে চঞ্চল করে তুলল। আমি হাত জোড় করে প্রার্থনা করতে চাইলাম। কার কাছে প্রার্থনা করব জানি না। মানুষের কান শব্দের তরঙ্গ ছাড়া শুনতে পায় না। একটু দূরেই তা পৌছয় না। কিন্তু এমন কি কোনো কান আছে যা দূরেও থাকে কাছেও থাকে ? যেখানে সব পৌছয়? কে তুমি আমার গুরুর হাতে পরশপাথর দিয়েছ আমাকে জাগাবে বলে? কে তুমি এই আনন্দ সাগরকে বইয়ে এনেছ? যদি তেমন কেউ থাকো তবে দিও, আমার হাতে অরূপরতন দিও – আমায় শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিও না। আমার ঘুম আসছে–মির্চা আমার হাতের উপর ছোট্ট একটা ক্ষত করে দিয়েছিল, আমি তাতে হাত বুলাচ্ছি আর সেটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে, আমার বুকের উপর ছড়িয়ে পড়ছে–আমি দেখছি আমি পড়ে আছি আহত– সে চলে গেছে।

বাবা বলেছেন, "মির্চা যদি কিছুটা সময় করতে পারে তাহলে সে আর তুমি বইয়ের ক্যাটালগ কর নূতন করে।" অনেক বই বাবার লাইব্রেরীতে। কয়েক হাজার, কত কে জানে–সাত-আট হাজার হবে। একটা বড় চৌকো কাঠের বাক্সে খোপ খোপ করা আছে, আর কার্ড তৈরী করা হয়েছে–আমরা প্রত্যেক দিন চার-পাঁচ ঘন্টা এক সঙ্গে কাজ করি। তারপর বিকেলে সবাই একসঙ্গে গাড়ি করে বেড়াতে যাই। মোটের উপর সাত-আট ঘণ্টা আমরা একসঙ্গে থাকি দিনের মধ্যে। তবু দুপুরে যেটুকু সময় উপরে যাই আমার অস্থির লাগে ওর কাছে আসবার জন্য। যেন একটা অদৃশ্য দড়ি দিয়ে ওর সঙ্গে কে আমায় বাঁধছে। এ বাঁধন কি ছিঁড়তে পারে? তাহলে আমি বাঁচবই না। কিন্তু এ কথাটা ঘুণাক্ষরেও কাউকে বলি নি। মীলুকেও না। ও বুঝতে পারবে না। ও আমাকে খারাপ ভাববে। কিন্তু আমি জানি আমি খারাপ নয়, কখনই নয়।

আমি মির্চাকেও বলিনি আমার মনের অবস্থাটা কি, ও তো সন্দেহে ভরপুর। আমার উপর ওর একেবারে আস্থা নেই বলেই মনে হয়।

যখনই আমরা একসঙ্গে থাকি—কোনো বইয়ের গল্প হয় কিংবা কবিতার। 'হাঙ্গার' বইটা পড়েছি, আমার ভালো লাগে নি। একটা বিশেষ কারণে ভালো লাগে নি। সে আমি ওকে বলতে পারব না। ওখানে একটা দৃশ্যের বর্ণনা আছে সেটা সম্বন্ধে জুগুপ্সা মিশ্রিত কৌতূহল আমার ভালো না লাগার কারণ। তাছাড়া 'হাঙ্গার' অর্থাৎ একটা লোক দিনের পর দিন অনাহারে আছে এ কষ্টটা আমি বুঝব কি করে? আমি কোনো দিন হাঙ্গারের পীড়ন জানি না। একদিনও অনাহারে থাকিনি। সর্বদা ভালো ভালো খাবার নিয়ে মা সাধাসাধি করছেন, দেহের অন্য হাঙ্গারের কথাও ওখানে আছে—আমি এখনও তার কোনো পীড়নে পীড়িত নয়। ঐ জগৎটা অপরিচিত আমার। আর মনের হাঙ্গার তো জানিই না —রূপে রসে বর্ণে গন্ধে তো তা পূর্ণ করবার আয়োজন রয়েছে। আমি ওকে বললাম, "আমি হাঙ্গার বইটা বুঝতে পারি নি।"

ও বললে, "কৈ দেখি?" আমি বইটা এগিয়ে দিতে গেলে ও আমার কটি বেষ্টন করে কাছে টেনে নিল আর আমি বোধ হয় যুগান্তরের সংস্কারের তাড়নায় বাঁহাতে ওকে ধরে থেকেও ডানহাত দিয়ে ওর ফর্সা গালের উপর—ছি ছি এখনও ভাবতে আমার লজ্জা হয়—একটা চড় মারলাম— বেশ জোরেই। ওর গালটা লাল হল। ও অবাক হয়ে চেয়ে আছে। আমার ডান হাতের কব্জিটা জোর করে ধরে ও আস্তে আস্তে বলল, "তুমি আমায় মারলে!"

"কী করব।"

"জানো তুমি, আমাদের দেশে কোনো মেয়ে যদি এরকম করে তাহলে সেটা অসম্ভব অপমান? ওকে জিল্ট করা বলে।"

"এটা তো তোমাদের দেশ না।"

"বেশ আমি কালকেই চলে যাব, আর কোনো দিনও আসব না।"

ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেছে, কি হবে, যদি সত্যি সত্যি চলে যায়। "ক্ষমা কর মির্চা, ক্ষমা কর। আমি ইচ্ছে করে করি নি।"

"ইচ্ছে করে কর নি?" ও বিস্মিত।

"সত্যি বলছি তোমায় কি করে যে কি হল জানি না। হাতটাই অসভ্যতা করেছে আমি করি নি।"

অবস্থাটা স্বাভাবিক হতে বেশিক্ষণ লাগল না। আমি অনুতপ্ত, খুবই নরম। মনের ভাবটা, আর একবার করে দেখ, কিছু বলব না। ও কিন্তু সাবধানে আছে, খুব সাবধানে।

আমাদের ঝগড়া মিটে গেছে, আমি অনেক ভেবে দেখেছি ও যখন আমাকে এত চায়, তখন একটা কিছু করতেই হবে। স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমার ধারণাটা খুবই অস্পষ্ট, কিন্তু কুয়াশার ভিতর থেকে একটু একটু স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আমি বুঝতে পারছি বুদ্ধি দিয়ে নয়, অনুভূতি দিয়ে। ফুলের উপর আলো পড়ে, তার পাপড়িগুলি যখন খোলে তখন ফুল তো জানে না ফল ফলাবার নির্দেশ আসছে কোন অলক্ষ্য থেকে। তেমনি প্রেম, সূর্যের আলোর মতোই উজ্জ্বল উত্তপ্ত প্রেম আমার শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে তাকে উন্মুখ করে তুলেছে। আমি জানি না তার নির্দেশ কিসের দিকে। শারীরিক শুচিতা সম্বন্ধে ভারতীয় মেয়েদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নানা বদ্ধমূল ধারণা আছে, আমিও তা থেকে মুক্ত নই। স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষকে তারা ভালোবাসে না—বাসতে পারে না, ছুঁতে তো পারেই না। অন্য পুরুষ হচ্ছে পরপুরুষ। কোনো কোনো মেয়ে সে রকম করে, তারা হচ্ছে স্বৈরিণী। এই পরিভাষাগুলো আমি শুনেছি। যেমন 'চোখের বালি'র বিনোদিনী হচ্ছে স্বৈরিণী। ইতিমধ্যে 'চরিত্রহীন'ও আমি 'নৌকাডুবি'র মলাটের মধ্যে রেখে পড়ে ফেলেছি। 'চরিত্রহীন'-এর ঐ দুষ্টু বৌটার সঙ্গে 'হাঙ্গার' বইয়ের লোকটার বেশ মিল আছে—ঐ তরুণী বিধবা বৌটা বলছে, 'যে তৃষ্ণায় মানুষ নর্দমার কালো জল অঞ্জলি ভরে পান করে আমার ছিল সেই পিপাসা।' এ তৃষ্ণাটা কি? সত্যি তো আর জলের নয়। কারণ ওরা যতই গরীব হোক ওদের বাড়িতে কল ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু এই বইগুলি বিশ্রী। আমার মনে গুনগুনিয়ে গান আসছে—

'চক্ষে আমার তৃষ্ণা,

তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।'

রবিঠাকুরের মতো সুন্দর করে আর কোথাও কোনো লেখক মনের কথা বলতে পারে না। ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে আমার বুকের ভিতরটা কাঁপছে। তবু আমি কতকগুলি ধারণা নিজেই তৈরী করে নিয়েছি, শরীরের কোন্ কোন্ অংশ স্পষ্ট হলে পাপ স্পর্শ হতে পারে। যেমন খাবার টেবিলে বসে ও যে ক্রমাগত আমার পায়ের উপর পা রাখে সেটা কখনো পাপ নয়। পাদস্পর্শ করলে পাপ হবে কি করে? এই হচ্ছে অকাট্য যুক্তি। হাতেও নিশ্চয় পাপ হবে না, হতেই পারে না, সর্বদা হ্যাণ্ডশেক করা হয়। তাই একদিন আমি লাইব্রেরীতে ওকে বললাম, "মির্চা তুমি আমার হাতটা নিতে পার।" এই বলে আমি আমার হাতটা তুলে ধরে ওর দিকে মেলে ধরলাম। ও দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার হাতটা ধরল। আমার হঠাৎ মনে হল এইবারে বুঝলাম কেন হাতকে মৃণালের সঙ্গে তুলনা করা হয়। বৃত্তের উপর করপল্লব পদ্মের মতো দেখায়—করকমল— আমার হাতের উপর ওর হাতটা কত ফর্সা—ঈষৎ ঈর্ষামিশ্রিত চোখে তাকিয়ে আছি, ও দুই লুব্ধ হাতে আমার হাতটা টেনে নিল—হাতের উপর মাথা রাখল, মুখ রাখল কাঁধের উপরে। সমস্ত হাতে ও পল্লবে আমি ক্ষণে ক্ষণে ওর অধরের স্পর্শ পেতে লাগলাম—ক্রমে ক্রমে আমার হাতটা আমার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল—কিংবা হাতটাই আমি হয়ে গেলাম। আমার সমস্ত অনুভূতি ঐখানে একত্র হয়েছে—আমার একাগ্র সত্তা ঐখানে স্পন্দিত। কতক্ষণ জানি না, কতক্ষণ ও আমার হাতের পল্লব ওর বুকের উপর রেখেছে, ওর শরীর ওর গলা আমার কনুই-এর উপরে, কাঁধের কাছে ওর মুখ। ও স্থির থাকছে না, ক্রমাগত নড়ছে। ক্রমে ক্রমে আমার হাত আর যেন রক্তমাংসের পদার্থ রইল না—ওর থেকে স্থূল বস্তু উধাও হয়ে গেল। আকাশজোড়া বিদ্যুৎ লেখার মতো চমকিত হতে লাগল—ওর ভিতরের অণু পরমাণু বিশ্লিষ্ট হয়ে গেছে—তারা ঘূর্ণমান, নর্‌তিত গ্রহ নক্ষত্রের

মতো ঘুরছে তারা—'গ্রহতারকা চন্দৰ তপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে'—আমি চোখ বুজে আছি— আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে— "মির্চা—একি, একি, একি!"

চোখের জলে আমার বালিশ ভিজে গেছে—আমি তো ভবানীপুরের লাইব্রেরীতে নেই—আমি বালিগঞ্জের বাড়িতে আমার খাটে শুয়ে আছি, কিন্তু কি আশ্চর্য আমার হাতটা এখনও আমি হয়ে আছে। আমার শরীর অসাড়—আমি পাশ ফিরতে চেষ্টা করছি, দেখি আমার স্বামী কনুই-এর উপর ভর করে ঈষৎ উত্থিত হয়ে আমার দিকে চেয়ে আছেন—"তোমার কি হয়েছে আমায় বলবে না।"

আমার আটত্রিশ বছর বিয়ে হয়েছে। আমি খুব নিপুণ সংসার করেছি, কোনো ত্রুটি নেই। আমি হাত বাড়িয়ে আমার স্বামীর হাতটা ধরবার চেষ্টা করলাম। ছি ছি, এতদিন পরে কেন এসব চিন্তা, কোথায় বা মির্চা ! তখনই এক বুকভাঙ্গা নিঃশ্বাস পড়ল—সে যেন বলল—এই তো আমি ! তোমার জীবনবায়ুতে প্রবিষ্ট । এতদিন ভুলেছিল কেন, কেন, কেন?

কিছুদিন থেকে আমাদের বাড়িতে একটা বেশ বড় রকমের গোলমাল শুরু হয়েছে, আমাদের খুব নিকট আত্মীয়া একটি মেয়েকে নিয়ে দিদিমা এ বাড়িতে এসেছেন। মেয়েটির নাম আরাধনা। সে আমার চেয়ে ছয় বছরের বড়—তবু আমরা বন্ধুর মতো। আরাধনা অপূর্ব সুন্দরী। ওদের বাড়িতে থেকে যতীন বলে একটি দরিদ্র ছেলে পড়াশুনো করত। পড়াশুনোয় খুব ভালো, দেখতে সুন্দর এবং অনুগত ছিল বলে আরাধনার বাবা ঠিক করলেন যে তার সঙ্গে যতীনের বিয়ে দেবেন। আরাধনার যখন বার বছর বয়স, তখন থেকেই এই বিয়ে স্থির। বড় হলে বিয়ে হবে। ওরা এক বাড়িতেই থাকে, ওদের দেখা-শোনা হয়, কিন্তু আরাধনা যতীনকে দু চোখে দেখতে পারে না। যতীন যদি ঘরে ঢোকে তবে আরাধনা তৎক্ষণাৎ উঠে চলে যায়। যতীন যদি ওকে চিঠি লেখে ও ছিঁড়ে ফেলে দেয়, না পড়েই। সে সময়ে নিজের বিয়ে নিয়ে মা-বাবার সঙ্গে কেউ কথা বলত না। তবুও ও বার বার ওর মাকে, বাবাকে, দিদিকে কেঁদে কেঁদে বলেছে, আমি ওকে বিয়ে করব না। ওকে আমার একটুও ভালো লাগে না। ওর মা-বাবা-দিদিরা তো অবাক। এ আবার কি কথা, অমন সোনার চাঁদ ছেলে ভালো না লাগবে কেন? বেশি বেশি আহ্লাদীপনা! ওর দিদিরা বললেন, 'ওর তোকে অত পছন্দ, তোর কেন নয়? তুই বা কি এমন রাজেন্দ্রাণী যে সাধা সম্বন্ধ ফিরিয়ে দেব আমরা?'

অতএব আরাধনার যখন চৌদ্দ বছর বয়স তখন যতীনের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে গেছে, ওদের একটি ছেলেও হয়েছে। এখন আরাধনার বয়স তেইশ, ওর স্বামী ওকে খুব খোশামোদ করে, সর্বক্ষণ ওর পায়ে পড়ে আছে বললেই হয়। কিন্তু আরাধনা বলে ওর জীবনটা বিরাট এক ডোজ কুইনাইন মিক্সচার। মুখ থেকে তেতো আর যাচ্ছেই না। "ভাই রু ঐ লোকটার সঙ্গে থাকতে যে আমার কি কষ্ট, কি বলব তোকে!"

"কেন ভাই যতীনমেসো তো খুব ভালোবাসেন তোমায়!"

"রাখ, রাখ, ও সব ন্যাকামো।"

কিন্তু একদিন এই কুইনাইনের তেতো ওর মুখ থেকে চলে গেল—মুখে মধুর আস্বাদ পেল আরাধনা। ওদের পাশের বাড়িতে একটি তরুণ প্রফেসর, ওরই বয়সী, এলেন। ওদের সঙ্গে আলাপ হল। আরাধনা জানতে পারল কার প্রতীক্ষায় এতদিন তার শরীর-মন কুইনাইন মুখে নিয়েও বেঁচে ছিল।

কিন্তু ঐ তরুণ প্রফেসর, তার নাম সৌমেন, তিনিও তো ভারতীয় নারীর কোলে জন্মেছেন, আমার মায়ের মতন তাঁরও মা তাঁকে ভালোমন্দ চিনতে শিখিয়েছেন, এদেশের যুগ-যুগের আদর্শ অনুসারে। যদিও সে আদর্শ পুরুষের জন্য ছিল না; কিন্তু সৌমেন তো শুধু ভারতীয় নয়, সে আবার আধুনিকও তাই নীতির ক্ষেত্রে সে স্ত্রী-পুরুষের তফাৎ করে না। সৌমেনের ভালোবাসা আরাধনার চেয়েও অনেক গভীর, সারাজীবন দিয়ে সে তার প্রমাণ দিয়ে গিয়েছে! কিন্তু তবু সে ওকে বলেছে তাদের দেখাশোনা না হওয়াই ভালো। স্বামীর প্রতি আরাধনার কর্তব্যচ্যুতি সে চায় না। হিন্দুরা তো বিবাহবিচ্ছেদ করতে পারে না, তবে? তবে কি হবে এর পরিণাম? কাজেই দেখাশোনা আর সে করবে না। আরাধনার কিন্তু অত নীতিজ্ঞান নেই, বলে— দেখাশোনা হবে না কেন? দ্রৌপদীর যদি পঞ্চপতি থাকতে পারে আমার না হয় দুটোই রইল ! কিন্তু এটা ঠাট্টা। সৌমেন নিজের মন নিয়ে অস্থির হয়ে গেছে—ছটফট করছে, ঠিক করতে পারছে না কর্তব্য। শেষ পর্যন্ত আরাধনাকে একটি চিঠি লিখে পতিব্রতা হতে অনুরোধ জানিয়ে সে ক্রিশ্চানদের পেনিটেনশিয়ারীতে বন্ধ হয়ে আছে। নিজেই নিজেকে বন্ধ করেছে। কিন্তু আরাধনার প্রতিজ্ঞা ওর ব্রতভঙ্গ করবেই। একদিন আরাধনা আমায় বলল, “ভাই রু, তুই তো খুব ভালো লিখতে পারিস, আমায় একটা চিঠি লিখে দে না, বেশ কবিতা-টবিতা দিয়ে।”

“কি করে পাঠাবে ঐ মঠে?”

“সে আমার উপায় আছে। তুই লেখ, যেমন বলি লেখ, সৌমেন আবার খুব বিদ্বান কিনা বানান ভুল হলে ওর খারাপ লাগবে, তাই তোকে বলছি; নৈলে আমি কি আর লিখতে পারি না।

আমি তো বেশ গর্বিত। জীবনে প্রেমপত্র লেখার সুযোগ এই প্রথম। প্রেমপত্র লেখবার জন্য আরাধনা 'চয়নিকা' নামিয়েছে; মহা মুশকিল, রবিবাবুর প্রেমের কবিতা আর ঈশ্বরের কবিতার তফাৎ বোঝা যায় না। যা হোক 'গুপ্তপ্রেম' ও 'ব্যক্তপ্রেম' এ দুটো খুব স্পষ্ট। আরাধনা খুঁজে বের করেছে—'পরাণে ভালোবাসা কেন গো দিলে রূপ না দিলে যদি বিধি হে—এই লাইনটা নাকি ঢোকাতেই হবে। আমি বললাম, "তুমি এত সুন্দর দেখতে এ কবিতা তোমার পক্ষে খাটবে না তো।" আরাধনা চিন্তিত, সে খুঁত খুঁত করতে লাগল, "তাই তো কি হবে, কবিতাটা খুব ভালো ছিল কিন্তু।"

যা হোক, শেষ পর্যন্ত আটাশ পাতা প্রেমপত্র লেখা হল এবং অব্যর্থভাবে তা লক্ষ্যসন্ধান করল। সেই শব্দভেদী বাণ যথাস্থানে পৌঁছতে, বাণবিদ্ধ সৌমেন স্বরচিত কারাগার ছেড়ে এসে উপস্থিত হল। সম্ভবত সেটা আমার পত্রের গুণে নয়। সে নিজেই একটা ছুতোর অপেক্ষায় ছিল। এর পরে সে একদিন সপুত্রক আরাধনাকে নিয়ে আগ্রায় পালিয়ে গেল। তারপরের ব্যাপারটাই হচ্ছে আমার বর্তমান উদ্বেগের কারণ। আরাধনাকে নিয়ে যে সৌমেন চলে গেল এই ঘটনার একটা পরিভাষা আছে, সেটা না বললে বোঝা যায় না কাজটা কত খারাপ। 'ঘরের বৌকে বের করে নিয়ে যাওয়া।' এই ভয়ানক পাপ সৌমেন করেছে রোজ শুনছি। যেন আরাধনা করে নি। আমি তো জানি আরাধনাই সৌমেনকে মঠের কারাগার থেকে বের করে এনেছে, এবং আমি তাকে সাহায্য করেছি কিন্তু আমি সত্যিই জানতাম না যে এর ফলে এতবড় পাপ ঘটবে।

যতীন লিখেছে যে সে পাগল হয়ে গেছে—তাই আরাধনার বাবা ছুটেছেন মেয়েকে ফিরিয়ে বা ছিনিয়ে আনতে এবং এনেছেনও। ঐ নির্বোধ কাণ্ডজ্ঞানহীন ছেলেমেয়ে দুটোকে যথোপযুক্ত সাজা দেবার ব্যবস্থাও হচ্ছে। আমার বাবা ওর বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠি দেবেন, দিলেই সৌমেনের চাকরী চলে যাবে। এই সব ঘটনার মধ্যে ভয়ে কাঁপছি আমি। যদি কোনো রকমে বেরিয়ে পড়ে ঐ ঐতিহাসিক প্রেমপত্রটির রচয়িতা আমি, তাহলে কি হবে। মা তাহলে কি করতে পারেন

আমি ভাবতেই পারি না। মা যে কতখানি দুঃখ পাবেন তার মাপই হয় না। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলবেন, "এ্যা, তুমি আমার মেয়ে হয়ে এতো জঘন্য কাজ করেছ? লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হচ্ছে, এই শিক্ষা দিয়েছি তোমায়?" মা হয়তো দোতলা থেকে লাফ দিয়েও মরে যেতে পারেন। আর বাবা! বাবা যদি শোনেন তাহলে যে ধমকটা খেতে হবে সেটা ভেবে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হচ্ছে, "এ্যাতো এঁচড়ে পেকেছ! পড়াশুনোয় তো অষ্টরম্ভা। কোথায়, ণিজন্ত প্রকরণ মুখস্থ হয়েছে? ষত্ব-ণত্ব জ্ঞান হয়নি, আটাশ পাতা প্রেমপত্র লিখেছ?" এমন চিৎকার করে ধমক দেবেন যে 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' নাম শুনে 'হ য ব র ল'তে যেমন বাড়িটা পড়ে গিয়েছিল সেই রকম এই বকুলবাগানের বাড়িটা পড়ে যাবে চুরমার হয়ে। দু'দিন ধরে আমি ভয়ে কাঁপছি, আমার একমাত্র ভরসা, আরাধনার নিশ্চয় এটুকু অহঙ্কার আছে যে বলে দেবে না তার প্রেমপত্রটা অন্য কেউ লিখে দিয়েছে।

এ কয়দিন ক্যাটালগও করা হয়নি। মির্চা কত কি মাথামুণ্ডু ভাবছে কে জানে। আমি বেশ বুঝতে পারি ও আমাকে একটুও বিশ্বাস করে না। এই যেমন ওকে আমি সেদিন বললাম—আমার 'ছাতিম গাছ' কবিতাটা 'কল্লোল'-এ পাঠিয়েছিলাম, সেখান থেকে কবি—বাবু একটা খুব সুন্দর চিঠি লিখেছেন। কথাটা ওর ভালো লাগে নি। আচ্ছা একজন কবি কি করে একজন কবিকে একটা চিঠিও লিখতে পারে না? আমি জানি কেন মির্চা এত অনিশ্চিত—আমি তো ওকে একবারও বলি নি আমি ওকে ভালোবাসি কিনা যদিও ও বহুবার বলেছে। আমি কি করে বলব? আমি তো জানি না আমার যে এই কষ্ট মেশান আনন্দ হচ্ছে, আমার যে কেবল ওর কাছে যেতে ইচ্ছে করছে এটাই ভালোবাসা কিনা। আমাকে জানতে হবে এটা সত্যি কি। আমার এত যে বন্ধু মীলু তাকেও আমি বলি নি। বলব কি করে, আর বলে কোনো লাভ নেই, ও জানবেই বা কি করে, ও তো কাউকে ভালোবাসে নি। আমাকে খুশি করবার জন্য যা হোক একটা কিছু বলে দেবে।...একজনকেই শুধু আমি

বলতে পারি, তাঁকেই আমি বলব। কারণ তিনিই আমার বন্ধু। বয়স দিয়ে কি আর বন্ধু হয় ! বাবা বলেন বন্ধুর সংজ্ঞা হচ্ছে—অত্যাগসহনো বন্ধুঃ—যার ত্যাগ বা বিচ্ছেদ সহ্য করা যায় না। আমি তো তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারি না। তাই নাকি? এ কথাটা ঠিক নয়। কতদিন আমি তাঁকে দেখি নি, কই আমার তো যেতেও ইচ্ছে হয় নি, কেন? কেন? কেন? তা কি আর জানি না —মির্চাকে ছেড়ে একদিনও কোথাও যেতে চাই না তাই।

হঠাৎ আমার তাঁর জন্য খুব মন কেমন করতে লাগল— আমি কাঁদতে লাগলাম—— চির পথের সঙ্গী আমার চির জনম হে।'...মীলু এসে ঘরে ঢুকল। "রু, ইউক্লিড জিজ্ঞাসা করছে আজ ক্যাটালগ করা হবে না?"

"হবে, নিশ্চয় হবে।" আমি নিচে যাবার জন্য তৈরী হলাম। চুল ঠিক করলাম, টিপ পরলাম। আর তো আমাদের সাজসরঞ্জাম নেই। সেণ্ট মাখাও হচ্ছে না, সে তো বিলাতী জিনিস তাই আমরা গোলাপজল, কেওড়া, কখনো কখনো আতর ব্যবহার করি। মা বলেন আমার- ও সব দরকার নেই, আমি পদ্মিনী কন্যা, আমার জামায় অমনি সুগন্ধ হয়। তবে কেন আমি সুগন্ধ মাখছি? তা কি আর জানি না! আমি ওকে ধোঁকা দিচ্ছি। বেচারা ভাবছে আমি ওকে ঠেলে দিচ্ছি কিন্তু সেটা ঠিক নয়। আমি ওকে কাছেই চাই।

সিঁড়ি দিয়ে নামছি আর আমার শরীর শির্ শির্ করছে—এটা ঘটল ঠিক সেই দিন কিনা আমি বলতে পারব না। কারণ আমার তো কোনো জার্নাল নেই। বেয়াল্লিশ বছর আগের কথা আমি লিখছি, ডায়রী থেকেও নয়, স্মৃতি থেকেও নয়। ঘটনাগুলো তাই পরপর লেখা হচ্ছে কিনা তা আমি জানি না।

'পর পর' অর্থাৎ তখন যা পর পর মনে হয়েছিল, এখন এর আগেও নেই পরেও নেই—এখন ঐ দিনগুলো একই সময়ে বর্তমান, কথাটা আমি বোঝাতে পারছি না। বোঝান শক্তই বা কি? শ্রীকৃষ্ণের ব্যাদিত আস্যের মধ্যে অর্জুন তো একই সঙ্গে জগৎ দেখেছিলেন। আমিও আজ তাই দেখছি। পার্বতী ও গৌতমী, তোমাদের বিশ্বাস করতে হবে—এটা স্মৃতি নয়, বর্তমান, আমি ক্ষণে

ক্ষণে ১৯৩০ সালে প্রবিষ্ট হচ্ছি। আমাকে স্পর্শ করে আছে ১৯৩০ সাল। তাই আমি লিখেছি—

সময়ের সমুদ্র পারায়ে
যে জীবন গিয়েছে হারায়ে
যদি সে ফিরেই ফের আসে
আলো হয়ে মনের আকাশে
চন্দ্রতারকার সাথে
বসে একাসনে
সে সূর্যস্বরূপ—
আমাকে দেখাবে বিশ্বরূপ-
তখন আর অন্য পন্থা নাই
প্রণিধায় কায়ং প্রসন্নতা চাই।...

আমি তাই তোমাদের বলেছি—প্রসীদ, প্রসীদ, প্রসন্ন হও—আমার সমস্ত জীবন — -ভ্রান্তি অপরাধ ও ত্রুটি সব নিয়ে তোমাদের কাছে, মানুষের কাছে, নিবেদন করছি—অন্য ঈশ্বর আমি জানি না।

কিন্তু আমি অর্জুনের মতো এই রূপ সংহরণ করতে বলব না। আমি দেখতে চাই। আমি আবার দেখতে চাই। আমি দুই হাতে ওকে ধরতে চাই।...অলৌকিক প্রত্যাশা এসে আমার বুদ্ধির কেন্দ্রটা শিথিল করে দিয়েছে, আমি প্রার্থনা করছি, যদি সত্যই কোথাও কেউ থাকে আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা, তবে এই চল্লিশটা বছর পার করে নিয়ে যাও। ওর মুখের রেখাগুলো আমার চোখে পড়ছে না, শুধু ওর চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা ছাড়া মুখের আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না এখন— কেবল সব সময়ে ওর ফর্সা গলাটা দেখি আর শার্টের ফাঁক দিয়ে মুখ বের করে থাকা বুকের একটু অংশ। আমি ঐখানে কাত পেতে শুনতে চাই—গভীরে খুব গভীরে জন্মান্তরের মতো বিচ্ছিন্ন অথচ যুক্ত সেই আশ্চর্য

সুরটা এখনো কোথাও বাজছে কিনা—।‘সেই প্রথম আলোর চরণধ্বনি’, সেই প্রথম প্রেমের কল্লোল।

আমরা বই সাজাচ্ছি—নাম লেখা হচ্ছে কার্ডে—বাক্সে কার্ড ফেলা হচ্ছে। আমরা কাজ করে যাচ্ছি, নীরবে। আমি আড়চোখে ওকে দেখছি-ওর হাতটা একটু একটু কাঁপছে—ওর ভিতরে কি হচ্ছে কে জানে। তারপরে? তারপরেই কি? জানি না কোন দিন। কোথায় ? কোন ঘরে আমি দেখতে পাচ্ছি না, আমি দেখছি একটা গরাদ দেওয়া বড় জানালা—আর তার সামনে আমরা— আমি হঠাৎ দেখলাম আমি ওর ভুজবন্ধনে আর ওর মুখ আমার মুখের উপর নেমে আসছে—আমি চেষ্টা করছি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে; যুদ্ধ করছি, কেন যুদ্ধ করছি কে জানে? জানি না, পরাজিত হবার জন্যই নিশ্চয়। শুচিতা রক্ষা করবার জন্য নয়, কখনো নয়। আমি পরাজিত হলাম। মির্চা আমার মুখের উপর তার মুখ রাখল। নরম মধুর স্পর্শে আমার মুখটা খুলে গেল, আমি মুখের ভিতর তার মুখের স্পর্শ পেলাম। আমার সারা শরীর গান গেয়ে উঠেছে তবু আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে, আমার ঐ রকমই—কোনটা যে হর্ষ কোনটা বিষাদ বোঝা যায় না।

ও কোথা থেকে এত আনন্দ নিয়ে আসতে পারে? কি করে এরকম হয়? আমি যা শুনেছিলাম, আরাধনা আমায় যা বলেছিল, এ তার থেকে অনেক ভালো। অবশ্য শুনে কিছুই বোঝা যায় না। পড়েও না। এরকম সবাই জানে কি —এইসব প্রশ্ন আমার মনে আসছে, মন কানায় কানায় ভরে গেছে—একটুও পাপবোধ নেই—আর আমার পাপ হবেই বা কেন? আমি তো কিছু করিনি—আমি তো বাধা দিয়েছি—মির্চার পাপ হয় হোক। ওদের দেশে এতে পাপ হয় না। ও যে সব গল্প করেছে তাতে আমি বুঝতে পেরেছি। ও আমায় ছেড়ে দিয়েছে, আমি চুল ঠিক করে নিচ্ছি, বিস্রস্ত আঁচল গুছিয়ে নিচ্ছি। মনের ভিতর গুনগুন করছে —'আমার প্রাণের ভিতর সুধা আছে চাও কি?'

"রু রু রু—"

"যাচ্ছি মা—"

আমার শরীর হালকা হয়ে গেছে, আমি হাঁটতে পারছি না, উড়ে যাচ্ছি– দুধারে আমার বিস্রস্ত কেশভার ডানার মতো হয়ে গেছে–মনের ময়ূর নাচছে। আমি সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছি—'উল্লাস উতরোল বেণুবন কল্লোল, কম্পিত কিশলয়ে মলয়ের চুম্বন।'...

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, সিঁড়ির উপর শান্তি আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, সে চোখে ঈর্ষা নয়, না-না, নিন্দাও নয়, আছে শুধু সন্ প্রত্যয় জ্ঞা ধাতুর উত্তর– জিজ্ঞাসা, জিজ্ঞাসা, জ্ঞানের ইচ্ছা। কিন্তু ভয়ে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা, 'কম্পিত কিশলয়' স্তম্ভিত হয়ে গেছে–'মলয়ের চুম্বন'-ও মলয় বাতাসে কোন গর-ঠিকানায় চলে গেছে কে জানে। কিন্তু সাহস দরকার, ভয় পেলেই বিপদ। তাই নির্বিকার মুখে বললাম, "কি দেখছিস হাঁ করে?"

"হা করে কি দেখছি? কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

চোরের মার বড় গলা। আমি খুব দর্পিত ভঙ্গিতে বললাম, "তুমি জান না? ক্যাটালগ করছি না ?"

শান্তি স্থির চেয়ে রইল–এবার আর জিজ্ঞাসা নয়, কেমন যেমন উদাস, ওর চোখে কি জল?

শান্তি আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়, আমি ষোল পূর্ণ হয়ে সতেরতে পড়ব, ও তাহলে একুশ পূর্ণ হয়ে বাইশে। ও দেখতে ওর দাদা খোকারই মতো, ওর মুখ চওড়া–নাকও তাই, বিশেষ কিছু সুন্দর নয়– শুধু ওর দুটি উজ্জ্বল চোখের উপরে বাঁকা ধনুকের মতো দুখানি ভুরুর রেখা ছাড়া। ও খুব কথা বলে, হাসি খুশি মেয়ে। ওরা বরাবর গরীব। খুবই গরীব। ওর দাদা আর ও দুজনেই আমাদের বাড়িতেই থাকে। লেখাপড়া সামান্যই জানে- শেখবার সুযোগ পেল কোথায়? নয় বছর বয়সে তো বিয়েই হয়ে গেল পূর্ববঙ্গের কোনো গ্রামের একটি উনিশ বছরের ছেলের সঙ্গে। ছেলেটির নাম রমেন। উনিশ বছরের ছেলে এক বছর পরেই কুড়ি হল, আর এক বছর পরেই একুশ, তখন তার পূর্ণ যৌবন। কিন্তু শান্তি তো দু বছরে মাত্র এগার বছরের হয়েছে। তাও খুব ছোটখাট

ছেলেমানুষ ছিল। কাকা বলেন, রমেন ভেবেছিল ঘুম ভেঙেই দেখবে তার বৌ একটি প্রমাণ সাইজের মেয়ে হয়ে গেছে–তা যখন সে হতে পারে নি তখন সেটা তার বৌয়েরই দোষ! সেই মহা অপরাধের সাজা দেবার জন্য রমেন একটি প্রমাণ সাইজের মেয়ে বিয়ে করে আনল। এ মেয়েটি শুধু বড় নয়, সুন্দরীও। কাজেই শান্তি তার স্বামীর বাড়িতে দাসী হয়ে গেল। ওর কাজ ছিল শুধু ঐ দুজনের সেবা করা। ওর স্বামীর খাট থেকে নেমে ওকে মাটিতে শুতে হল। ওরা দুজনে মশারী ফেলে শুয়ে থাকবে আর শান্তি বেচারা বসে তাদের পা টিপে দেবে। একটু এদিক ওদিক হলে ওরা লাথি মারবে। শান্তি বলে, "পা টিপতে তত আপত্তি ছিল না, না হয় স্বামীর পা টিপলুমই কিন্তু ভাই ফরিদপুরের গ্রামের মশার কামড় !" এরকম আর কতদিন চলে, কতই বা মানুষ সহ্য করতে পারে। অবশেষে শান্তি একদিন বিষ খেল, অবশ্য মরল না। ওদের প্রতিবেশীরা খবর দিতে খোকা ওকে গিয়ে নিয়ে এসেছে। শান্তির মা, যিনি আঠারটি সন্তানের জননী, তিনি শান্তিকে তাঁর সেই দুর্বৃত্ত স্বামীর ঘরেই ফেরৎ পাঠাতে চান। বলেন, শত হোক স্বামীর ঘরই মেয়েমানুষের ঘর। আমার মা এই শুনে তাড়াতাড়ি ওকে নিয়ে এসেছেন। শান্তির মা বলেন, "বৌঠান তুমি যে ওকে স্বামীর ঘরে যেতে দিচ্ছ না, যুবতী মেয়ে একলা থাকবে কোথায়? সারাজীবন ওর ভরণপোষণই বা করবে কে?" মা বলেছেন, "চিন্তার কোনো কারণ নেই, ও আমাদের বাড়িতে থেকে নার্সিং পড়বে। ওকে আমি নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দেবই।"

পরের বিপদে সাহায্য করার ব্যাপারে মা একলাই একটা ইনস্টিট্যুশন। কত লোককে সাহায্য করেছেন তার কোন হিসেব নেই। খোকাও এ বাড়িতে থেকে টাইপিং শিখছে কিন্তু শান্তি আর খোকা এক নয়। শান্তি উদয়-অস্ত পরিশ্রম করে তার অন্নের ঋণ শোধ করে। সকলেই ওর উপর হুকুম করে, আমিও। "শান্তি এক গ্লাস জল দে তো" বলতে কারু লাগে কি কোনো বাধা? কিন্তু খোকা? ও হাসাতে পারে। তাছাড়া কোন কাজ ওকে দিয়ে হবার জো নেই। বাবা ওকে

দুচোখে দেখতে পারেন না। ও পারতপক্ষে বাবার সামনে আসে না। বাবা যদি পারেন তবে ওকে বাড়ি থেকে এখনই বের করে দেন কিন্তু মার জন্য পারেন না। মা কাউকে তাড়াবেন না। আর এ সংসারে নিঃসন্দেহে তিনিই কর্ত্রী। শান্তি বেচারীকে স্বামী থেকেও বিধবার জীবন যাপন করতে হবে। সেজন্য মার খুব দুঃখ। তবে পুরোপুরি বিধবা নয়, ও সিঁদুর পরতে পারে, পাড়ওয়ালা কাপড় পরতে পারে, দুবেলা ভাত তো খেতে পারেই, মাছও খেতে পারে। কিন্তু বিয়ে আর ওর হবে না। হিন্দুর মেয়ের স্বামী মরলেই বিধবা হয় না। তো স্বামী থাকতে। কিন্তু মা যদি পারেন তবে ওর বিয়ে দেন। মা বলেন, "যদি কোনো উপায় থাকত তবে আমি শান্তির বিয়ে দিতাম—ও তো কুমারীই—কিন্তু উপায় তো নেই।" বে-আইনি কাজ করলে রমেন এখানে এসে ধুন্ধুমার লাগিয়ে দেবে, অর্থাৎ ধুন্ধু দানবকে হত্যা করবার সময় যে রকম কোলাহল হয়েছিল সেইরকম কোলাহল করবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। লোক জড়ো করবে, থানায় যাবে, এসব সে পারে- এবং দু একবার সামান্য কারনে করেওছে।

কিন্তু শান্তি একজনকে ভালোবাসে—সে ওর মার বাড়ির কাছেই থাকে—তার পায়ের শব্দের জন্য শান্তি কান পেতে থাকে। কিন্তু সে এ বাড়িতে আসে না। মা কিছুতেই এটা বরদাস্ত করবেন না। তার স্ত্রী আছে, সে বিবাহিত। শান্তির জীবনের এ সমস্যার কোনো সমাধান নেই।

তাই আমি ভাবছি, শান্তির চোখে জল দেখলাম কেন? ও এত কষ্ট পেয়েছে যে ওর চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে। একটা শঙ্কা আমার বুকের ভিতর গুরগুর করে উঠল। আর তখুনি গুনগুন করল একটা গানের কলি—শঙ্কিত চিত্ত মোর, পাছে ভাঙ্গে বৃন্ত ডোর...' আচ্ছা রবিঠাকুর এত জানলেন কি করে? তাঁরও নিশ্চয় এরকম হয়েছিল—এরকম মানে—মির্চার মতো, আমার মতো নয়, আমি তো মেয়ে— ! বাঃ! এ তো মেয়েদেরই কথা, 'শরম রক্তরাগে, তার গোপন স্বপ্ন জাগে'—এ তো ছেলের কথা নয়, 'শরম' 'ভরম' এসব তো মেয়েদেরই ব্যাপার। তাহলে কোনো মেয়ে ওঁকে বলেছিল, কে সে হতে পারে ?

বইগুলো খুঁজে খুঁজে দেখতে হবে। ছিঃ, গুরুজন সম্বন্ধে বাজে কথা ভাবতে নেই। আমি আয়নার সমানে দাঁড়িয়েছি, আমার আঁচল খসে গেছে—আমার নাচতে ইচ্ছে করছে। আমি হাততালি দিয়ে দিয়ে ঘুরছি

যৌবন সরসী নীরে, মিলন শতদল,
কোন চঞ্চল বন্যায়, টলমল টলমল —।

এই গানটা কিছুদিন আগে প্রেসিডেন্সী কলেজে সুশীল দে-কে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইতে শুনেছিলাম। কী ভালো লেগেছিল ! কতবার ভেবেছি ঐ ভদ্রলোকের কাছে আর একবার শুনলে হতো, তা কি করে হবে? বাবাকে কি বলা যায় তোমার ছাত্রের কাছে ঐ গানটা শুনতে চাই আমি। অবশ্য বললে কি হতো? কিছুই হতো না। বাবা বেশ গর্বভরেই বলতেন, “ও সুশীল, আমার মেয়ে তোমার কাছে একটা গান শুনতে চায়—তুমি একবার আমাদের বাড়ি এস!” যা হোক আমি তা বলি নি। আর তাছাড়া গানটা তখন ভালো করে বুঝিই নি। এখন বুঝছি, প্রত্যেক দিন এক একটা গান বা কবিতা আমার মনে বা শরীরে অর্থবান হচ্ছে। শরীরেও? শরীর কি গানের অর্থ বোঝে? নিশ্চয়ই। এই গানটা তো আমার শরীরেই অর্থ পাচ্ছে। তাই তো আমার নাচতে ইচ্ছে করছে টলমল, টলমল, টলমল—আমি ঘুরছি, ঘুরছি, ঘুরছি। শান্তি ঘরে ঢুকে আয়নার সামনে টুলটায় বসল। ওর সুন্দর বাঁকা যুগল ভুরুর মাঝখানে সিঁদুরের টিপ জ্বল জ্বল করছে, আম::ার সিঁদুর পরতে ইচ্ছে করছে। আমি ওর মুখটা আমার দুহাতে ধরে গান করলাম—

“তারই গন্ধ কেশর মাঝে একবিন্দু নয়ন জল টলমল টলমল, – ও শান্তি যৌবন সরসী নীরে মিলন শতদল কি, তা তুই জানিস?”

‘ক্ষেপে গেলে নাকি?”

“আমার নাচ শিখতে ইচ্ছে করছে। শান্তিনিকেতনে রবিঠাকুর মেয়েদের নাচ শেখাচ্ছেন।”

"যাও না শেখ।"

"তাহলেই হয়েছে।" বাবা আমাকে ছাড়বেন? বাবা আমাকে কোথাও যেতে দেবেন না। আমি এখানে বন্দী, অবশ্য স্নেহে বন্দী কিন্তু কোনো বন্দীদশাই সুখের নয়। একবার রবীন্দ্রনাথ আমাকে বলেছিলেন, "তোমার বাবার কাছ থেকে তোমাকে আমি কয়েক মাসের জন্য ধার নেব। আমি মালিনী নাটকের জন্য কাউকে খুঁজছি। তুমি পারবে। মালিনীর মতো তোমার মনের আকাশ আছে।"

"মনের আকাশ" এমন একটা কথা এই প্রথম শুনলাম, এর আগে আকাশ আকাশেই ছিল, ঐ কথাটা শোনা মাত্র তা মনে নেমে এল, তার সমস্ত নীল রঙ নিয়ে ছড়িয়ে গেল। কি যে এক অনির্বচনীয় আনন্দে মন ভরে গেল। উনি কথার যাদুকর, কথা দিয়েই উনি আকাশে মেঘ জড়ো করে অলকানন্দা নামাতে পারেন, মল্লারের দরকারই হয় না। কিন্তু বাবা আমাকে ছাড়বেন? তিনি বলবেন, "নাটক থিয়েটার করেই জীবনটা কাটাও আর কি। ছাত্রানাম্ অধ্যয়নং তপঃ।"

"দেখ শান্তি, আমার যখন বিয়ে হবে, আমি যখন স্বাধীন হব তখন আমি সাবিকে আমার বাড়ি নিয়ে নাচ শেখাব। কেউ আটকাতে পারবে না।"

আমার ধারণা বিয়ে হলেই সবাই স্বাধীন হয়। অবশ্য শান্তির মত বিয়ে হলে নয়। কিন্তু কে স্বাধীন? আমার মা কি স্বাধীন? একটুও নয়। আচ্ছা আমার কি রকম বিয়ে হবে?

মির্চা! মির্চা! না, না, কখনো হবে না। বৃত্তডোর ভাঙ্গবেই। আমি শান্তির গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলাম। ও খুব অবাক হয়ে গেছে, "কাঁদছ কেন ভাই, নাচ শিখে কি হবে? নাই বা শিখলে?"

"সে জন্য নয়, আমার মন কেমন করছে। ভীষণ মন কেমন করছে।"

বড় টেবিলল্যাম্পটা জ্বলছে, তার ঘেরাটা সাদা গোল একটা বড় পাত্রের মত। এক পাশে বেতের সোফাটার উপরে আমি হেলান দিয়ে বসেছি। অন্য পাশে খাটের উপর মির্চা বসেছে। ওর পাটা ছড়িয়ে দিয়েছে। এই ভঙ্গীতে ওর পাটাই আমার বার বার মনে পড়ে। আমার ওর পাটা একটু ছুঁতে ইচ্ছে করছে—পা দিয়ে নয় হাত দিয়ে। ইস্ ওর পায়ে আমি হাত দিতে যাব কেন? অত কিছু বড় নয়। আর তাছাড়া ওই তো আমার পায়ে ধরবে—আমি যদি রাধার মত মুখভার করে ঘাড় বাঁকিয়ে বসি তাহলে ও আমার পায়ে ধরবে, 'দেহি পদপল্লব-মুদারম্'—এটা হলে বেশ হত! সত্যি সত্যি রাগ তো আর হচ্ছে না, ঐ কবিতাটার জন্যই ভাবছি। গীতগোবিন্দ পড়ে এই রকম একটা ছবি ভেসে ওঠে। রাধা ঘাড় ফিরিয়ে বসে আছে আর কৃষ্ণ পায়ের কাছে নত। কৃষ্ণের রঙ কালো নয়, সাদা। আমাদের বামুনঠাকুরণ গান করছেন—'মান করে থাকা আর কি সাজে!' এখন জয়দেব পড়ছি। নীল রঙের মলাটে পূর্ণ চক্রবর্তীর আঁকা ছবি দেওয়া ব::াংলা অনুবাদসহ একটা বই উপহার পেয়েছি। বাংলা অনুবাদটা পড়ি না অবশ্য, দরকার কি এমন কবিতা পড়ে? গীতগোবিন্দ অমনিই বোঝা যায়। যদিও সবটা বুঝি না। যেমন 'স্মরগরলখণ্ডনং, — গরল কি? গরল আবার কোথায় প্রেমের মধ্যে?

সত্যি বলতে কি 'মহুয়া'ও সবটা বুঝি না—মহুয়ার 'মায়া' কবিতাটির মধ্যে বাবা বলেন একটা গভীর দার্শনিক তত্ত্ব আছে, আমাকে বুঝিয়েও দিয়েছেন। কিন্তু আমি এখন দার্শনিক তত্ত্বে মন দিতে পারছি না। কবিতা এখন আমি অন্যভাবে বুঝছি। এত ভালো করে কোনদিনও বুঝি নি। প্রতিদিন নূতন করে বুঝছি—কিন্তু মহুয়ার ঐ কবিতাটা, 'এই ক্ষণটুকু হোক সেই চিরকাল' আমি বুঝতে পারছি না। এই ক্ষণটুকু চিরকাল হতে যাবে কি দুঃখে? চিরকালই বা পাব না কেন? বরং ওটা বুঝতে পারি 'আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা গড়িব না ধরণীতে' —সেদিন মির্চাকে শুনিয়েছি। ওর খুব ভালো লেগেছে।—

আমি ওর দিকে দেখছি—ওর মুখ চোখ কেমন যেন অন্যমনস্ক, কি ভাবছে কে জানে—আজ যদি ও আমাকে হুইটম্যান শোনাতে চায় শুনবই না। সেদিন তিনটে কবিতা শুনিয়েছে, কবিতা না চ্যালাকাঠ।

কিন্তু মির্চা আজ সাহিত্যে ভাবছে না। বাংলা পড়বারও ইচ্ছে নেই। সিগারেটটা নিবিয়ে অ্যাশট্রেতে গুজে দিয়ে ও আমার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল। তারপর চশমাটা খুলে চশমা মুছল—আমি ওর চশমাবিহীন চোখ দেখতে পাচ্ছি। চশমা খুললে আমার ভারি ভয় করে, ওর দৃষ্টিটা বদলে যায় — অন্য লোক মনে হয়। "চশমা খুললে আমি সহ্য করতে পারি না কেন মির্চা ?"

"আমার যে মাইওপিয়া।"

ওর চোখের জন্য আমার খুব ভয়, কি জানি অন্ধ হয়ে যাবে নাতো! ও বললে, "একটা কথা বলছি শোনো, তুমি আমায় বিয়ে করবে?"

আমার বেশ হাসি পাচ্ছে—একে প্রপোজ করা বলে—ইংরেজি গল্পের বইতে পড়েছি।

অতদূরে বসে করে না মোটেই—হাঁটু গেড়ে বসে হাত ধরে করতে হয়। যাঃ কিছু হল না। সাত হাত দূরে বসে "তুমি আমায় বিয়ে করবে?" আহা রে!

এ-ঘরের সামনের দরজাটা তো বাড়িতে ঢুকবার পথের উপর খোলা। এখান দিয়ে সর্বদা লোক যাতায়াত করছে। পর্দা নামে একটা পদার্থ ঝুলছে বটে, তবে সেটা ন্যূনতম, সেটা থাকাও যা না থাকাও তাই—কাজেই, নিরুপায়!

পিয়ানোর উপর ওর বোনের একটা ছবি আছে, সুন্দর মেয়ে—আমার ওর সঙ্গে ভাব করতে ইচ্ছে করছে। মির্চা ওর বোনকে সবচেয়ে ভালোবাসে। ও বললে, "আমি আমার মাকে বোনকে তোমার কথা সব লিখেছি—ওঁরা খুব খুশি হবেন। তোমার কোনো অসুবিধা হবে না আমার বাড়িতে।"

এইবারে আমার বুকের ভিতরটা কাঁপছে। একটা কাগজ আর পেনসিল পড়েছিল সেটা নিয়ে আমি হিজিবিজি লিখছি। আমি কি উত্তর দেব?

"বলো, বলো, আমায় বিয়ে করতে তোমার কোনো আপত্তি নেই তো? কথা বলছ না কেন ?"

"আমার কথায় কিছুই হবে না মির্চা, বাবা কখনো রাজি হবেন না?" ও বিষম আশ্চর্য হয়ে গেছে! "ওঁরা রাজি হবেন না? ওরা তো রাজি আছেনই।"

"কি করে জানলে?"

"ওঁরা আমাকে এত ভালোবাসেন, এত আপন করে নিয়েছেন কেন তবে?"

"বাঃ তাতে কি হয়েছে, তাই বলে তোমার সঙ্গে বিয়ে দেবেন এমন কথা নেই।" "অমৃতা, তোমার নিজের কথা বলো, ওঁদের কথা পরে হবে, তোমার বাধা কোথায় আমি শুনতে চাই।"

এই দ্যাখো আবার আমায় অবিশ্বাস করছে– আমি মনে মনে বলছি অবিশ্বাস করো না তুমি, এই মুহূর্তে নয়—ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং'–মুখে বলতে পারছি না, কিছু বলতে পারছি না, না। আমি মাথা নিচু করে কাগজে লিখে যাচ্ছি হিজিবিজি–"শোনো অমৃতা, আমি তোমায় বলছি আমি তোমাকে তোমার প্রিয়জনের কাছ থেকে নিয়ে যাব না, আমি এখানেই থাকব। ইউনিভার্সিটিতে একটা দেড়শ টাকা মাইনের লেকচারার-শিপ নেব–আর কিছুই চাই না–ওতেই বেশ চলে যাবে।"

"মির্চা আমার বাবা কখনো রাজি হবেন না, কখনো নয়।"

কেন আমি ক্রিশ্চান বলে? আমার গায়ের রঙ সাদা বলে?"

"কেন তা জানি না, তবে তুমি বিদেশী বলেই নিশ্চয়।"

"তুমি কি বলতে চাও, প্রফেসর জাত মানেন? দার্শনিকের কাছে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃস্টান আছে?"

"খুব আছে।" আমি কাগজে লিখছি–তুমি আমার এত কাছে এলে কেন, কেন, কেন? কোথা থেকে এলে, কেন এলে?

ও বলছে, "তাই যদি হবে তাহলে ওঁরা তোমাকে আমার সঙ্গে এরকম ছেড়ে দিলেন কেন? সব সময় একসঙ্গে আছি–"

"তাতে কি হয়েছে? ভাইবোনের মত কি মেশা যায় না – ? আমরা যে পারলাম না সে তো আমাদেরই দোষ।"

"সে কি!" ও বিস্মিত, মর্মাহত। যেন এমন কথা জন্মে শোনে নি। আমার রাগ হচ্ছে, ক্যাটালগ করতে দেওয়া মানেই কি বাগদান নাকি? ওঁর সঙ্গে মিশতে দেওয়ায় অন্যায়টা কি হল? ও বার বার আমায় জিজ্ঞাসা করছে আমি অন্য কাউকে ভালোবাসি কিনা এবং কাকে প্রথম ভালোবেসেছিলাম।

"গাছকে, গাছকে একটা ছাতিমগাছকে।" এ আবার কি কথা! যদিও আগেও বলেছি তবু এরকম অদ্ভুত কবিত্ব ও বুঝতে পারে না। ও খুব গম্ভীর হয়ে গেছে। আমার হাতের কাগজটা হিজিবিজি লেখায় ভরে গিয়েছে। মহুয়ার মলাটে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামটা লেখা ছিল—আমাদের তখন অভ্যাস ছিল ওঁর হাতের লেখা নকল করা। সবাই করত, আমিও করছি—ও উঠে দাঁড়িয়ে দেখল।

"তুমি এখানে এঁর নাম লিখছ কেন? এঁর কাছ থেকে মত আনতে হবে, তুমি আমায় ভালোবাসবে কিনা তার জন্য অন্যের অনুমতি চাই?"

"দেশসুদ্ধ লোক ওর হাতের লেখা নকল করে, তার মানে ও নয়।"

"দেশসুদ্ধ লোক একজন লোকের হাতের লেখা নকল করে? দেশসুদ্ধ লোক কি পাগল হয়ে গেছে!"

আমি উঠে পড়েছি, চলে যাই। আমার খুব ওর কাছে যেতে ইচ্ছে করছে ওর কাঁধে মাথা রাখতে ইচ্ছে করছে, তা যদি পারতাম তাহলে এই মুহূর্তে ওর মনে যে দুঃখটা হয়েছে তা চলে যেত। কিন্তু তা সম্ভব নয়। আমি চৌকাঠে পা দিয়েছি ও বললে, "অমৃতা আমার একটা কথা শোনো, একটা কথা, রবিঠাকুরকে ভুলে যাও।"

"সে কি কথা মির্চা, সূর্যকে কি কেউ ভুলতে পারে?"

"সূর্য! মানুষ কি করে সূর্য হবে?"

"তুমি যখন বাংলা ভাষাটা শিখবে তখন তুমিও বুঝবে মানুষ সূর্য হয় কিনা।" আমি মনে মনে বলছি, তোমাকে আমি সূর্য দেখাবই—যদি তা পারি

তবে আমরা দুজনে এক সঙ্গেই সূর্যোপাসক হব।

এখন দুটো কাজ নিয়ে আমরা খুব ব্যস্ত, কাকার বিয়ে হবে আর আমার বই ছাপা হবে। কাকা নিজেও খুব বিয়ের জন্য উদগ্রীব, মেয়ে দেখেই তার পছন্দ হয়েছে—যদিও মার হয়নি। তবু যাইহোক বিয়ে ওখানেই হচ্ছে। এই সময় থেকে মির্চা নিয়মিত ধুতি পাঞ্জাবী পরতে শুরু করেছে। ধুতী পাঞ্জাবী পরলে ওকে যে কি সুন্দর দেখায়। সে কথা অবশ্য আমি ওকে বলি নি। কেন বলব? সে যে বলে আমি সুন্দর কিনা তা বোঝে না। এটা একদম বাজে কথা নিশ্চয়ই, কারণ আমার হাতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এই যেমন মির্চা আসবার কিছুদিন আগে আমার মাসতুতো দিদি সীতার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল এক জমিদার-নন্দনের সঙ্গে। আমাদের বাড়ি থেকে মেয়ে দেখান হল। ছেলের আত্মীয়স্বজন এসে মেয়ের চুল খুলে, রঙ পরীক্ষা করে দেখল, গানও শোনাতে হল। যদিও তার হারমনিয়াম পিটিয়ে গান শুনে তাদের পালানই উচিত ছিল, তা পালায় নি—তাদের পছন্দ হল। তারা বললে, সব যখন ঠিকই হয়ে গেছে এবার ছেলে৻ঃ এসে মেয়ে দেখুক। ছেলে আধুনিক, মেয়ের সঙ্গে আলাপ করতে চায়। মেয়ের মাও আধুনিক। তিনি বললেন, ছেলে আসুক, সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হোক। আমাদের কি রকম কালচার্ড পরিবার তার পরিচয় পাক। ছেলে এল, তার নাম মৃগাঙ্ক। খুব ফর্সা, জমিদারপুত্রের উপযুক্ত নধর চিক্কণ চেহারা। সাধারণভাবে সুন্দর বলা চলে। মার ইচ্ছা ছিল না আমি তার সামনে বের হই—কিন্তু কনের মা বললেন তাতে কি হয়েছে, বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে এখন শালী সম্পর্কিত মেয়েরা না বেরুলে জমবে কেন?

মা তো আর বলতে পারেন না তোমার মেয়ের চেয়ে আমার মেয়ে দেখতে ভালো, যদিই গোলমাল হয়ে যায়। কাজেই মৃগাঙ্ক এল! দু'দিন খাওয়াদাওয়া সিনেমা দেখা হল। খুব হৈচৈ করলাম আমরা। আমি তো ধরেই নিয়েছি দিদির সঙ্গে তার বিবাহ হবে, তাই শ্যালীকাজনোচিত ব্যবহার করেছি, হেসেছি ও হাসিয়েছি। তারপর মৃগাঙ্ক উধাও হয়ে গেল। তার হোস্টেলে খোঁজ নিয়ে জানা গেল দেশে চলে গেছে। দেশ থেকে তার বাবা জানালেন মৃগাঙ্ক বিলেত যাচ্ছে

ব্যারিস্টারী পড়তে, এখন কিছুতেই বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না। অনেক জল্পনা-কল্পনা চলেছিল যে হঠাৎ এ-রকম মত পরিবর্তনের কারণ কি হতে পারে। যাহোক মাসীমা বলেছিলেন, এরকম চঞ্চলমতি ছেলের সঙ্গে বিয়ে না হয়ে ভালোই হয়েছে। আর এখন শুনছি, কয়েকদিন আগে বাবার কাছে বিলেত থেকে সে প্রস্তাব পাঠিয়েছে আমায় বিয়ে করতে চায়। বাবা মা সকলেই অসন্তুষ্ট, তখনই দিদিকে বলেছিলাম—রু'কে বের করব না। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এরকম কখনো ভালো! বাবা বললেন, বেশী ফরওয়ার্ড হতে গেলে এমনি দশা হয়। আর দিদিমা বললেন, একজনকে দেখতে এসে আর একজনের দিকে অন্য দৃষ্টিতে যে দেখে সে চরিত্রহীন। তার সঙ্গে বিয়ে হতেই পারে না। চুকে গেল।

কিন্তু এই গল্পটা আজ যদি ওকে বলি তাহলে কি হয়?

হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ তাহলে কি হয়? ভীষণ মজা হয়। আমি খুব গম্ভীরভাবে ওকে বলতে পারি, "দ্যাখো তুমি তো দেখতে পাওনা আমি সুন্দর কিনা।" তখুনি ও কাতরভাবে তাকাবে, আমি লক্ষ্য করেছি কিছুদিন থেকে কথাটা ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করছে- তা আমি হতেই দেব না, বলেছে একবার যখন হয়ে গেছে ব্যাস! তারপর আমি বলব "দেখ মৃগাঙ্ক দেখতে পায়!" গল্পটা শুনলে ওর কি হবে তা আমি জানি।

"কৈ তুমি কোন দিনও এর কথা আমায় বলনি?"

"ওমা, বলবার আবার কি আছে!"

"কি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলে?"

খুব উদাসভাবে বলব—"কি জানি অত মনে নেই।"

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ খুব মজা লাগছে। ওর ঈর্ষাটা আমার এতো ভালো লাগে। ঈর্ষা আবার ভালো নাকি! খুব খারাপ। 'ঈর্ষার কারণে তার বর্ণ হলো কালো' কিংবা 'ঈর্ষা বিষময়ী ভুজঙ্গিনী।' আরে দুর্ এ সে রকম ঈর্ষা নয়। এটা প্রেম এটা ভালোবাসা। ঈর্ষার ছোট্ট পাখীটাই তো আমার ঘুম ভাঙ্গিয়েছে। সেই পাখীটা এক ডাল থেকে আর এক ডালে, একদিন থেকে অন্যদিনে ফুরুৎ

ফুরুৎ করে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে আর আমায় ডাকছে, 'সখী জাগো, সখী জাগো—মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী।'...

আচ্ছা আমার ঈর্ষা হয় না কেন? ওতো কত কিছু বলে—সেই যে রিপণ স্ট্রীটে ও থাকত, সেখানকার মেয়েরা ওকে কি রকম পছন্দ করে—ওর পিছনে লেগেই ছিল, ওকে একদিন বালিশ ছুঁড়ে মেরেছিল—কত কি, ও সব আমার এক কান দিয়ে ঢোকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। শুনতেই ইচ্ছা হয় না—অবশ্য ঈর্ষা হবে কি করে, ওতো ওদের ঘৃণা করে, সেই জন্যই তো পালিয়ে এসেছে, কাজেই আমার এমন কিছু মহত্ব নেই! ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের কথা যা বলে শুনে তো অবাক হয়ে যাই। ওদের সকলেরই ধারণা তারা ইংরেজ, আমাদের প্রভু এবং বাঙালীরা অত্যন্ত নিম্নস্তরের জীব। পশু বললেই হয়। গ্যাণ্ডির উপর ওদের ঘৃণা এবং রাগ খুবই। ওরা নিজেরা অত্যন্ত অশ্লীল এবং অসভ্য, কিন্তু ওরা বাঙালীদের অসভ্য মনে করে। মির্চার ওখানে থাকতে রীতিমত কষ্ট হয়েছিল। সণ্ত বম্ হয়েছিল 'বিবমিষা'।

কি আশ্চর্য আমরা তো এই জাতটাকে চিনিই না। ওরা কোথায় থাকে কি করে, কেমন ওদের রীতিনীতি কিছুই জানি না। এক দেশে থাকি আমরা অথচ কেউ কাউকে জানি না। ওরা আমাদের সঙ্গে এক দেশে বাস করছে এবং চিরকাল আমরা একসঙ্গে থাকব তবু কেউ কাউকে চিনতেই পারব না। ওরা আমাদের সম্বন্ধে কত কুৎসিত কথা ভেবে রেখেছে, আর আমরা? আমি তো ওদের অস্তিত্বই খেয়াল করি নি। ওরা যে আছে, আমাদের সম্বন্ধে কিছু ভাবছে, এই বা কে লক্ষ্য করেছে? মির্চা না বললে কোনো দিনও আমার মনে পড়ত না যে অ্যাংলোইণ্ডিয়ান বলে একটা জাত আছে। ওদের সঙ্গে দেখা হয় ট্রেনে যাতায়াত করবার সময়, আর দূর থেকে রেলওয়ে কোয়ার্টারে ওদের দেখি। আমার কিন্তু ওদের খারাপ লাগে না—ওদের জানালায় পর্দা কেমন টান টান করে টাঙ্গায়—বাঙ্গালীরা পর্দা টান করে টাঙ্গাতে পারে না। ওরা জানালায় টবে ফুল

রাখে, বাগান করে—বাঙ্গালীরা করতে পারে না তবে ওরা আমাদের ঘৃণা করে খুবই ঘৃণ:;া করে, মির্চা বললেও জানি ওরা আমাদের সঙ্গে ট্রেনে এক কামরাতেও চড়বে না। আর আমরা কি ওদের ঘৃণা করি না? খুব করি! বর্ণসঙ্কর কথাটা কি ভালো? ওরা আমাদের জানে না, তাই যদি জানত তাহলে ঘৃণা করত না। আমি যদি ঐ মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারতাম, তাহলে কখনো আমাকে ঘৃণা করত না। আজ পর্যন্ত আমায় কেউ ঘৃণা করে নি। ঐ যে ছেলেটা মাঝে মাঝে মির্চার কাছে আসে, একবার ওর সঙ্গে ভাব করে দেখি কেমন ঘৃণা করে। ইস্—ঘৃণা করলেই হল। আমি যদি বলি, মির্চা ওর সঙ্গে একটু আলাপ করিয়ে দাও তো, ও আমায় ঘৃণা করে কি না পরীক্ষা করে দেখব। তাহলে কি হয়? হাঃ হাঃ হাঃ পাখী ডাকবে আবার—'মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী।'...

মির্চা আজকাল রোজই বিকেলে ধুতি পাঞ্জাবী পরে—আর শুনছি ও আর্য হবে, হিন্দু হবে। ও তো হিন্দু শাস্ত্র পড়েছে, তাই বলেই ধর্ম ত্যাগ করবার দরকার কি? আমি জানি না ও কেন হিন্দু হতে চায়, এ বিষয়ে প্রধান উৎসাহী কাকা। এমন কি হতে পারে যে ও হিন্দু হলে আর কোন বাধা থাকবে না তাই ভাবছে? ভুল ভুল। ও আমাদের সমাজটাকে একেবারেই চেনে না। এখানে কোনো কাজের যুক্তি নেই—বাবা কি জানেন না যে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে মির্চা নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাতে কি? ও যে অন্য জাত—জাত কি এক রকম? একে ও অন্য দেশের মানুষ, তারপর খ্রীস্টান, তা যদি নাও হত—ও যদি হিন্দু বাঙালীও হত, তাহলেও আমাদের জাত হওয়া চাই। তাতেই হবে না গোত্র পৃথক হওয়া চাই। হায় কত যে 'ছোট বড় নিষেধের' গ্রন্থি তা ও জানে না। জানে, সবই জানে, শুনছে তো অনবরত — আমাদের প্রথা সংস্কার সম্বন্ধে ওর জিজ্ঞাসার অন্ত নেই, কিন্তু ও জানে না এগুলো আমাদের বাড়িতেও কতট:া মানা হয়। আর বাবা যিনি এত জানেন, যাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের শেষ নেই তবুও তিনি জানেন না গোত্র বা জাত যাই হোক মানুষের সুখদুঃখ তার উপর নির্ভর করে না। আর আমি? আমি মানি না, এ-সব মানি না, মির্চার সঙ্গে আমার যদি বিয়ে নাও হয়—সারা জীবন দিয়ে প্রমাণ করব আমি মানি না। কোনো আচার বা প্রথা মানুষের চেয়ে কখনো বড় হবে না আমার কাছে। জাতের কথা দূরে থাক, আমি হিন্দু সমাজের কিছুই মানি না। পূজাই মানি না। দেশের বাড়িতে কি হয়েছিল পূজার সময়?

দু-বছর আগে আমি দেশে গিয়েছিলাম, দেশ অর্থাৎ আমাদের পূর্ববঙ্গের গ্রামের বাড়ি। সে-বাড়িতে সত্তর জন লোক একসঙ্গে বাস করেন। এরা সব জ্যাঠতুতো, খুড়তুতো ভাই ও তাঁদের ছেলেমেয়ে। এ-ছাড়া থাকে পনের কুড়ি জন ছাত্র, তারা এই কবিরাজ বাড়িতে টোলে পড়ে। একসঙ্গে সকলের রান্না হয়। এই বাড়ির কর্তা যিনি, তিনি সকলের বড় ভাই। তাঁরই সবচেয়ে রোজগার বেশি। অন্যেরা তাঁর অন্নেই মোটামুটি প্রতিপালিত। তিনি দোর্দণ্ডপ্রতাপ, তাঁর দুটি

স্ত্রী। বড়র ছেলে হয় নি, তাই তিনি আবার বিয়ে করেছেন। এই কাজটির জন্য মা, কাকা এঁরা তাঁর প্রতি বিমুখ। কিন্তু বাড়িতে অনেকেই আছে যারা বিমুখ নয় বা হলেও বলবার সাহস নেই, কারণ তিনিই প্রতিপালক।

পূজার সময় আমরা দু'চার দিনের জন্য বেড়াতে গিয়েছি—আমরা কলকাতায় থাকি, আমার বাবা খ্যাতিমান, বিত্তবান্ তাই আমাদের খুব আদর। পূর্ববঙ্গের এই রকম বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ পরিবারে পূজার আয়োজন বিরাট—কতদিন থেকে প্রতিমা তৈরি হচ্ছে চণ্ডীমণ্ডপে—–নাড়ু বানানো হচ্ছে, খৈ ভাজা হচ্ছে, তিল কোটা হচ্ছে। গ্রামের জীবন বেশি দেখি নি, তাই আমি খুব উৎসাহিত এবং আমাদের সম্পর্কিত ভাই-বোনেরাও গর্বিত ও আনন্দিত, সিল্কের শাড়ি আর মখমলের চটিপরা একটি শহুরে ভগ্নী পেয়ে। যদিও দ্বিতীয় দিনই মখমলের চটি খুলে ফেলে আমি ওদের দলে ভিড়ে গিয়েছি। আমাদের বিরাট দল হয়েছে—আমরা ঘুরে ঘুরে বেড়াই। নৌকার দু'ধারে বাঁশবন, কোথাও বা বড় বড় বট অশ্বত্থের নিচু ডালগুলো লম্বা লম্বা জটার আঙ্গুল দিয়ে জল ছুয়ে থাকে—আমি যদিও এই প্রথম বাড়িতে পূজা দেখছি এবং পূজা সম্বন্ধে কিছুই জানি না, তবু পূজার আয়োজন আমার খুব ভালো লাগছে। দিনগুলিকে যেন অলঙ্কার পরান হচ্ছে। কত রকম খুঁটিনাটি উৎসবের আয়োজন—"আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে" সত্যি বলতে কি পূর্ববঙ্গের ঐ গ্রামের পূজামণ্ডপের সামনে আমি কোনো কাঙালিনী মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি নি। সকলেই খুশীতে ভরপুর।

প্রথম দিন যে-ঘটনার তাল কাটল সেটা এই–টোলের বারান্দায় অনেকে বসেছিলেন। আমি একে একে সকলকে প্রণাম করছি, একজন শ্বেতশ্মশ্রু সৌম্যদর্শন বৃদ্ধকে দেখে আমি তাঁকে প্রণাম করতে যেতে তিনি প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, এবং বাধা দিলেন তো বটেই, অন্যেরাও বললেন, "ওঁকে প্রণাম করতে হবে না, উনি মুসলমান।" আমি তো স্তম্ভিত, এত অভদ্রতা কেউ করতে পারে! জ্যাঠামশায় যেন আমার অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী, "ছেলেমানুষ কিনা, কিছু জানে না।" আমার সবচেয়ে দুঃখ হল যে বাবাও কিছু বললেন

না। পরে একলা পেয়ে যখন বললাম—একি অভদ্রতা—বাবা বললেন, "তুই ঠিকই করেছিলি, বয়োজ্যেষ্ঠকে প্রণাম করবি, জাত দিয়ে কি হবে?"

"তবে তুমি চুপ করে রইলে কেন?"

"বড়দাদা রয়েছেন—উনি বলছেন, তাই কি বলা যায়।"

এখন মির্চার কথা যত ভাবছি এসব মনে পড়ছে। বাবা যদি বুঝতেও পারেন কোন্ কাজটা ঠিক, বাবা পারবেন না করতে, এইসব আত্মীয়স্বজন যাদের সঙ্গে আমাদের কোন মনের যোগ নেই, যারা আমাদের অর্ধেক কথা বুঝতেই পারে না, তারাও প্রবল বাধা হয়ে উঠবে। মেজ জ্যাঠামশায় দেশ থেকে চলে আসবেন—"ও নরেন, এ মহাপাতক করিস 'না, চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ করিস না, করিস না।"

প্রতিমার পিছনে চালচিত্র আঁকে নসু, একদিন দেখি, সে একটা মাঝারি গোছের মহিষ এনে গাছতলায় বাঁধছে।

"এটা কি হবে?" আমি যদিও বুঝতে পেরেছি, ভালোমতই বুঝতে পেরেছি কি হবে। তবু জিজ্ঞাসা করছি, আমার কষ্ট হচ্ছে, বুকের ভিতরটা মোচড় দিচ্ছে। "অষ্টমীর দিন মার কাছে বলি হবে, আটটা পাঁঠা আর একটা মহিষ।"

"কে বলি দেবে?"

"আমি। আমি ছাড়া আর কে এক কোপে কাটতে পারবে?"

"নসু, তোমার লজ্জা করছে না একটা অসহায় জীবকে এক কোপে কাটবে, তার বড়াই করছ—এটা কখনো ধর্ম হতে পারে?"

"ওমা কও কি খুকি? মার পূজায় বলি হইব না?"

তারপর ভাইবোনেরা সব জড়ো হল, আমি ওজস্বিনী বক্তৃতা দিতে লাগলাম। আমাদের বয়সীরা অনেকেই আমার মতানুবর্তী হল। আমরা সদলবলে মেজ জ্যাঠামশাইয়ের কাছে গেলাম। তিনি সাদাসিদে ভালো লোক এবং স্নেহপ্রবণ, আর যদি কোনো কারণ থাকে, তবু আমার প্রতি স্নেহবশতও তিনি রাজি হতে

পারেন। তাঁকে আমার খুব ভালো লাগে একটা বিশেষ কারণে— ছাত্ররা যখন খেতে বসে তিনি হুঁকো হাতে করে তদারক করেন, তারা যাতে ভালো মাছটি পায়। ওরা পরের ছেলে, ওদের যত্ন করতে হবে— বৌরা হয়ত নিজেদের ছেলের জন্য ভালোটা রেখে দেবে এই তাঁর ভয়। এরকম আর কোনো কর্তা ব্যক্তি করবে না এ-বাড়িতে।

মেজ জ্যাঠামশায় ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় যেতে রাজি নন। তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন যে তিনি তো বাড়ির কর্তা নন। বাড়ির কর্তা যিনি বড়, তাঁর দ্বারস্থ হও। তিনি যা বলবেন তাই হবে। তাঁর ঘরের কাছে পোঁছে পিছন ফিরে দেখি ভাইবোনের দলটি অন্তর্হিত। তখন সেই ভয়ানক রণশিবিরে আমি একলাই প্রবেশ করলাম। দোর্দণ্ডপ্রতাপ কর্তা একটি রোগা ছোট্ট মানুষ। হুঁকো হাতে উবু হয়ে খাটের উপর বসেছিলেন। বয়স ষাটের কাছে, আর তাঁর তরুণী ভার্যা একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দুগ্ধ পান করাচ্ছিলেন। আমি যথেষ্ট গুছিয়ে আমার বক্তব্য পেশ করলাম। প্রধান প্রার্থনা হচ্ছে ঐ মহিষ এবং ছাগলগুলোকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। যদি প্রবৃত্তিকে বলি দেওয়াই প্রয়োজন হয় তবে বৈষ্ণবদের মতো লাউ বা কুমড়ো বলি দেওয়া যেতে পারে। তিনি হুঁকো টানতেই লাগলেন। তারপর মুখটি তুলে সংক্ষেপে বললেন, “আমরা শাক্ত।”

আমি খুব তর্ক করতে পারতাম। সমস্ত যুক্তি প্রয়োগ করলাম, শেষ পর্যন্ত নিরীশ্বরদের বিতর্ক ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাও বললাম, যারা যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণদের বলেছিল, যজ্ঞে বলি দিলে পশুটা যদি স্বর্গে যায় তবে তোর বুড়ো বাপকে এনে বলি দে না, স্বর্গে যাবার এই তো সোজা উপায়।

কিন্তু বৃদ্ধ অনড়। কিছুতে রাজি হলেন না। পরে শুনেছি তিনি বলেছেন, ‘নরেনের এই মাইয়াডা কুতার্কিক।'

তখন আমি আমার অনুগত ভ্রাতাভগ্নীদের বললাম, — এই পূজায় আমরা যোগ দেব না। সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী এই চার দিন আমরা বাড়িতেই থাকব না। আমরা সকালবেলা চিঁড়ে মুড়ি নাড়ু মুড়কী কলা ইত্যাদি নিয়ে নৌকায়

নৌকায় বেড়াতাম খালে বিলে, সন্ধ্যায় ফিরে এক দৌড়ে বিছানায়। বড়দের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ। বেশ পিক্‌নিক্‌ হচ্ছিল, আমাদের কিছু খারাপ লাগে নি। কিন্তু বাড়িতে জেঠিমাদের মন ভেঙ্গে গেছে। পূজার সময় ছেলেমেয়েগুলো বাড়ি রইল না। পূজা দেখল না। শেষটায় তাঁদের অনুরোধে পড়ে আমরা বাড়ি ফিরলাম বিসর্জনে যোগ দিতে। আমি মনে মনে বলেছিলাম সত্যিই যদি প্রতিমায় কোনো শক্তি এসে থাকে তাহলে এ বেচারা মহিষটাকে বলি দেবার সময় একটা কিছু যেন হয়, কোনো নিষেধের নিদর্শন। কিছুই হল না, বেচার মহিষের রক্তে হাড়িকাঠ ভাসতে লাগল ।

এই ব্যাপারে বাবা আমাকে স্বাধীনতা দিলেন, বকলেন না। আমি যে নিজে নিজে একটা কিছু করতে পারছি, মনের জোর দেখাচ্ছি, তাতে উনি খুশি। সরোজিনী নাইডু হবার প্রথম পদক্ষেপ হয়ত!

কিন্তু মির্চার ব্যাপারে এ-সমর্থন পাব? না, না, কখনো নয়। আর আমিই কি এত জোর দেখাতে পারব? তাও নয়। অন্যের জন্য কিছু করা আলাদা কথা, সে মহিষই হোক বা মানুষই হোক কিন্তু নিজের এ কথাটা আমি বলতে পারব না। লজ্জা সংকোচ অপরাধবোধ আমার মুখ চেপে ধরবে।

এ-বিষয়ে কিছু বলা যায় না। আমি বন্দী, আমি বন্দী, আমি বন্দী। কে আমাকে শক্তি দেবে? আমি মনে মনে বললাম – তুমি হিন্দু হয়ো না, দ্যাখো হিন্দু হয়ে আমার কি লাভ হয়েছে? হিন্দুত্ব তোমায় কোনো শক্তি দেবে না—বন্দীই করবে।

"অয়ি প্রথম প্রণয়ভীতে, মন নন্দনঅটবীতে
পিক মুহু মুহু উঠে ডাকি..."

কি আশ্চর্য এই গানটা! ভয়ই তো, সত্যিই ভয়! আমি ওর ঘরে দাঁড়িয়ে আছি—গানটা গুন গুন করছে মনে, একটা কিছুর প্রত্যাশায় আমি বেপথুমতী —ও আমার পিছনে খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর একটা হাত আমার কটি বেষ্টন করে আছে, আর একটা হাত গলার উপর থেকে অসম্পূর্ণ হারের মত ঝুলছে। ওর মুখ আমার কানের কাছে, গালের উপরে ও আমার কানে ফিস্ ফিস্ করে কি বলছে, বোধহয় ওদের ভাষায়, আমি তার অর্থ বুঝতে পারছি না।

"মির্চা, আমার ভয় করছে—বড় ভয় করছে।"

"কিসের ভয়, তোমার কিসের ভয়?"

আমি কাঁপছি—আমি জানি এখন কি হবে— হাঙ্গার বইটাতে যা আছে তাই হবে। ও আমাকে চেয়ারটাতে বসিয়ে দিয়েছে—আমার শরীর নিস্পন্দ্য—এখন দুপুরবেলা সারাবাড়ি আলস্যজড়িত হয়ে পড়ে আছে—আমি নীচে এসেছিলাম চিঠির বাক্সে চিঠি খুঁজতে। আমি মনে মনে ভাবছি উঠে চলে যাই কিন্তু ওর গলা বেষ্টন করে আছি, হাতটা সরিয়ে নেবার শক্তি নেই—আর আমার অনাবৃত বুকের উপর ও তার মুখ রাখছে। আমার শরীর শিথিল, আমার কিছু করবার ক্ষমতা নেই, ওর চুলের সুগন্ধে আমার নিঃশ্বাস ভরে গেছে। ও কি যেন বলছে অর্ধস্ফুটভাবে, বোধহয় 'গডেস্ গডেস্'—আমি বলছি 'আমাদের পাপ হচ্ছে মির্চা, পাপ হচ্ছে'—–কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র, একটা শব্দ, কে দরজা খুলল, ও আমার ছেড়ে দিয়ে সরে গেছে। আমি সোজা হয়ে বসেছি—আমার বিস্রস্ত আঁচল ঠিক করে নিয়েছি, তিন-চার মিনিট সময়ও হবে না, এর মধ্যে যেন পৃথিবীটা আমার কাছে বদলে গেছে। আমার জীবনে যে এমন একটা ঘটনা ঘটতে পারে তা ভাবতেই পারি না। আমি মুখে বলছি পাপ হবে, কিন্তু পাপবোধ তো নেই—কোনো অনুশোচনাই নেই—ও আমার চুলগুলো কানের উপর দিয়ে উঠিয়ে দিল

"আমি বলছি তোমায়, অমৃতা, কোনো পাপ নেই—এ তো ভালোবাসা পাপ কেন হবে? ভালোবাসা দিয়েছে কে আমাদের? ঈশ্বর—ভালোবাসাই ঈশ্বর।"

ঝড়ু উঠানে নেমে এসেছে, রান্নাঘরে ঢুকছে। কিছু দেখতে পায় নি, আমরা এখন অন্তত এক হাত দূরে আছি। আমি নির্বিকার, ওকে ডেকে বললাম— "ঝড়ু চা কর-" আচ্ছা এই যে আমি মিথ্যা আচরণ করলাম, এটা অন্যায়? — যদি দণ্ড সহিতে হয় তবু মিথ্যা বাক্য নয়—' এ তো মিথ্যা আচরণ, নয় কি? কিন্তু এ-কথা মির্চাকে বলে তো লাভই নেই। ভালোই তো যে ও পাপ মনে করে না। ও যদি পাপ মনে করে দূরে চলে যেত, লাভটা কি হত আমার? তাহলে তো ওকে আর পেতামই না। আমি ওকে চাই।

ওর দিকে তাকিয়ে দেখছি ও ঠোঁট চেপে আছে—ওর হাত একটু কাঁপছে। ওকে অধীর মনে হচ্ছে। ও ধৈর্য হারিয়েছে কেন? আমি পাপের কথা বলেছি বলে ও রাগ করল নাকি? আমার ইচ্ছে হচ্ছে ওর কাছে গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু সে তো অসম্ভব, ঝড়ু উঠে পড়েছে না? আমার অন্য মন যেন ভ্রূকুটি করছে, সে বলছে—না, না, না, এখানে আর এক মুহূর্তও থেকো না— পালাও, পালাও, পালাও। এখনই ওর কাছ থেকে চলে যাও। আমি উঠে পড়লাম—ওর দিকে আর তাকালামই না। অস্থির পায়ে দ্রুত উপরে চলে গেলাম।

সেদিন রাত্রে আর ঘুমই আসে না। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওর স্পর্শটা আমার গায়ে লেগে রইল। এরকম একটা অভিজ্ঞতা চেপে রেখে সুস্থ থাকা মুশকিল। আমি কিছু গোপন করতে অভ্যস্ত নই। তাই কি ভিতরটা এত অধীর? না অন্য কোন প্রত্যাশা আছে। কি প্রত্যাশা থাকতে পারে? আমার নিজের চোখ নিজের দিকে তাকিয়ে আছে। যেখানে এক অজ্ঞাত গুহার অন্ধকার সেই দিকে ফেরান সে চোখ বিরক্ত ও অনুসন্ধিৎসু।

আমি আজ মাটিতে মাদুরে শুয়ে আছি—ঠাণ্ডা পাথরের মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে ভাবছি—আচ্ছা, এ-অভিজ্ঞতাটা আমি কবিতায় লিখতে পারি ? ওরে বাবা, কি হয় তাহলে ?

মা-বাবার চেয়েও আর একজনকে বেশি ভয়—সজনীকান্ত দাস—সেই ব্যক্তিকে আমি দেখি নি। কিন্তু তাঁর শনিবারের চিঠি! ওরে বাবা! ছেলেদের কলেজে কবিতা পড়ি বলেই আমাকে ‘বকুল বনের পাখী’ বলে ইঙ্গিত করে কত কি সব লিখেছে— এই ঘটনার আভাস পেলে আমাকে শায়েস্তা করে দেবে! নিশ্চয়ই অনেক লোকই এসব বিষয় লিখেছে—এমন তো হতে পারে না শুধু আমারই মন এত বিস্ময়ে ভরে গেছে। তবে আমার আর লেখার দরকার কি। ‘কড়ি ও কোমলে’ একটা কবিতা আছে,ওটা ভালো নয়, আমি ওটা পড়ি না, চাপা দিয়ে রাখি। এমন একটা কবিতা যে কেন মহাকবি লিখতে গেলেন? আমার সেই দু'তিন মিনিট সময়টা ভাবতে ভালো লাগছে—আবার ভয়ও করছে। আমি আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছি, আমি জানি না— এই অনুভূতির উৎস কোথায় শরীরে না মনে—আর একজন আমার প্রিয় কবির কবিতা মনে পড়ছে— “words are but loads of chain in my flight of fire. I pant, I sink, I expire!” আমি ভাবছি ‘flight of fire flight of fire' আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে এই কথাটা—আমি ডুবে যাচ্ছি, ডুবে যাচ্ছি, আমার মাদুরটা পালকের বিছানা হয়ে গেছে।

কাকার বিয়ের জিনিসপত্র কিনে ঢুকছি ওর ঘরের দরজার সামনে, আমায় দেখে ও আমার হাত থেকে জিনিসগুলো নিয়ে নিল। আমার ভার লাঘব হল। এইগুলো ওদের দেশের নিয়ম। এ নিয়ম ভালো। আর কাকাকে দেখ না, আমার ঘাড়ে সব জিনিস চাপিয়ে তরতর করে চলে গেল সিঁড়ি বেয়ে। আর খোকা? আমি যদি ইটও বয়ে নিয়ে যাই, এগিয়ে আসবে না সাহায্য করতে। মেয়েরা ঘরে ঢুকলে ও উঠে দাঁড়ায়, না বসা পর্যন্ত বসে না, পর্দা তুলে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে- এ সব ইয়োরোপেরু আদবকায়দা—আমাদের বাড়ির মেয়েরা এসব খুব পছন্দ করে—এমন কি যে মাসী আমায় বকেছিলেন সাহেব ছোঁড়াটার সঙ্গে হি-হি করছি বলে—তিনিও সেদিন মাকে বলছেন, “মেজদি এই সাহেব ছেলেটি কিন্তু খুব ভালো। কি সুন্দর ডাল-ভাত হাত দিয়ে চেটেপুটে খেয়ে গেল। কে বলবে সাহেব! ঠিক যেন আমাদের ঘরের ছেলে।” আমার খুব হাসি পাচ্ছে-- আমার সঙ্গে হাসছিল বলে ‘ছোঁড়াটা’ ছিল আর হাত দিয়ে ভাত খেল বলেই ‘ছেলেটি’ হযে়ে গেল। আমার মা বলেন, “অমন ছেলে হয়! যেমন পড়াশুনোয় ভালো, তেমনি ভদ্র। ‘মা’ বলে যখন ডাকে এত মিষ্টি লাগে।”

শান্তি বলল, “আর ধুতি পাঞ্জাবী পরলে গৌরাঙ্গ মনে হয়।”

কাকার বিয়েতে ও দেশ থেকে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস এনে দিয়েছে কাকীমার জন্য, নানা রকম খেলনা, কাঠের উপর পোকারের কাজ করা আর জর্জেটের উপর এমব্রয়ডারি করা ড্রেসিং টেবিল সেট, রুমাল, কত কি—জিনিসগুলো কি সুন্দর। আমার মন বেশ খারাপ হয়ে গেছে, ওদের বিয়ে হচ্ছে, দেবেই তো। তা আমাকেও কিছু দিতে পারত। একটা রুমালও দিল না। আমাকে ও কিছু দেয় না। না, না, বই দেয়। আমাকে দু'ভল্যুম গ্যেটের জীবনী দিয়েছে। যেদিন ভূমিকম্প হল তার পরের দিন। মির্চার এখানে আসার স্থান-কাল ও অস্তিত্বের একমাত্র নিদর্শন—এই অসীম কালসমুদ্রে একটি ক্ষুদ্র দিক্‌দর্শন ঐ বই দুখানি আমার কাছে এখনও অর্থাৎ ১৯৭২ সালেও আছে।

ভূমিকম্পের রাতটা ভারি সুন্দর। গভীর রাতে ভূমিকম্প হল, আমরা সবাই নিচে নেমে এলাম। কিছুক্ষণ বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিতরের উঠোনে সিঁড়ির উপরে বসলাম। মির্চা কফি বানাল। কি আশ্চর্য সুন্দর সেই তারা ভরা রাত। অত রাতে আমি আর কোনোদিন ওকে দেখি নি, আগেও না পরেও না। তাই সেই রাতটা দীর্ঘদিন পর্যন্ত একটা মৃদু সুগন্ধের মত মন ছেয়ে ছিল। রাতের একটা নিজস্ব রূপ আছে—আর মানুষের চোখেও তা একটা বিশেষ দৃষ্টি দেয় নিশ্চয়। এত রাতে আমি যে ওকে দেখলাম সেই সুখটা ও স্থায়ী করে দিল, পরের দিন ঐ বইখানা দিয়ে। তাতে আমার নাম লিখে ও লিখল, as a token of friendship after the earthquake of 28th July 1930– ও বললে ওদের দেশের নিয়ম ভূমিকম্পের পরে বন্ধুকে কিছু উপহার দিতে হয়। মির্চা আমার কাছে গ্যেটের জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিল—বইটা থেকেও শুনিয়েছিল সেই যে কবি যিনি আলো চেয়েছিলেন —‘আলো আরো আলো।’ আমি বুঝতে পেরেছিলাম এ সত্যিকারের আলোর কথা নয় অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুআচ্ছন্ন চোখে সূর্যের আলোর প্রত্যাশা এ নয়। এ হচ্ছে প্রতীক দিয়ে বলা, যেমন জ্ঞানের আলো, বুদ্ধির আলো।

আমাদের কবিও লিখেছেন—‘কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো, বিরহানলে জ্বালোরে তারে জ্বালো’—বিরহানলে! বিরহানলে আলো জ্বালিয়ে লাভটা কি, মিলনে কি আলো জ্বলে না? সব কাব্যে, সব দেশের কাব্যে খালি বিরহের জয়গান! কেন? বিরহ কি? যদি মির্চা চলে যায়, তাহলে আমার যে কষ্টটা হবে সেটা বিরহ। কি ভয়ানক। ও যখন নিচে আছে, আমি উপরে—তখনই আমার কষ্ট হয়—আর একেবারে চলে গেলে? তাই নিয়ে আবার আলো জ্বালানো? সে গাঢ় অন্ধকার আমি কল্পনাও করতে পারি না। ঐ কষ্ট পেয়েই তো মেঘদূতের যক্ষ বেচারা বিরহের আলো নিবিয়ে দিয়ে মিলনের স্বর্গের কথা ভেবেছিল। স্বর্গ? সেই তো স্বর্গ যেখানে আনন্দে ছাড়া চোখের জল পড়ে না। যেখানে প্রণয়কলহ

ছাড়া বিরহ হয় না। যৌবন ছাড়া বয়স নেই। মেঘদূত মনে পড়ে আমার মনটা প্রসন্ন হয়ে গেছে—আমি আবৃত্তি করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে উঠছি—

আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈ
নানস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্ট স৺ংযোগসাধ্যাৎ
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্বিপ্রয়োগোপপত্তি
বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি!

বাবা বসবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন—"মেঘদূত বলছিস্ ভালো করে উচ্চারণ কর

আমার সঙ্গে—বল ইয়ৎৰনান্যৈর্নিমিত্তৈঃ—'ই্য়' 'ই্য়' 'জ' নয়, শূদ্রের জিহ্বা কেন?"

"তুমি শুনতে পেলে কি করে?"

"কোনোখানে একবিন্দু সংস্কৃত উচ্চারণ হবে আমার কানের আওতায় আর আমি শুনতে পাব না, তাই কি হয়?"

সাবিকে নিয়ে একটা ভারি মুশকিল হয়েছে। ও এক মিনিট আমাদের সঙ্গ ছাড়ে না। কিছুদিন থেকে ও বলছে ও মির্চাকে বাংলা পড়াবে। মির্চাও বলে তাই ভালো, তাহলে বরং বাংলাটা শেখা হবে। কারণ আমিও ওকে যত বাংলা শেখাচ্ছি সেও ততো আমায় ফ্রেঞ্চ শেখাচ্ছে। এই দুই ভাষায় আমরা যে পারদর্শী হয়ে উঠব তার সম্ভাবনা কম। সবচেয়ে মুশকিল এই যে, মির্চা মনে করে সাবি একেবারে ছোট্ট সরল মেয়ে, কিছু বোঝে না। ওর সামনে আমরা অল্পবিস্তর প্রেমালাপ করতে পারি, ও আমার হাত ধরতে পারে—ইত্যাদি। কিন্তু এটা ভুল। আমি ষোল পূর্ণ হয়ে সতেরোয় পড়ব, ও এগার পূর্ণ হয়ে বারোতে। বারো বছরের মেয়ে এত কিছু ছোট নয়। তাছাড়া ও তখন যৌবনে প্রবেশ করেছে। কিন্তু ও খুব ছেলেমানুষি করে কথা বলে—ওর যখন মাত্র ছয় বছর বয়স তখন আমাদের এক ব্রাহ্ম আত্মীয়ার বিবাহ বিচ্ছেদ হল। সেই অভাবনীয় ঘটনায় সারা বাংলাদেশ তোলপাড় হচ্ছিল, মহিলারা একত্র হলে আর কোনো

কথা নেই– স্বামীত্যাগ ভালো কি মন্দ, এই বিতর্ক। আমার মা মাসীরা তখন সে-সব আলোচনা করতেন – ওকে চলে যেতে বললে যাবে না, বলে, “বলো না, আমার সামনে বলো, আমি ছেলেমানুষ কিছু বুঝব না!” তবে তখন সত্যিই বুঝত না, এখন বোঝে, নিশ্চয় বোঝে। ওর খুব কৌতূহল। কৌতূহল ভালোই, সেটা জিজ্ঞাসা, জিজ্ঞাসা না থাকলে মানুষ জানবে কি করে?

এ-ছাড়াও একটা নূতন ব্যাপার ওর মধ্যে লক্ষ্য করছি। আমাকে নিয়ে বাবা যে এত বাড়াবাড়ি করেন, আমাকে রবিঠাকুর এত ভালোবাসেন কিম্বা আমিই তাঁকে বাসি ও সেখানে যাবার সুযোগ পাই, অতবড় একজন ব্যক্তি আমার এত আপন কিন্তু ও সেখানে পৌঁছতে পারছে না, এতে সে কষ্ট পাচ্ছে। এ কষ্টটা তীক্ষ্ণ এবং তীব্র কিন্তু এটাতে ওর দোষ নেই। কেউ যদি চোখের সামনে আর একজনকে অতটা পেতে দেখে, তাহলে তার কষ্ট হতে পারে। ওর যে এখনও সময় হয়নি, হলেই পাবে, তাতো ওর বোঝার বয়স হয়নি। ও ঠোঁট ফোলাচ্ছে, কাঁদছে, ‘দিদিকে সবাই ভালোবাসে, আমাকে কেউ ভালোবাসে না।' ছোট্ট মেয়ের এই মিষ্টি কথায় সবাই হাসে কিন্তু তাতে ওর দুঃখটা তো যায় না।

আমি যখন দিল্লী গিয়েছিলাম, তখন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে ও একবার বলেছে–”দিদি না থাকলে তো এ বাড়িতে আসেনই না আপনি।” এখন ও মির্চাকে ধরেছে–ও বুঝতে পারছে মির্চার সঙ্গেও আমার একটা বিশেষ ভাব হয়েছে যেখানে সে নেই–আমার মনে হয় ও অনেকটাই বুঝতে পেরেছে এবং ওর মনে হচ্ছে আবার এই লোকটিও দিদিকে ভালোবাসবে। একথাটা নিয়ে আমি কারুর সঙ্গে আলোচনা করতে পারছি না। কার সঙ্গে করব? আমার বিশেষ ভয় মির্চা কিছু বুঝতে পারছে না বলে। কি জানি কখন ওর সামনে কি প্রকাশ করে ফেলে। একদিন সাবি বলেছেও, “তোমরা চোখে চোখে কি কথা বলেছ !” আমি মির্চাকে যখন বললাম, ও এর মধ্যে সাহিত্যরস খুঁজে পেল–খুব হাসছে–”চোখে চোখে কথা বলা, a good expression. Let us

try it again.” আমি যত সাবিকে লক্ষ্য করছি একটা অজানা আশঙ্কায় বুকের ভিতরটা কাঁপছে এই সুখের স্বর্গ ও ভেঙ্গে দেবে না তো? ইচ্ছে করে না হলেও ওর ভিতরের জমা উত্তাপে? না না, ও ছেলেমানুষ, কি করবে? কিন্তু রোজ এই দুশ্চিন্তা আমি ভোগ করছি। আমি জানি শান্তি সব জানে। খোকা জানে। ওদের অনুমোদন আছে। ওরা কখনো বলবে না। সম্ভবত কাকীমাও জানে, বলবে না। আমার ভয় শুধু ঐ পুঁচকে মেয়েটাকে। মাঝে মাঝে হাসিও পায়! ও কিছু নয়। ভয় তো থাকবেই। ‘ভয় নিত্য জেগে আছে। প্রেমের শিয়র কাছে মিলন সুখের বক্ষ মাঝে। আনন্দের হৃদস্পন্দনে কাঁপিতেছে ক্ষণে ক্ষণে বেদনার রুদ্র দেবতা যে।'

কবিতাটি ভয়ানক—গা ছম্ ছম্ করে।

আমরা রোজ শেভ্রলে গাড়ি করে বেড়াতে যাই—কখনো যশোর রোড দিয়ে, কখনো বারাকপুর রোড দিয়ে, কখনো টালিগঞ্জের নালার পাশ দিয়ে অর্থাৎ টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড দিয়ে। গাড়িতে বাবা মা আমি মির্চা সাবি ও ছোট দুই ভাই। মির্চা সামনে বসে ভাইদের নিয়ে। এই বেড়ানর সময়টুকুই আমরা একটু গাছপালা দেখতে পাই। আমার খুব ইচ্ছা করে ওর সঙ্গে একলা বেড়াই। গাছপালার মধ্যে, জ্যোৎস্নায় বা অন্ধকারে তারার আলোতে—বইতে তো কত পড়েছি—সে রকম আমাদের কখনো হবে না, কি করে হবে ?

প্রফুল্ল ঘোষ ছিলেন ইংরেজির অধ্যাপক, তিনি ভালো শেক্সপীয়র পড়ান। বাবা মাঝে মাঝে তাঁকে ধরে আনতেন, এলেই তিনি শেক্সপীয়র শোনাতেন। একবার তাঁকে নিমন্ত্রণ করে এসেছেন রাত্রে খাবেন ও শেক্সপীয়র পড়বেন। তারপর আমরা বসে আছি আসেনই না, আসেনই না—যখন আমরা অধীর হয়ে উঠেছি, ঘুম পাচ্ছে, রাগ হচ্ছে তখন তিনি এলেন। খাওয়াদাওয়া হল। পুরো সব খেলেন— তারপর মুখ ধুতে ধুতে বললেন, “দেখুন, আজ প্রফেসরের উপযুক্ত কাজ করেছি— আমি নিমন্ত্রণের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম—খেয়েদেয়ে মুখ ধুতে ধুতে মনে পড়ল—‘ওঃ আজ নেমন্তন্ন!’ এ যেন সেইরকম, ননদ-ভাজের গল্প—ননদ আর বৌ গেছে নদীতে বাসন ধুতে—ননদকে কুমীরে নিয়ে গেল—বৌ বাড়ি এসে সে কথা ভুলে গেল, কাউকে বলল না। খাওয়াদাওয়া করে আবার যখন ঘাটে গেছে তখন মনে পড়েছে, শাশুড়ীকে ডেকে বলে, ‘ভালো কথা মনে হল আঁচাতে আঁচাতে, ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে’'—” ভদ্রলোক বিশাল বপু নিয়ে ঝেঁকে ঝেঁকে ছড়া বলছিলেন —”আমারও সেইরকম হল।” সেদিন উনি আমাদের মার্চেন্ট অব ভেনিস শুনিয়েছিলেন, সেখানে যে বর্ণনা আছে জেসিকো আর লরেঙ্গো পোর্শিয়ার বাড়ির বাগানে বেড়াচ্ছে—লরেঙ্গো বলছে—the moon shines bright in such a night as this sweet wind did gently kiss the trees'. ঘর ভরা লোক, আমরা শেক্সপীয়র শুনছি মির্চা আর আমি

পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছি, একঘর লোকের মধ্যেও অবশ্য একলা হওয়া যায়। কিন্তু তার চেয়ে আরো ভালো সত্যি একলা হওয়া। আমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঐ লাইনগুলো মনে করতাম—আমরা কি কোনোদিন একলা বেড়াতে পারব? হয়ত কোনো জ্যোৎস্না রাতে বা জোনাকিজ্বলা সন্ধ্যায় আমরা হেঁটে বেড়াতে একটু দূরে গিয়েছি সাবি সঙ্গ ছাড়বে না—in such a night as this পাশাপাশি থেকেও বিরহ হচ্ছে। আবার দূরে দূরে থেকেও মিলন হয়। একেক সময় ও যে ঐ সামনের সীটে বসে আছে তাতেই আমার মন ভরে যায় আনন্দে। পাঞ্জাবীর রেখার উপর ওর গলার লাইনটা দেখা যাচ্ছে। ঐদিকে তাকিয়ে আমার শরীর শিহরিত হয়—আমি ভাবি আর কিছু দরকার নেই—ও দূরে থাকুক, দূরে থাকুক, ওকে একটু দেখলেই আমার যথেষ্ট হবে। একেক দিন আমি মনে মনে প্রার্থনা করতাম ও যেন গাড়ি থেকে আগে না নামে। তাহলে আমি নামবার সময় ওর গলাটা একটু ছুঁয়ে দিতে পারি। কিন্তু তা কি হয়? ও তো গাড়ি থেকে সবার আগে নামবে তারপর হাত ধরে ধরে সকলকে নামাবে— এই তো ওদের নিয়ম । ওকে কিন্তু আমি এসব কথা কখনো বলিনি—আমি ওকে কতটা ভালোবাসি তাও বলি নি। কারণ এখনও আমি নিশ্চিত নয় এ ব্যাপারটা কি, এটাই ভালোবাসা কিনা। আর তাছাড়া তাহলে ও নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে, ওর ঈর্ষাটা চলে যাবে। যেমন আমার ঈর্ষা নেই—ওর ঈর্ষাটাই আমার সবচেয়ে ভালো লাগে। তাই আমি ইচ্ছে করেই এমন সব কাণ্ড করি যাতে ওর ঈর্ষা হয়। যেমন সেদিন লেখক ‘অ’বাবু ওর ঘরে বসেছিলেন, আমি তাঁর সঙ্গে খুব গল্প জুড়ে দিলাম —দু'চারটে ইংরেজি কথা বলে বাংলাতেই গল্প করলাম—কেন, আমরা বাঙালী না? উনি আছেন বলে সব সময় ইংরেজি বলতে হবে নাকি? আমি একবার ওর দিকে তাকাইনি পর্যন্ত। সেদিন ওর মুখের ভাবটা, ‘আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে’র মত মেঘাচ্ছন্ন। ঈর্ষা হলে ও একটু নিষ্ঠুরও হয়—সেটাই সবচেয়ে ভালো লাগে। আমার এই মনের ভাবটা কি? ককেট্রি! ডিক্‌শেনারী দেখতে হবে।

কিছুদিন থেকে ওর সর্দারিটা খুব বেড়ে গেছে—আমাকে ধরেই নিয়েছে যেন ওর সম্পত্তি। ওর ধারণা মা, বাবা এবং বাড়ির সকলেই এটা জানে এবং অনুমোদন করে। তবে আর কি? হয়েই গেল সব। আমার বেরিবেরি হয়েছিল তাই পা ফুলে থাকে- সেজন্য পায়ে কবিরাজী তেল মালিশ করি—কিন্তু তার মানে এ নয় যে কখনো খালি পায়ে চলতে পারব না, পাথরের ঠাণ্ডা মেঝের উপর পা রাখতে ভালো লাগে—ও তা দেবে না—'চটি পরো'। লঙ্কা খাবার সঙ্গে বেরিবেরির কোনো সম্পর্ক নেই—সর্ষের তেলে বেরিবেরি হয়—তা ও বুঝবে না—রোজ একবার করে বলবে লঙ্কা খাবে না।

সেদিন খাবার পরে আমি, কাকীমা ও মির্চা খাবার টেবিলেই বসে গল্প করছি। ও আমার উপর রেগে আছে, লঙ্কা খেয়েছি, ওর কথা শুনি নি বলে। ও কাকীমাকে বলছে, "কাকীমা, তোমার নূতন বিয়ে হয়েছে তোমার মাধুর্য প্রয়োজন, তুমি লঙ্কা খেয়ো না—ঝাঁঝালো যে সব মেয়ে তারা যা খুশী করুক"

আমি বললাম, "যে সব ছেলেরা বেশি মিষ্টি, যাদের সবাই বলে কি ভালো ছেলে, আসলে তাদের কোনো পৌরুষ নেই।"

"তার মানে? তার মানে আমি লঙ্কা খেতে পারি না ঝাল বলে? আমার সাহস নেই?" এই বলে ও কাঁচা লঙ্কা ও লেবুসুদ্ধু প্লেটটা এগিয়ে নিয়ে একটার পর একটা লঙ্কা তুলে চিবিয়ে খেতে লাগল শুধু মুখেই। কি সর্বনাশ! ডাকাত একেবারে!

"ফেলে দাও! ফেলে দাও!" বলে আমি উঠে পড়তে যাচ্ছি ও টেবিলের নিচে দুই পা বাড়িয়ে দিয়ে আমার পা দুটা বন্দী করে ফেলল –গায়ে কি জোর! বেশি টানাটানিও করতে পারি না, কাকীমা বুঝে ফেলবে আমি বন্দী।

ও পর পর দুটো তিনটে লঙ্কা খেয়ে ফেলেছে—ওর ঠোঁট ইতিমধ্যে ফুলে গেছে, থুতনী পর্যন্ত লাল হয়ে গেছে। ফর্সা মুখের এখানে-ওখানে লাল—ও কিন্তু অবিচলিত—আমি হাত বাড়িয়ে প্লেটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করছি। কাকীমা নির্বিকার, হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। কাকীমা কিছু বুঝতে পারছে না, একটা

লোক সামনে বসে আত্মহত্যা করছে। সাবি বুঝতে পেরেছে, ওর মন আর আমার মন তো একই ধাতুতে গড়া ।

"মা, মা, দেখ দিদি ইউক্লিডদার সঙ্গে মারামারি করছে।" মা রান্নাঘর থেকে ছুটে এলেন- —ও তৎক্ষণাৎ আমার পা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। মা স্তম্ভিত, চিত্রার্পিত। এমন একটা কাণ্ড ঐ শান্ত ছেলেটা করল?

"একি ইউক্লিড, কাঁচা লঙ্কা চিবিয়ে খাচ্ছ কেন?"

কাকীমা বললে, "ঐ রু কথা শোনে নি বলে !"

"রু কথা শোনে নি বলে! সে কি! সে কি?"

সেই প্রথম আমি মার চোখে সন্দেহের ছায়া দেখলাম। মা ওর দিকে এক চামচ মাখন এগিয়ে দিলেন। বাটিটা ওর হাতে দিয়ে বললেন, "মাখন খাও"। মির্চা বাটিটা নিয়ে মাথা নীচু করে ওর ঘরে চলে গেল !

মা এইবার খুবই রেগেছেন—"কখন খাওয়াদাওয়া হয়ে গেছে এখানে বসে বসে আড্ডা হচ্ছে কেন? তোমাদের কি কারু কোনো কাজ নেই?"

আমি খুব ভয় পেয়ে গেছি কিন্তু তৎক্ষণাৎ যেন কিছুই হয় নি এমন ভাব করে বললাম—"না মা আমি শুধু বলেছিলাম ঝাল খেতে সাহস লাগে। তাই বীরত্ব দেখাচ্ছিল, তাই না কাকীমা? আহাম্মক আর কাকে বলে? লঙ্কা কখনো শুধু শুধু খায়!"

আমার গলা নিরুত্তাপ—যেন কিছুই না। মা বিশ্বাস করে নিলেন, সন্দেহের মেঘ উড়ে গেল, কারণ মা উড়িয়ে দিতে চান, যাদের ভালোবাসেন তাদের সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ মনে স্থান দিতে চান না। অপ্রিয় সত্যের মুখোমুখি হবার সাহস মা'র নেই। অর্থাৎ তখন ছিল না শুধু নয়, কোনও দিনও হয়নি। যখন তাঁর আঁচল থেকে তাঁর স্বামীকে খুলে নিয়ে যাচ্ছিল অন্য কেউ, তখন মা ভাবছিলেন ও কিছু নয়—দশ বছর ধরে সেই খোলার প্রক্রিয়া চলছিল। মা ভালোমত খেয়ালই করলেন না। যখন তাঁর সর্বনাশ হয়ে গেছে, তখন হঠাৎ

চমকে উঠলেন। তাঁর ধারণা, আমি বিশ্বাস করেছি বলেই কি আমাকে ঠকাতে হবে?

বিশ্বাস করা কি অন্যায়! সেই ষোল বছরের মেয়েটাও সেদিন মাকে ঠকিয়ে দিল। ভয়ে অবশ্য অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার বুক দুরদুর করেছে। বেশ চালাকী করতে পারি তো আমি ! মির্চার জন্যই এরকম মিথ্যাবাদী হয়ে যাচ্ছি। মোটেই না, মোটেই না, দুষ্মন্ত কি বলেছেন- ? "স্ত্রীণাম অশিক্ষিত পটুত্বম—"

মা উপরে যাচ্ছেন— খাবার টেবিল থেকে সিঁড়িটা দেখা যায় — আমি ভাবছি মার মনে যদি একটুও সন্দেহ লেগে থাকে সেটা কাটিয়ে দিতে হবে। উঠে গিয়ে মার গলা জড়িয়ে শুয়ে থাকব।

"কাকীমা, আমি উপরে মার কাছে শুতে যাচ্ছি, তুমি একটু মির্‌চাকে দেখ না ভাই—ওর কি হল।"

কাকীমা চোখ মট্‌কে বললে, "আমার বয়ে গেছে।"

মার কাছে শুয়ে শুয়ে আমি যা ভাবতে লাগলুম মা তো তা শুনতে পেলেন না—যত কাছেরই মানুষ হোক, যত ভালোবাসাই থাক একজন আর একজনকে কত সহজে ঠকিয়ে দিতে পারে। কারণ মুখে না বললে তো কেউ কারু মনের কথা বুঝতে পারে না। যদি পারত? তাহলে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ইত্যাদি মহামূল্যবান জিনিসগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেত।...মির্চা হঠাৎ এরকম একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল কেন, আমি কিছুই ভেবে পেলাম না—শুধুই কি আমি ওর কথা শুনি নি বলে বা বীরত্ব দেখাবার জন্য, না অন্য কোনো কারণ আছে, ওর মনে এতটা আঘাত লাগল কেন? নাকি প্রতিশোধ নেবার জন্য? যে কারণেই হোক, আমি এরকম করতে পারতাম না।

নিজেকে এত কষ্ট দেওয়া যায়? অনেকে পারে। যেমন ঠাকুরমা মৃত্যুর মুখেও তৃষ্ণা সংবরণ করতে পারতেন—দু'দিন তিনদিন তিনি উপবাস করতে পারতেন, আমি কি পারি? কিন্তু তাঁর তো কোন কারণ থাকত, কোনো ব্রতপালন বা ঐ

জাতীয় কিছু। এরকম শুধু শুধু করতেন না! হয়তো ওরও কারণ ছিল, ও আমার জন্য কতটা সহ্য করতে পারে তার পরীক্ষা দিচ্ছিল। ওর আত্মনিপীড়নের ক্ষমতা দেখে আমার নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছিল। ও আমার চেয়ে অনেক শক্তি রাখে । আমি আর কখনো ওর সঙ্গে ওরকম করব না। এবার আমি বলব আমিও যে ওকে চাই সে কথা বলব। ও যে রকম করে বলছে সে রকম করে নয়, ওর খুব কাছে বসে ওর শঙ্খচিলের মত সাদা পায়ের উপর হাত রেখে বলব; পা রেখে নয়, পায়ে হাত দিলে কি হয়? ও তো আমার চেয়ে বড়ই। বয়সে, বিদ্যায় আর মনের জোরে অনেক বড়। আমি নিজেকে পরাজিত মনে করছিলাম—তাতে আমার কষ্ট নেই। আমি সুখী। আত্মপীড়নের শক্তি দেখিয়ে ও অনেক বড় হয়ে গেছে—দেহি পদপল্লবমুদারম্ !

বাবার খুব ব্লাডপ্রেসার, তাই নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে কারণ তার চোখে রক্ত জমেছে এটা কঠিন অসুখ। কিন্তু কঠিন অসুখ না হলেও বাবার একটু অসুখ হলেই তা কঠিন বলে মনে হয়। শুধু আমাদের নয় সব বাড়িতেই, বাড়ির কর্তা যে পুরুষ তিনিই পনের আনা, অন্য আর সকলে একত্র হয়ে এক আনা। অর্থাৎ তাঁর সুখ-সুবিধে ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরই সবকিছু নির্ভর করছে, অন্য লোকের সুখ-সুবিধা ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো দাম নেই। এ ভাবটা আমাদের বাড়িতে খুব বেশি, কারণ এখানে তো তিনি বাড়ির কর্তা মাত্র নয়—অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। কাজেই তাঁর অসুখ হওয়া মানে, বাড়ির সকলের অসুখ হওয়া অর্থাৎ আর কারু অন্য চিন্তা নেই—মার তো নেইই। মা রাতের পর রাত জাগতে পারেন হাসিমুখে—এই অতন্দ্র সেবা অবশ্য বাবা গ্রহণ করেন প্রাপ্য হিসাবে। এটা সব বাড়ির কর্তাদেরই মনোভাব। 'স্ত্রীর দিকে এই সেবার মূল্য তার দানের আনন্দে, তৃপ্তিতে, হয়ত বা পুণ্যে, স্বামীর দিক থেকে কৃতজ্ঞতার কোনো প্রয়োজনও নেই। সে কথা কেউ মনেও করে না। অসুখ না হলেও বাড়িতে যেটা শ্রেষ্ঠ খাদ্য সেটা কর্তার জন্য। তাঁর নিদ্রার সময় সমস্ত বাড়ির নীরবতা, কিন্তু অন্যের নিদ্রার সময় তিনি চীৎকার করতে পারেন! সেটা কেউ অন্যায় মনে করে না। বাড়ির কর্তাদের এমনও দেখেছি, ট্রেনে কোথাও যাবার সময় ফার্স্ট ক্লাসে গেলেন, বুড়ো মা ছেলেমেয়েদের ইন্টারে তুলে দিয়ে। খুব ভালো লোকেরাও এরকম করতেন, এতে কেউ তাঁদের নিন্দা করত না বা তাঁদের আত্মগ্লানি হত না। বাড়ির কর্তা অর্থাৎ যাঁর রোজগারে বাড়ির অন্য সকলে প্রতিপালিত, তাঁর অপ্রতিহত অধিকার অন্যের সুখ-দঃুখ ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে দলিত পিষ্ট করে সকলকে নিজের মতে চালনা করবার। এতে একটা বৃহৎ পরিবারের শৃঙ্খলা রক্ষা করবার হয়ত সুবিধা হয়, কিন্তু ঐ কর্তা ব্যক্তিটি একান্ত স্বার্থপর ও দাম্ভিক হয়ে ওঠবার সুযোগ পান। তাঁর নিজের ধারণা জন্মায় যে এই বাড়িতে তিনি একজন ঈশ্বর। অথচ তিনি তো ঈশ্বর নন, ঐ বাড়ির দুঃস্থতম তুচ্ছতম আত্মীয়টির মতই তিনিও একজন ভুলভ্রান্তিযুক্ত সুখদুঃখকাতর সাধারণ মানুষ। একটি দেশের

পক্ষে রাজা যেমন সে দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা, সংসারের কর্তাও তাই। তারপর কর্তাটি যদি বিশেষ অনেক গুণের অধিকারী হন, তবে তো কথাই নেই। বাবার গুণের বোধহয় পরিমাপ হয় না—বিশেষত বিদ্যার দিক থেকে। এমন কোনো বিষয় নেই যে বিষয়ে তিনি কিছু না কিছু জানেন— অমেয় তাঁর জিজ্ঞাসা নিরন্তর বহুদিকে ধাবিত। দুরূহ সংস্কৃতে লেখা দর্শনশাস্ত্রের অর্থবোধ করবার জন্য কোনো দিন তাঁর সাহায্য দরকার হয় নি। তাঁর স্মৃতিশক্তি প্রখর। ক:েউ কেউ মনে করতেন, তিনি জাতিস্মর। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও মনে করতেন— যখন বাবার সাত বছর বয়স, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তাঁরা যে দুজনে গত জন্মে একত্র তপস্যা করেছিলেন কোনো এক নদীর তীরে সে কথা বাবার মনে আছে কিনা। বাবার অবশ্য মনে ছিল না। তখন বিজয়কৃষ্ণ বলেন যে, তোমার সেবারেও পতন হয়েছিল এবারও হবে-- তোমায় আবার আসতে হবে। বাবা তাতে ভীত নন, এই উপভোগ্যা পৃথিবীতে আবার যদি আসতেই হয় তাতে তিনি কাতর হবেন কেন? দ্রুতপঠন ক্ষমতাও তাঁর বিস্ময়কর! সাত-আট হাজার বইয়ের লাইব্রেরীর সমস্ত বই তাঁর পড়া। তাছাড়া তাঁর ব্যক্তিত্ব অসাধারণ, সেই ব্যক্তিত্বের আকর্ষণী শক্তিও প্রবল। বড় বড় পণ্ডিতরাও তাঁর সমকক্ষ নন, তিনি তাঁদের প্রশ্নে প্রশ্নে ঠকিয়ে প্রমাণ করে দেন যে তাঁদের ষত্ব-ণত্ব জ্ঞান নেই। —

শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও বাবাকে অনেকেই মান্য করে, ভালোবাসে। সেবা উনি আদায় করতে জানেন। ওঁর অধ্যাপক ম্যাকটাগার্টের গল্প শুনেছি—অত বিরাট পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁর এই বিদেশী আহ্লাদে ছাত্রটির রীতিমত সেবা করতেন—ঘরে তাঁর চেম্বার-পট পর্যন্ত রেখে যেতেন! এ কথাটা বাবা বেশ গর্বের সঙ্গেই বলতেন। তখনকার দিনের ছাত্র ও অধ্যাপকদের সম্পর্কের মাধুর্য তাঁদের সম্পর্কের মধ্যে ছিল। বাবা তাঁর পক্ষে যতটা ভালোবাসা সম্ভব ভালোও বাসতেন অধ্যাপক ম্যাকটাগার্টকে। দার্শনিক পণ্ডিত ম্যাকটাগার্টের একটা দুর্বলতা ছিল, তিনি খুব মদ্যপান করতেন। তাঁর একটা গল্প প্রায়ই বলতেন বাবা। কোনো বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরবেন, একটা মাঠ পেরিয়ে রাস্তায় পৌঁছতে হবে

—বিরাট মাঠের মধ্যে কোথাও কিছু নেই, একটিমাত্র গাছ আছে। অধ্যাপক সোজা সেই গাছটির সামনে এসে দাঁড়ালেন কিন্তু সেটা কি করে পার হবেন ভেবে পেলেন না। তখন আবার বাড়িতে ফিরে গেলেন, ও আবার রওনা হয়ে ঠিক সেই অনতিক্রম্য গাছটির সামনে এসে পৌঁছলেন, এরকম অনেকবার করবার পর শ্রান্ত ক্লান্ত অধ্যাপক গাছতলাতে বসে পড়লেন— "I am lost in a dense forest."

এই গল্পটা খুব উপভোগ্য ছিল। কিন্তু আমার মনে সব সময় একটা খটকা লেগে থাকত যে, বাবা যাঁকে এত শ্রদ্ধা করেন, এমন শ্রদ্ধনীয় বিদ্বান ব্যক্তি কি করে মদ্যপ হতে পারেন। মদ খাওয়া তো খারাপ, পাপই, তাহলে? আমরা কখনো একথা ভাবতে শিখি নি যে একজন মানুষের চরিত্রে দোষগুণ পাশাপাশি বাস করলেও সে শ্রদ্ধনীয় থাকতে পারে। সমাজের বিবিধ তিরস্কারে অভিভূত আমাদের দৃষ্টি মানুষের দুর্বলতা ও ত্রুটিবিচ্যুতিগুলিকে যথাযথ 'পারসপেক্‌টিভে' দেখতে জানত না। যেমন আমার বাবার যে কোনো ত্রুটি থাকতে পারে, তা কখনো আমরা চিন্তাও করতে পারতাম না। তিনি সম্পূর্ণ দোষশূন্য দেবতাতুল্য—এই রকম একটা ধারণা গড়ে তোলবার মূল হচ্ছেন মা। এর বিপদ কতখানি তা মা বুঝতেন না। শুধু আমার মা নয়, এই রকমই তখন রেওয়াজ ছিল। তাঁরা মনে করতেন পিতামাতার, গুরুজনের কোনো বিচার করবার চেষ্টাই ক্ষতিকর। পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্মঃ, পিতা হি পরমং তপঃ—সে যুগেই কোনো কোনো বাড়িতে এ মন্ত্রের প্রভাব শিথিল হচ্ছিল বটে, কিন্তু আমাদের বাড়িতে আমার পিতার অসামান্য প্রতিভার জন্যই তা হতে পারে নি। তবু সেই সময়ে আমার মনে একটু একটু সমালোচনার ভাব দেখা দিচ্ছিল, তার জন্য আমি লজ্জিত হলেও সেই ভাব সম্পূর্ণ দমন করতে পারছিলাম না। প্রথম আমার বাবার সঙ্গে মুখে মুখে উত্তর করবার স্পর্ধা হয়েছিল তাঁর অসুখের সময়তেই—।

আমাদের বাড়িতে আমার ঠাকুমার আমল থেকে একটি মহিলা থাকতেন। আমার বাবার চেয়ে কিছু বড়—তাঁকে আমরা আত্মীয় বলেই জানতাম। আসলে

তিনি পরিচারিকার কাজ করতেই এসেছিলেন কিন্তু ক্রমে বাড়ির লোকের মত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে আমরা অর্থাৎ ছেলেমেয়েরা সবাই খুব ভালোবাসতাম। তাঁর খুব হাঁপানি হত, একজিমায় কষ্ট পেতেন। আমি দেখতাম, তাঁর জন্য ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনায় বাবার একেবারে গরজ নেই—মা যতদূর পারেন চেষ্টা করেন কিন্তু টাকা তো বাবারই। একদিন দেখলাম, তিনি যন্ত্রণায় কাঁদছেন—আমি সোজা গিয়ে বাবাকে বললাম—"তোমার জন্য সব সময় এত ওষুধ আসছে, ডাক্তার আসছে, চাঁপাপিসির জন্য কেন আসবে না?" বাবা বিস্ময়বিমূঢ় —"আমার জন্য ডাক্তার আসছে, চাঁপার জন্য কেন আসছে না?" এত বিস্ময় ছিল তাঁর প্রতিপ্রশ্নে যেন তিনি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না, তিনি আর ঐ দাসী এক হল আমার কাছে!

আমি চুপ করে চলে গেলাম। আমার নিজেরই লজ্জা করতে লাগল। এমন একটা কথা আমি যে কি করে বলে ফেললাম। কিন্তু আমি জানি, আমার মনে ক্রমে ক্রমে বিদ্রোহ জমা হচ্ছে। বাবার মতের বিরুদ্ধে এতটুকু কাজ করবার আমাদের ক্ষমতা নেই। এই বাড়ির প্রত্যেকটা মানুষ তাঁর অনিচ্ছায় একেবারে কিছু করতে পারবে না। তাহলে—আমার ইচ্ছার দাম কি? কিছু না, কিছু না। সম্রাট যেমন ইচ্ছে করলে কাউকে হাতীর পায়ের তলায় ফেলতে পারেন, করুর মুণ্ডচ্ছেদ করতে পারেন, উনি সেরকম শরীরে মেরে ফেলতে পারেন না বটে কিন্তু মনে—মনের উপর তাঁর অধিকার সম্পূর্ণ। উনি যদি আমাদের কথা জানতে পারেন, এই মুহূর্তে আকবর যা করেছিলেন তাই করবেন—শরীরে নয়, কিন্তু মনে, মনে, মনে। প্রেমের এই আনারকলির উপর পাথর গড়িয়ে ফেলবেন। কেউ বাধা দিতে পারবে না! আর রবিঠাকুর? তিনি যদি আমার পিতা হতেন, তিনিও কি এরকম করতেন? যিনি লিখেছেন—'দোলে প্রেমের দোলনচাঁপা হৃদয় আকাশে'—তিনি কি সেই চাঁপার কলি থেঁতলে দিতে পারেন? কখনই না। বলব তাঁকে? কি হবে বলে, তাঁর তো আমার উপর কোনো অধিকার নেই। তিনি তো আমার কেউ নয়। কেউই নয়! কেউই নয়! কি অদ্ভুত কথা।

একদিন ও আমাকে জিজ্ঞাসা করল– "তুমি কোনারকের মূর্তি দেখেছ?"

"আমি কোনারক যাইই নি। কেন?"

"আমি আগে ভাবতুম মানুষ ওরকম দেখতে হতে পারে না।"

আমি ভাবছি মনে মনে ও কোনারক যেতে পারে কারণ সেটা পোড়ো মন্দির —— পুণ্যলোভীর নাই হল ভীড় শূন্য তোমার অঙ্গনে জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়'–কিন্তু পুরীর মন্দিরে বা ভুবনেশ্বরের মন্দিরে ওকে ঢুকতে দেবে না। ও ম্লেচ্ছ। ওরা রবীন্দ্রনাথকেও পুরীর মন্দিরে ঢুকতে দেয় নি। কী দুর্ভাগা এই দেশ! তাই তো অমন একটা কবিতা লিখেছিলেন, যা অভিশাপের মত শোনায়।

আমরা নীচের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি–আমি রেলিঙে ঠেশ দিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে। পিছনে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলে ভরা মাধবীলতাটা দুলছে, মাঝে মাঝে আমার মাথায়, গালে ছুঁয়ে যাচ্ছে। ও আমার সামনে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে, হঠাৎ আস্তে আস্তে বললে, "তোমাকে দেখতে মন্দিরের গায়ে মূর্তির মত।"

এই প্রথম ও আমার চেহারা সম্বন্ধে একটা প্রশংসার কথা বলল। তা এটা প্রশংসা কিনা তাই-ই জানি না। মূর্তির মত দেখতে হওয়া ভালো কি খারাপ কে জানে! আমি আরো অনেক মিষ্টি মিষ্টি রূপ বর্ণনা শুনতে চাই, কিন্তু অন্য লোকেরা যা এত বলে ও তা বলে না। ওদের দেশে বোধ হয় রূপ বর্ণনা করতেই জানে না আমাদের মত

"তিল ফুল জিনি নাসা, সুধার সদৃশ ভাষা
মৃগপতি জিনি মধ্যদেশ
রাম রম্ভা জিনি উরু কামধনু নিন্দি ভুরু
মেঘসম ঘন কালো কেশ।"

তা নয়, মূর্তির মত দেখতে! যাঃ কিছু হল না।

কিছুদিন থেকে আমার বই ছাপা হচ্ছে, কবিতার বই, বাবা অনেক আশা করে বইয়ের নাম দিয়েছেন 'ভাসিতা'। বইটা প্রেসে যাবার আগে বেশির ভাগ

মীলু কপি করেছে। মীলুর বানান সম্বন্ধে ধারণা বেশ নূতন রকম। “এ কি? যদি-তে ‘দ’-এ ঈ-কার দিয়েছিস্ কেন ?”

“কি হয়েছে তাতে? নদীর পাশে তো ভালই দেখাচ্ছে।”

ষত্ব-ণত্বর তো কথাই নেই। আমারও যে বানান নির্ভুল তা নয়। বিশেষ ভুল বানানের সম্মুখীন হলে আমি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যাই। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় দেশবিশ্রুত সম্পাদক বলতেন, একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া তিনি আর কোনো কবি দেখেন নি যার বানান সম্পূর্ণ নির্ভুল। প্রুফ দেখতে শিখে আমি রীতিমত বড় হয়ে গেছি। গম্ভীরভাবে প্রুফসংশোধন করতে করতে নিজেকে বেশ উন্নত মনে হয়। কিন্তু বানানের জন্য আমি ডিক্‌শনারী দেখি না। আমি ‘চয়নিকা’, ‘বলাকা’ বা ‘মহুয়া’ থেকে বানানটা দেখে নিই—অর্থাৎ কোন শব্দটা কোন কবিতায় কোন পাতায় রয়েছে এটা বের করে নেওয়া আমার পক্ষে সহজ এবং আনন্দজনক। সেই সময়ে যদি রবীন্দ্রনাথের কবিতার উপর কনকরডেন্স করতে দেওয়া হত আমি বোধ হয় পারতাম।

নাচ

বাবা ঠিক করেছেন আমার জন্মদিনের দিন ‘ভাসিতা' উদ্ভাসিত হবে, সেই দিনের জন্মোৎসবে বাংলাদেশের সমস্ত কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদের নিমন্ত্রণ করবেন, একটা বিরাট আয়োজন করবেন। এ যেন বিলেতে যেমন মেয়ে বড় হলে তাকে রাজসভায় পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় তেমনি নূতন কবিকে বিদ্বৎসমাজে পরিচয় করিয়ে দেবেন। এই যে একটা আয়োজন চলেছে আমাকে কেন্দ্র করে, বাবা মা দুজনেই তাঁদের প্রথমা কন্যাকে নিয়ে মেতে আছেন, এতে অন্যরা অনেকটাই আড়ালে পড়ে গেছে। অবশ্য ভাই দুটি তো ছোট, কিন্তু সাবি? সে তো ছোট নয়। সে অনাদৃত বোধ করছে এবং ঠোঁট ফোলাচ্ছে। তার শরীরও খারাপ হয়েছে, মনও। এই মনের অসুখটা আরো বেড়ে গেল যেদিন তাকে ফেলে আমরা উদয়শঙ্করের নাচ দেখতে গেলাম।

বেশ কিছুদিন আগে অ্যানা প্যাবলোভা এসেছিলেন কলকাতায়। মা আর বাবা তাঁর নাচ দেখতে গিয়েছিলেন। প্যাবলোভার নৃত্য নিয়ে কলকাতার 'এলিট'রা মুখর হয়ে উঠেছিল। মা জীবনে সেই প্রথম এরকম নাচ দেখলেন। আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়নি কারণ আমি তখনও যথেষ্ট বড় নয়। এ সম্বন্ধে মা যখন অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করেন তখন আমি শুনেছি। নৃত্য সম্বন্ধে মা বিশেষজ্ঞা নন মোটেই। কিন্তু তাঁর শিল্পরুচি ও সৌন্দর্যবোধ বাবার চেয়ে অনেক বেশি। তাই মরালীর মৃত্যুর নৃত্যটি তাঁকে অভিভূত করেছিল। বেশ অনেকদিন পর্যন্ত একটা আবেশ লেগেছিল তাঁর মনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দ্বিধাও ছিল কম নয়। প্যাবলোভা তো মরালীনৃত্য করার সময় আপাদলম্বিত গাউন পরে ছিলেন না। তাঁর পরনে কাপড়চোপড় মার চোখে ছিল না বললেই হয়। তাঁর ঊরু অনাবৃত ছিল, ঘাগ্রাও ঘুরছিল নিম্নাঙ্গের অনেকখানিই অনাবৃত করে। মার মতে এটা শিল্পের প্রয়োজনে মেনে নিলেও সমাজের পক্ষে তো ক্ষতিকর বটেই। নিউ এম্পায়ার থেকে বেরিয়ে আসবার সময়, দূরে তাঁর বোনপো তাঁকে দেখে সুরুৎ করে পালিয়ে গেল। বোনপোর বয়স কিছু কম নয়, এম. এ. পড়ে। কিন্তু তাকে ওখানে দেখে মা খুব চিন্তিত, দেবুও এ নাচ দেখল। আর দেবুও কম চিন্তিত নয়, যে মাসী তাকে এমন একটা 'নিষিদ্ধ' জায়গায় দেখে ফেললেন।

যা হোক উনিশ'শ ত্রিশ সালে উদয়শঙ্কর কলকাতায় এলেন নিউ এম্পায়ার-এ নাচ দেখাতে। প্যাবলোভার শিষ্য, ভারতীয় নৃত্য দেখাবেন। এ দেশের চোখ তখন নাচ দেখতে অভ্যস্ত নয়। কখনো সখনো বিশেষ সমাজের দু-একজন বিশেষ ব্যক্তি দুচারটে 'ব্যালে' দেখে থাকবেন। স্বদেশী নাচ দেখা যায় শুধু মন্দিরে। আমরা পুরীতে ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরে দেবদাসীর নাচ দেখেছি। সে নাচ অসংস্কৃত। আর বাইজীরা কোথায় নাচে সে আমরা সভ্য সমাজের লোকেরা জানিই না। আমাদের ধারণা দুশ্চরিত্র জমিদারেরা বাগানবাড়িতে তাদের কোনো রহস্যলোক থেকে নাচাতে নিয়ে আসে! কোন বিদগ্ধ ব্যক্তি সে নাচ দেখবার জন্য ব্যগ্র নয়। আর নাচে উপজাতিরা। সাঁওতাল, মুণ্ডা, গোন্ড, এরা নানা

উৎসবে নাচে। আমি খোঁপায় জবা ফুল গোঁজা সাঁওতাল মেয়েদের নাচ দেখেছি। লোকনৃত্যের মধ্যে মণিপুরী, গরবা ইত্যাদি সেই দেশের পালাপার্বণে হয়ে থাকে। বৃহত্তর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুসমাজে কোনো রকম নাচের কথা আগে তো শুনি নি, এক ব্রতচারী ছাড়া। আর শুনেছি ঠান্‌দিরা বাসরঘরে বরকে উত্যক্ত করার জন্য নাচে। ভদ্রলোকের ছেলে কিংবা মেয়ে স্টেজে নাচবে এ তো কল্পানাতীত ব্যাপার।

১৯২৬ কিংবা ১৯২৮ সালে শিলং গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে মণিপুরী লোকনৃত্য দেখে রবীন্দ্রনাথই প্রথম রঙ্গমঞ্চে দর্শকদের সামনে ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েদের নৃত্য প্রবর্তন করলেন। দর্শকেরা টিকিট করে সে নাচ দেখতে গেল। বাঙালীর ঘরের মেয়ে সহস্র লোকের চোখের সামনে অঙ্গসঞ্চালন করবে একথা চিন্তা করে অনেকেরই রাত্রির নিদ্রা চলে গিয়েছিল। এ একরকম বিদ্রোহ-ঘোষণা। হয়ত রাজনৈতিক বিপ্লবের চেয়েও কঠিনতর রবীন্দ্রনাথকে তাই সাবধানে চলতে হয়েছিল। প্রথম যে নাটকে এই নৃত্যযোজনা হল সে ‘নটীর পূজা’—কথা ও কাহিনীর ‘শ্রীমতী’ কবিতাটিকেই ঐ নাটকে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ‘নটীর পূজা’ অর্থাৎ নৃত্যটাও নৃত্যশিল্পীর পক্ষে পূজাই এই বিশেষ ব্যঞ্জনার দ্বারা নটীর কলঙ্কমোচন করা হয়েছিল খুব সূক্ষ্মভাবে। যে গানটির সঙ্গে নৃত্য করলে ‘শ্রীমতী' নামে সে দাসী’ সে হচ্ছে, ‘আমায় ক্ষম হে ক্ষম’...নর্তকী ভগবান বুদ্ধকে বলছে ‘তোমার বন্‌দনা মোর ভঙ্গীতে আজ সঙ্গীতে বিরাজে’ কিংবা ‘আমার সব চেতনা সব বেদনা রচিল এ যে কি আরাধনা’... সেই আরাধনার ভাবমূর্তি দেখে নিন্দুকেরা কিছুটা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। আমি ‘নটীর পূজা’ দেখি নি। কারণ নাচ দেখবার তখন আমার বয়স হয় নি। সেই একই কারণে উদয়শঙ্করের নাচ দেখতে সাবিকেও নেওয়া হল না। দিদি গেল বলেই ও দুঃখ পেল, কারণ ওরও তখন বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে, ও যৌবনে প্রবেশ করছে।

বাবা কলেজ থেকে ফোন করে জানালেন একটিও সীট নেই, খালি বক্স আছে। বক্সের দাম অনেক বেশি, তাই মির্চাও কিছুটা দেবে, আমরা চারজন যাব। মা সেদিন রূপার পাতের চুমকি বসান ঈজিপশিয়ান চাদর পরেছিলেন, মাকে রানীর মত দেখাচ্ছিল। মির্চা ধুতি পাঞ্জাবী পরেছিল। কলকাতার সমগ্র বিদগ্ধসমাজ সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিল। কলকাতার এই বিদগ্ধসমাজের মধ্যে উচ্চমন্যতা রোগে ভোগেন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত বিরাট এক গোষ্ঠী। সকলেই নয় অবশ্য, কিন্তু অনেকে। তাঁরা আমাদের কোনোদিনই যথেষ্ট সভ্য বলে মনে করেন না— আমরা ক'পুরুষই বা কলকাতার এই উচ্চসমাজে মিশছি, তাছাড়া আমরা তো হিন্দু। খুব পরিচিত হলেও তাঁরা সব সময়ে আমাদের চিনতে পারেন না। এই শ্রেণীভুক্ত বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট এলিট সেদিন তাঁদের স্বাভাবিক তাচ্ছিল্যভাব তো কাটিয়ে ফেললেনই, দলে দলে আমাদের বক্সের নিচে এসে দাঁড়িয়ে, ডেকে ডেকে গল্প করতে লাগলেন। বাবার ভঙ্গীও কম দৃপ্ত নয়, পরমাসুন্দরী পত্নী, যথেষ্ট সুন্দরী (মির্চা যাই বলুক) কবিকন্যা ও বিদেশী ছ;াত্র এবং বক্স — সব নিয়ে যা কাণ্ডটা হয়েছিল তাতে ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকাদের দর্প চূর্ণ-বিচূর্ণ।

উদয়শঙ্কর সেদিন অদ্ভুত নাচ দেখালেন—আমার মনে আছে তাঁর ছায়াটা আমাকে যেন এক অলৌকিক জগতে নিয়ে গিয়েছিল— তাঁর স্পন্দিত বাহু যেন জলের ঢেউ—সমস্ত শরীর তরল। পার্বতীরূপিনী সিমকী মনোহারিণী হলেও উদয়শঙ্কর যেন দেবলোক থেকে নেমে এসেছেন—মানুষের দেহের এমন ছন্দিত রূপ আমি তো দেখিই নি, সেদিন ওখানে উপস্থিত আর কেউ দেখেছেন কিনা সন্দেহ। মির্চার অবস্থা সুদাস মালীর মত—মুখে আর বাক্য নাহি সরে, ওর হাতে যদি সুদাসের মত পদ্ম থাকত তাহলে ও তখনি 'পদ্মটি রাখিত ধরে' উদয়শঙ্করের 'চরণপদ্ম পরে'। সারারাত সে পিয়ানো বাজাল, ঘুমাতে পারল না —আমাকেও ঘুমাতে দিল না, আমার ঘর ঠিক ওর ঘরের উপরেই। এর পর বহু দেশে বহুসময়ে নাচ দেখেছি কিন্তু সেদিনের অনুভূতি আর কখনো হয় নি।

আমাদের দুজনেরই মন ছিল অনুকূল – সৃষ্টির বেদনা তাই তারা সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করেছিল। বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত আমাদের আর কোনো কথা ছিল না! মির্‌চা বলতে লাগল——”This is India ! This is India !”

আমায় যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে ও আমাদের বাড়িতে কতদিন ছিল, ক’দিন ক'মাস বা ক’বছর—আমি বলতে পারব না। আমার এই ষাট বছরের জীবনে সবসুদ্ধ জাগতিক হিসাবে হয়ত ছয় সাত বছর আমি সত্যকারের বেঁচে আছি বাদ বাকি দিনগুলি পুনরাবৃত্তি মাত্র। মির্চার সঙ্গের দিনগুলি তার মধ্যে যদি এক বছর হয়ে থাকে তবে তা তিনশ’ পঁয়ষট্টি দিন মাত্র নয়, তার পরিমাপ করার কোনো যন্ত্রই আমার হাতে নেই। পৃথিবীর আবর্তনে তা ঘুরছে না, তা সূর্যের মত স্থির আছে। আমি তার মধ্যে এতদিন প্রবেশ করি নি, এখন করছি—যখন ইচ্ছা করছি প্রবেশ করছি সেই সময়ে, সেই আনন্দে, সেই বেদনায়। সেখানে আমি কাকে পাচ্ছি? শুধু কি ও আর আমি? তার মধ্যে সবাই আছে, শান্তি আছে, খোকা আছে, ঐ গোপাল আছে যে ওর দিকে ঈর্ষাভরে চায়, কারণ সে আমায় খুব ভালোবাসে। তারা সবাই উপস্থিত। আছে ঐ লাইব্রেরীর বইগুলো, এমন কি ক্যাটালগ করার বাক্স পর্যন্ত। আমার সত্তার চৈতন্যে মিশে সেই কালটি তার সমস্ত রূপসম্ভার নিয়ে অব্যয়।

আমার মা বরাবর বৈষ্ণবসাহিত্য পড়তে ভালোবাসেন, এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট বিদূষী। বৈষ্ণবসাহিত্য পড়বার জন্য তিনি ওড়িয়াভাষাও শিখেছেন। কাকা যখন এম এ পরীক্ষা দেন তখন মা তাঁর সঙ্গে বাংলায় এম. এ-র বই সব পড়েছেন। চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্য এসব মার আয়ত্ত। কিন্তু সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয় চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি। আমি মাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম—”এই লাইনটার অর্থ কি—‘জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপতি ভেল, লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু, তবু হিয়া জুড়ন না গেল'—এই কবিতাটির বক্তব্য কি? এ তো সত্যিই লাখ লাখ যুগ হতে পারে না, কারণ অতদিন কেউই বাঁচে না। তাহলে এটা অত্যুক্তি—অত্যুক্তি কি কাব্যবিচারে দোষ নয়? তাহলে তোমরা এটা এত ভালো বল কেন ?”

মা হাসছিলেন—”না এটা অত্যুক্তি নয়—'

"অভুক্তি নয় !"

"কি করে বোঝাই তোকে—যা কিছুতে শেষ হতে চায় না, যে আনন্দ বা বেদনা ফুরায় না—যাকে সময় দিয়ে মাপা যায় না, এ হচ্ছে তারই বর্ণনা।" আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। অনেক ভাবতে লাগলাম—রবীন্দ্রনাথের গানে বা কবিতায় ঠিক এই কথাটা কোথায় আছে তা আমার মনে পড়ল না। 'লাখ লাখ যুগ' অর্থাৎ অনন্তকাল। যে সুখ কোনো দিন তৃপ্ত হয় না তা ভালো কি মন্দ কে জানে? এই চির অতৃপ্তির কথাটা ভেবে আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল—

সাবির অসুখ খুব বেড়েছে। কবিরাজকাকা ওর চিকিৎসা করছেন। ও নানা রকম অদ্ভুত কথা বলে। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখিয়ে কি সব বিড়বিড় করেছে—। আর ভজন- গান করছে। আর মির্চাকে এক মুহূর্ত ছাড়বে না। তাকে ওর বিছানার পাশে বসে থাকতে হবে। ওর হাত ধরে থাকতে হবে। মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য ওর মাথায় তেল লাগানো হচ্ছে, চুল মাঝখান থেকে কেটে ফেলে —সে তেলও মির্চাকে লাগিয়ে দিতে হবে। ভালোই হয়েছে। কারণ এজন্য মির্চা অনেক সময়ে ওপরে আমার ঘরে থাকছে, ঐ ঘরেই তো সাবির রোগশয্যা। ঘরে অনেক লোকজন ঘোরাফেরা করে, সাবির কাছে বসে থাকে। যদি আমার অসুখ করত তাহলে পারত না। সাবি কিনা ছোট তাই এটা সহজ। কিন্তু এতে আমার মন কানায় কানায় ভরে গেছে— ও যে এত আপন হয়ে গেছে, আমাদের আত্মীয়ের এতে একটা অদ্ভুত সুখ পাই আমি! একদিনের কথা আমার মনে আছে, কবিরাজকাকা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মাকে ওষুধের বিষয় বিস্তারিত বলছেন—মির্চা সাবির কথা শুনছে—আমি বেশ অনেকটা দূরে আমার খাটের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ ও একবার আমার দিকে চেয়ে একটু হাসল—আর সেই মুহূর্তে ঠিক সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত শরীরে একটা অদ্ভুত অনুভূতির ঢেউ খেলে গেল। আমার মেরুদণ্ড ঝিনঝিন্ করতে লাগল, আমি খাটের উপর বসে পড়লাম। আমি তো 'জ্যেষ্ঠতাত' তাই সব বিষয় বিশ্লেষণ

করা আমার স্বভাব। এই অদ্ভুত অনুভূতিটা আমাকে প্রশ্নে প্রশ্নে ভরিয়ে ফেলল—এটা হল কি? এটা হলই বা কি করে? এটা তো শরীরের ব্যাপার, সম্পূর্ণ শরীরের ব্যাপার, কোনো সন্দেহ নেই—আত্মা-টাত্মা কিছু নেই এর মধ্যে—কিন্তু সেই শরীরও তো স্পর্শিত নয়। শুধু দৃষ্টিপাতমাত্র এরকম কি হতে পারে? কাকেই বা জিজ্ঞাসা করা যায়? ওকে জিজ্ঞাসা করা ঠিক হবে না, বেড়ে উঠবে, তাছাড়া ও জানবেই বা কি করে? ও তো ডাক্তার নয়। শরীরের ব্যাপার ডাক্তার কবিরাজরাই জানতে পারে, তবে তাদের তো আর জিজ্ঞাসা করা যায় না! ধর, যদি কবিরাজকাকাকে জিজ্ঞাসা করি, কাকা মির্চাকে দেখলে এ রকম লাগে কেন মাঝে মাঝে—তাহলে কি হয়? হাঃ হাঃ হাঃ— তাহলে আর একটা খাটে শুইয়ে মাথায় মধ্যমনারায়ণ তেল দেওয়়া হয়। নয়ত সোজা বহরমপুর পাগলের ফাটক।

আমরা ছাদে বসে কিম্বা বারান্দায় বসে প্রায়ই ছোট ছোট নাটিকাগুলি পড়ি ও আবৃত্তি করি। আমরা পড়ি অর্থ, আমি পড়ি, অন্যেরা শোনে। ছোট নাটিকা অর্থাৎ 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ' বা 'বিদায়-অভিশাপ'। বিদায়-অভিশাপটা আমার ভালো লাগে বেশি, কিজানি কেন? এই সভায় থাকে মীলু, গোপাল, খোকা, কাকীমা। শান্তিও থাকে, তবে সে এ সব বেশি বোঝে না। মির্চাও বোঝে না, তবু সেও মাঝে মাঝে থাকে। ছাদে বসতে সকলেরই ভালো লাগে, এটুকুই প্রকৃতিকে পাই আমরা। পড়তে পড়তে অন্ধকার হয়ে আসে, আকাশে তারাগুলো একে একে ফুটে ওঠে, তারপর গুটিগুটি একদিক থেকে অন্য দিকে চলতে থাকে। বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে আসে। পাশের বাড়ির কামিনীর ঝাড়টা থেকে সুগন্ধ পাওয়া যায়। অন্ধকার হয়ে গেলেও আমার থামবার দরকার নেই, আমার তো মুখস্থ। একদিন গোপাল আমায় বললে, "তুমি এতবার করে 'বিদায় অভিশাপ' পড়ছ—ভাগ্যে না ঐ রকমই ঘটে যায়।"

"অর্থাৎ? আমি ভ্রুকুটি করলাম।"

"যা হয় অর্থ বুঝে নাও।"

"তোমার ভারি আস্পর্ধা হয়েছে—যা খুশি আমায় বলতে শুরু করেছ।" "রাগ করলে আমি নাচার। আমি তোমায় সাবধান করছিলাম রু।"

এই উপমাটা আমি আরও দু-একবার আত্মীয়স্বজনের মুখে আভাসে শুনেছি। আমার রাগ হয়েছে, ভয় হয় নি। ভয় হবে কেন? ওটা তো কাব্য এটা তো জীবন। দুটো দুই জগতের ব্যাপার। মির্চা কখনো কচের মত করবে না। দেবযানীকে কচ স্বর্গে নিয়েই বা গেল না কেন? নিতে ঠিকই পারত, শুধু তাতে গল্প হত না।

একদিন মির্চা আমায় বললে, "তোমাদের দেশে নতুন বিবাহিতাদের জীবন কেমন আমার জানতে ইচ্ছে করে।"

"বুঝতে পারলাম না—"

"এই যেমন তোমার কাকা ও তাঁর পত্নী, তাঁদের মধ্যে তো কোন উচ্ছ্বাস দেখতে পাই না।"

"তাদের উচ্ছ্বাস তোমাকে দেখাতে যাবে কেন?"

"আমাদের দেশে দেখা যায় – তাছাড়া আমি তো তোমার কাকীমার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি।"

"সে কি!" আমার খুব রাগ হয়েছে, "কাকীমার মুখের দিকে তোমার দেখবার দরকার কি! খুব বিশ্রী কথা।"

"না, না, সে কথা নয়- -ওদের নতুন বিয়ে হয়েছে, কিন্তু মুখে তো কোনো দাগ দেখতে পাই না।"

আমি তো অবাক—"বিয়ে হওয়া তো আর জলবসন্ত হওয়া নয়, মুখে দাগ হবে কেন?" ও হাসছে। মুখ টিপে টিপে হাসছে—

"আমাদের দেশে হয়। কি রকম দাগ হয় তুমি দেখতে চাও?"

"হ্যাঁ"

ও দু হাত বাড়িয়ে আমায় ধরল। আমার মুখের উপর উষ্ণ চাপ অনুভব করলাম তীক্ষ্ণ এবং মধুর—একটু পরে ও আমায় ছেড়ে দিল,

"আয়নায় দেখ—"

আমি উঠে দেওয়ালে টাঙান ওর আয়নাটায় মুখ দেখে চমকে উঠলাম।

নিচের ঠোঁটের ঠিক মাঝখানে গোল ছোট্ট কালো একটা দাগ—স্পষ্ট এবং উগ্র। আমি তাকিয়ে আছি—ভয়ে আমার চোখ বিস্ফারিত—"কি হবে মির্চা, কি হবে ?"

ও নির্বিকার মুখে একটা বই খুলে পাতা ওল্টাচ্ছে।

"মা তো বুঝতে পারবেন। পারবেন না? বল, বল মির্চা।"

"পারাই তো সম্ভব।"

"ও বাবা, তবে কি বলব মাকে, শিখিয়ে দাও!"

"তোমার মাকে তুমি কি বলবে আমি কি জানি !"

"তুমি এ রকম করলে কেন, এ্যা করলে কেন?"

নিরুপায় আমি ক্রন্দনের উপক্রম করলাম। ও একটা বই হাতে নিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আমার দিকে চেয়েই বললে—"যদি কান্নাকাটি কর তাহলে আর একটা দাগ করে দেব।"

আমি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি, আমার হাত পা কাঁপছে। ভয়, ভীষণ ভয়। মৃত্যুভয়ও বোধহয় এরকম হয় না। জানি না মৃত্যুভয় কি রকম কিন্তু সেই মুহূর্তে যদি ঈশ্বর আবির্ভূত হয়ে বলতেন, তুমি এখুনি মরে যেতে চাও, না, দোতলায় তোমার মার সামনে যেতে চাও, তাহলে আমি প্রথমটাই সহস্রগুণে শ্রেয় মনে করতাম। কিন্তু তা হল না। ঈশ্বর কোথায় ছিলেন জানি না, তিনি ভয়ার্ত বালিকার ডাক শুনতে পেলেন না। কিছুক্ষণ পরই মার সামনে পড়লাম। মা তো আমায় দেখে চমকে উঠলেন। তারপর আমার দিকে স্থির তাকিয়ে

জিজ্ঞাসা করলেন, “রু, তোমার ঠোঁটের উপর ঐ বিশ্রী দাগটা কি করে হল?”

“কোথায় দাগ?” গলা অত্যন্ত সহজ এবং নিরুত্তাপ।

“আয়নায় দেখ না—”

বুঝেছি, দরজায় ধাক্কা লেগেছে।”

“কোন্ দরজায়! ওঃ কি “হয়ত লাইব্রেরীর দরজায় ! অতটা ব্যথা পেলে আর জানো না কোথায় ধাক্কা লাগল। রু, সত্যি কথা বল।”

জানি...হয়ত...হয়ত —লাইব্রেরীর দরজায়

“না, না, ব্যথা তো লাগে নি । ওঃ মনে পড়েছে, আমি নিজেই দাঁত দিয়ে চেপে ফেলেছি।” “তাই বল। দরজার ধাক্কায় কখনো ও রকম হয়। যাও একটু ক্রিম লাগিয়ে ওটা ঢেকে রাখ।”

সরল ভালোমানুষ বিশ্বাসপরায়ণ মা নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বাস করতে পেরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

আমার জন্মদিন এগিয়ে আসছে। উৎসবের আয়োজনে বাড়ি মুখর। উৎসব হবে প্রাচীন ভারতে যেভাবে জন্মতিথি পালন হত সেই নিয়ম অনুসারে। সমস্ত সাহিত্যিকরা আসবেন। বয়োবৃদ্ধ জলধর সেন সাদা পায়রা উড়িয়ে দেবেন—পায়রা উড়বে, বদ্ধ জীব মুক্ত হবে। উৎসবের আয়োজন চলছে। এদিকে সাবির অসুখ বাড়ছে। আবোল-তাবোল কথা বলে, ওর অশান্ত মনের পক্ষে সেগুলো হয়ত আবোল-তাবোল নয় কিন্তু সে কথা মেলাচ্ছে কে? অভিভাবকরা নিজেদের খুশিমতো কাজ করেন, ছেলেমেয়েদের মনের খবরও যে রাখতে হবে, সে দিকে খেয়ালই নেই তাঁদের। তাঁরা মনে করেন, যেমনটি হওয়া উচিত অর্থাৎ যা হলে সব নিরুপদ্রব হয় তেমনটি আপনিই হয়ে যাবে। সাবি এত অসুস্থ তা সত্ত্বেও উৎসবের আয়োজন পুরোদমে চলছে। ওর প্রতি অবহেলা হচ্ছে নিশ্চয়ই তাই ও অধীর। কিন্তু অধৈর্য ও আপত্তি আর কি করে প্রকাশ করে বেচারা! এই রোগের মূল বীজাণু একটি ছোট্ট তীক্ষ্ণমুখ বিষাক্ত আশঙ্কা, ‘দিদিকে সবাই ভালোবাসে আমাকে কেউ বাসে না।'

আত্মীয়স্বজনের মধ্যেও মৃদু গুঞ্জন, নরেনবাবু মেয়েকে নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছেন। এতে ওর মাথা ঘুরে যাবে। আমার বন্ধুরাও আশঙ্কিত যে আমি তাদের থেকে যেন পৃথক হয়ে যাচ্ছি। এমন কি মির্চাও, যে ধরেই নিয়েছে আমার মা-বাবা ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার জন্য উৎসুক এবং সময়মতো ওঁরাই ওকে বলবেন, সেও আমাকে সেদিন হঠাৎ বললে, যদি তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে নাও হয় আমি তোমায় তিনবার দেখতে চাই। একবার তুমি মা হবার পর, একবার যখন তুমি খুব বৃদ্ধা আর একবার তোমার মৃত্যুশয্যায়। খুবই রাগ হয়েছে আমার একথা শুনে। আমি জানি এটা কবিত্ব করে বলা, আমিও তো অনেক কবিত্ব করে কথা বলি, শব্দার্থেই যার অর্থ নেই। কিন্তু এর মর্মার্থই বা কি? বুদ্ধদেব যে রকম জরা মৃত্যু দেখেছিলেন উনিও সেই রকম দেখবেন। মজা মন্দ নয়।

জন্মদিনের দিন বাংলাদেশের সমস্ত খ্যাতনামা সাহিত্যিকরা এসেছিলেন। শুধু রবীন্দ্রনাথ আসেন নি, কেন আসেন নি তা আমার মনে নেই—সম্ভবতঃ এখানে ছিলেন না। কিন্তু তিনি আমাদের বাড়িতে যে কখনো আসেন নি, তা নয়। বেশ কয়েকবার এসেছেন, এই বাড়িতেই এসেছিলেন কিছুদিন আগে, হঠাৎ একটা দুপুরবেলায় খবর না দিয়ে। আমি তখন উঠোনের সিঁড়িতে বসে উচ্চৈঃস্বরে কবিতা আবৃত্তি করছি, দুঃখের বিষয় সেটা রবীন্দ্রনাথের কবিতা নয়—সম্ভবতঃ অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'অমাবস্যা' বলে একটা কবিতার বই বেরিয়েছিল তাই থেকে বলছি, এমন সময় একজন লোক গলির দিকের আধখানা দোলান দরজা ফাঁক করে বললে "রবিবাবু এসেছেন?" তখন তাঁকে সবাই রবিবাবু বলত, যদিও আমি এ বইতে তাঁকে সে নামে উল্লেখ করি নি—আমি কিয়ৎক্ষণ তার কথাটাই বুঝতে পারি নি। এত অপ্রত্যাশিত এ ঘটনা। তারপর সামলে নিয়ে দরজা খুলে দেখি মির্চার ঘরের সামনে গলির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন—'নিরঞ্জন আনন্দ মূরতি' সোজা দীর্ঘদেহ, চশমা থেকে কালো ফিতে ঝুলছে, ঐ চশমার নাম প্যাসনে—কানের উপর ডাঁটি নেই। কোঁচান ধুতি মাটি ছুঁয়ে আছে। এ যেন স্বর্গ থেকে সহসা কোনো দেবতা আমাদের এই বাড়ির মাঝখানে আবির্ভূত হয়েছেন। আমার অবস্থা দেখে তিনি হেসে বললেন, "বিশু ডাকাতের মতো খবর দিয়ে আসা উচিত ছিল নাকি?" আমি ভাবছি ভাগ্যিস আমরা সব বাড়ি আছি। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে উনি বললেন—"এসেছিলুম রামানন্দবাবুর বাড়িতে, উনি বললেন তোমরা কাছেই থাক তাই ভাবলুম, তোমায় একবার দেখে যাই। তাঁরই লোক পথ দেখিয়ে এনেছে।"

রামানন্দবাবু কাছেই থাকতেন টাউনসেণ্ড রোডে। রোজ সকালবেলা তিনি প্রাতভ্রমণে বেরিয়ে লাঠি হাতে ধীরে ধীরে হেঁটে আমাদের বাড়ি আসতেন। আমাদের বাড়িতে সকালের চায়ের টেবিলে কিছুক্ষণের জন্য তাঁর উপস্থিতি একেবারে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তিনি অবশ্য চা খেতেন না। খেতেন এক গ্লাস দুধ। যত দূর মনে পড়ে, ঐরকম সময়ই একটা ঘটনা নিয়ে তিনি খুব

উত্তেজিত ছিলেন। একজন বিখ্যাত পণ্ডিত তাঁর নিজের বইয়ের মধ্যে তাঁর ছাত্রের গবেষণার বিষয়টি অর্থাৎ ঐ ছাত্রের রচনা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। এ কথা নিয়ে তখন দেশ জুড়ে তোলপাড় চলছিল। রামানন্দবাবু দুর্বল পক্ষের সহায় হয়েছিলেন, তাঁর মতে বেচারা ছাত্রটির হয়ে বলবার কেউ নেই–বাবার সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর আলোচনা হত।

টাউনসেণ্ড রোড রামানন্দবাবুর বাড়িতে সেদিন দুপুরে কবি এসেছিলেন 'শেষের কবিতা'র পাণ্ডুলিপি নিয়ে। 'প্রবাসী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের সব রচনা চিরকাল প্রকাশিত হয় শুধু নয়, ঐ পত্রিকা তাঁকে ধারণ করে আছে সব রকমে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যেন বিরাট পক্ষ বিস্তার করে তাঁকে রক্ষা করছেন। পক্ষী মাতা যেমন করে তার শাবককে রক্ষা করে। উপমাটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে। রামানন্দ কি করে রবীন্দ্রনাথকে রক্ষা করবেন, তিনি কি এঁর চেয়ে বড়? তা নয়। তবে রক্ষা করবার শক্তি তাঁর আছে– তাঁর হাতে ভারতের শ্রেষ্ঠ পত্রিকা, যে পত্রিকা শুধু সাহিত্যের জন্য নয়, নির্ভীক সাংবাদিকতা, সততা, সব কিছু নিয়ে বিশেষ সম্মানযোগ্য এবং প্রচারও যার সর্বাধিক। ওর চেয়ে বহুগুণে প্রচারসংখ্যা বেশি এমন তো কত পত্রিকা আজকাল আছে কিন্তু অত শ্রদ্ধার সঙ্গে কোনো পত্রিকার নাম আজ কেউ করবে না। তখনকার দিনে আরো যে দুটি বড় পত্রিকা ছিল–বসুমতী' ও 'ভ::রতবর্ষ' এ দুটোর কোনোটাতেই আমার যতদূর মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের একটি লেখাও প্রকাশিত হয়নি। কারণ রবীন্দ্রকাব্যের মেজাজের সঙ্গে এদের বিরোধ ছিল। রবীন্দ্রনাথের বিরোধী পত্রিকার সংখ্যাও কম নয়। হয়ত তারাই সংখ্যাগুরু, নিন্দামুখর এই দেশের ঈর্ষাজর্জর ছোটবড় প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গে অবিশ্রান্তভাবে লড়াই করেছেন রামানন্দ। তাঁর তীক্ষ্ণ নিপুণ পরিহাস-উজ্জ্বল 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-এ রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাজের সমর্থন ও বিপক্ষের প্রতি যুক্তিশানিত বিদ্রূপ-বাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে। যদি কেউ বলেন এর কি কোনো প্রয়োজন ছিল? তা ছিল। রামানন্দের সহায়তা না পেলে নিন্দার কুশাঙ্কুরে রবীন্দ্রনাথের কোমল মন ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত।

আমি রামানন্দের সঙ্গে এক বিশেষ আত্মিক যোগ অনুভব করতাম। উনিও কবিকে আমারই মতন ভালোবাসেন। অতএব রামানন্দেরও নিশ্চয় কখনো কখনো ঈর্ষা করবারও অধিকার ছিল। কাজেই যখন 'বিচিত্রা' পত্রিকা আধুনিক সজ্জায় অলঙ্কৃত হয়ে, রবীন্দ্রনাথের দুটি বৃহৎ রচনা 'ঋতুরঙ্গ' ও 'তিন পুরুষ'-এ সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশ পেতে লাগল তখন তিনি যে একটু ক্ষুণ্ন হবেন এ আর আশ্চর্য কি। তাই সেদিন রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে 'শেষের কবিতা'র পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসেছিলেন 'প্রবাসী' সম্পাদকের মান ভাঙ্গাতে। ফলে আমারই লাভ হয়ে গেল---এরকম অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের চেয়ে আর কি সুখকর ঘটনা ঘটতে পারে?

আমার জন্মদিনের উৎসবে ঐ 'বিচিত্রা' পত্রিকা সম্পাদক উপেন গঙ্গোপাধ্যায়ও এসেছিলেন। তিনিও প্রায়ই আসতেন, ভারি মিষ্টভাষী মানুষ। রামানন্দবাবুর মত উপেন গঙ্গোপাধ্যায়ও বালিকার রচনা পকেটে করে নিয়ে যেতেন। আমাদের সে সময়ে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এত ভীড় ঠেলাঠেলি ছিল না। সম্পাদকের পছন্দ হলেই লেখা প্রকাশিত হত এবং পছন্দটা নির্ভর করত লেখার উপরে, লেখকের ঠিকুজীকুষ্ঠির উপরে নয়।

সেদিন জন্মোৎসবে যারা যারা এসেছিলেন সকলের কথা লিখতে গেলে এ মহাভারত হয়ে যাবে। শ্রদ্ধেয়া কামিনী রায়ের তখন কবিখ্যাতি দেশজোড়া—তাছাড়া আরো একটা কারণে আমরা মেয়েরা তাঁর প্রতি সমবেদনা অনুভব করতাম। আমরা শুনতাম জগদীশচন্দ্র বসুকে তিনি ভালোবাসতেন, জগদীশচন্দ্রও বাসতেন।

এঁদের বিবাহ ঠিক ছিল, হল না। শুনেছি এই বিরহের ফলশ্রুতি 'আলোছায়া' কবিতার বই। আর চিরকুমার পি. সি. রায় চিরকুমার রইলেন যাঁকে ভালোবেসে তিনিও এই কামিনী রায়। বিরাট পুরুষদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি পাবার যোগ্য ছিলেন রমণীয়া কামিনী রায়।

সেদিন আমাদের বাড়িতে কামিনী রায়কে একজন নবীনা মহিলা কবি হঠাৎ বলে বসলেন যে তাঁরা পুরানো হয়ে গেছেন, 'এখনকার' যুগে তাঁদের লেখা গ্রহণযোগ্য নয়। কামিনী রায় অন্তরের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মতী, ও অপমানে একটু বিচলিত হলেন না—স্নিগ্ধ মুখে চুপ করে রইলেন। আমার মার খুব খারাপ লেগেছিল এই দাম্ভিকতা। মা বললেন, "কামিনী রায় পুরনো হয়ে গেছেন, ইনি যেন আর কোনদিনও পুরনো হবেন না। পুরনো হলেই কি দাম কমে গেল নাকি! রবিবাবু যা বলেন, "নূতন গোঁফ গজালে যেমন বার বার আয়নায় মুখ দেখে, এরা তেমনি সর্বক্ষণ অদৃশ্য গোঁফে তা দিচ্ছে!" এই পুরনো হয়ে যাওয়া কথাটা আমারও কোনো দিন ভালো লাগে না...কি পুরনো হয়? মানুষ? না তার ভাব? সত্তার যে অংশ অমর সেইখানেই তো সাহিত্যের জন্ম। কাজেই একদিন যা ভালো ছিল, যদি সত্যিই ভালো হয়ে থাকে অন্য দিনে কি তা নষ্ট হয়? আর বিচারই বা করে কে? বিচারকও তো কোন অপরিবর্তনীয় মানদণ্ড হতে করে বসে নেই। শরৎচন্দ্রকে সেই আমি প্রথম দেখলাম... প্রথম ও শেষ কারণ তাঁকে আর আমি দেখি নি। যদিও তাঁর প্রায় সমস্ত রচনাই আমি তখন সাগ্রহে গিলে ফেলেছি। 'বিপ্রদাস' আমাকে তাঁর প্রতি বিমুখ করেছে। বিচিত্রাতে 'বিপ্রদাস' বেরুচ্ছে। আমি সেই অল্প বয়সেই ভেবেছি যিনি 'পল্লীসমাজ' লিখেছেন তিনি 'বিপ্রদাস' লিখছেন কেন? বিপ্রদাস যে খাওয়া ছোঁয়া নিয়ে হিন্দু কুসংস্কার মানছেন, লেখক তো তার সমর্থন করেছেন। বিপ্রদাস যদিও যোগাযোগের বিপ্রদাসের মত করেই কথা বলে তবু তার কথাগুলি নিরর্থক। যদি তা গোরার অনুরূপ হয়ও তবু গোরার লেখক গোরাকে দিয়ে গোঁড়ামীর সমর্থনে যত কথাই বলুন তিনি নিজে তো তা সমর্থন করেন না...গোরাকে সাহেব বানিয়ে তিনি সমস্ত হিন্দুয়ানী ও গোঁড়ামীর মূলোচ্ছেদ করেছেন। আর শরৎচন্দ্রের বিপ্রদাস, এর হাতে খাব না, ও ছুঁয়ে দিলে হবে না ইত্যাদি করে কোন্ সত্যে উত্তীর্ণ হচ্ছেন? কিন্তু তাঁকে এ কথা জিজ্ঞাসা করার সাহস আমার সেদিন হয় নি।

কবি প্রিয়ংবদা দেবী তাঁর ছোট ছোট মাপের কবিতার বইগুলি সব আমায় দিয়েছিলেন। তাঁকে তো খুব কাছ থেকে দেখেছি। অমন স্নেহপ্রবণ মধুরস্বভাব বিদূষী আজকাল তো দেখি না। কেউ হয়তো জানে না, তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিবাহের প্রস্তাব হয়েছিল—রবীন্দ্রনাথের পত্নীবিয়োগের পর। মহর্ষিদেবও ইচ্ছা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ করেন নি। শুনেছি প্রসিদ্ধ জাপানী শিল্পী ওকাকুরা তাঁকে ভালোবেসেছিলেন——একটা ছবিও এঁকেছিলেন! এসব কথা আভাসে শুনতাম—মধুর সুখস্পর্শ কাহিনী—এঁরা কেউ এঁদের জীবন লিখে গেলেন না, আমরা ভালো করে কিছু জানতে পারলাম না। কোন কোন মানুষের জীবনই তো দীপ যা অন্যের পথে আলো ফেলে। পৃথিবীকে চিনতে শেখায়।

প্রিয়ংবদাদেবীর কথা মনে পড়লে একসঙ্গে অনেকগুলি নারীমূর্তি মনে আসে—এঁরা সকলেই বিদগ্ধা ও বহুগুণসম্পন্না—এবং প্রত্যেকেরই নানা বৈশিষ্ট্য—সরলা দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী, প্রিয়ংবদা দেবী, ইন্দিরা দেবী—সমস্ত নাম উল্লেখযোগ্য, সভাসমিতিতে এঁদের পাশাপাশি দেখতে আমাদের চোখ অভ্যস্ত ছিল— সকলেরই ব্রাহ্মিকা করে শাড়ি পরা, হাতে জাপানী পাখা—আভিজাত্যের প্রতিমূর্তি। সরলা দেবী শুনেছি খবু কড়া মেজাজের মানুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর কাছে আমি যে স্নেহ পেয়েছি তাতে আমার সে কথা সমর্থন করতে ইচ্ছে হয় না। বস্তুতঃ ঠাকুরবাড়ির সম্পর্কিত প্রত্যেককেই আমার খুব ভালো লাগত, কাজেই আমার তাঁদের সম্বন্ধে মতামত পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট। অনুরূপা দেবীকে খুব কাছ থেকে আমি দেখি নি, তিনি এ সমাজের মানুষ নন।

কান্তিচন্দ্র ঘোষের গোঁফ ছিল কিন্তু তিনি ‘তা’ দিচ্ছিলেন না। যদিও ওমর খৈয়ামের রুবায়েৎ-এর অনুবাদ করে তখন তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছেন—তিনি সুন্দর আবৃত্তি করতেন——Oh! take the cash and let the credit go — nor heed the rumbling of the distant drum'—কথাটা সেদিন বড় সত্য ছিল— ভবিষ্যতের কোনো বিভীষিকা সেদিন

আমি দেখতে পাইনি— আমার দুই হাত cash-এ পূর্ণ—নগদ মূল্যে ভরা, মোহর বাজছে ঝম্‌ঝম্।

এখনকার সঙ্গে একটা তুলনা আমার মনে আসে, এখন যাঁরা ইনটেলেকচুয়াল বলে খ্যাত তাঁদের উন্নাসিকতা মনে হয় অনেক বেশী। অল্পবয়সী ছেলেরাও কেউ অমুক কাগজে লিখছে, কেউ অমুক প্রাইজ পেয়েছে, ব্যাস্ তাদের সামনে এ বয়সেও ভয়ে আমরা মাথা তুলতে পারি না! ব্যতিক্রম যে নেই তা নয় তবে তারা ব্যতিক্রমই। আমি তো আজ রীতিমত হীনমন্যতা রোগে ভুগি কারণ পুরনো হয়ে গেছি। কিন্তু সেদিন এইসব প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকরা যাঁরা জ্ঞানে গুণে বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়, তাঁদের ব্যবহারে এতটুকু অবজ্ঞা দেখতে পাই নি। আমার বাবা যে এইটুকু একটা মেয়েকে নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু করেছেন তাতেও কেউ তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাচ্ছেন না— তাঁরা খুব খুশি তুষ্ট ও তৃপ্ত। তাঁরা আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন যেন সহযাত্রীকে গাড়িতে তুলে নিলেন। ১৯৩০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর আমি হঠাৎ কামিনী রায়, প্রিয়ংবদা দেবী, কান্তিচন্দ্র ঘোষ, জলধর সেন প্রভৃতির কন্‌টেম্পরারি হয়ে গেলাম।

উদয়শঙ্করকে নিয়ে তো আমরা মনে মনে মেতেছিলাম, বাবা তাঁকেও নিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে একটু একলা কথা বলবার ইচ্ছায় দোতালার বারান্দায় আলাদা করে ‘চা’ দিলাম। বাড়ি তখন লোকারণ্য। আমি গল্প করবার চেষ্টা করছি, মির্চা কোঁচাটি সামলিয়ে সেখানে এল, ওতো আমার চেয়েও ভক্ত, তা ও কথা বলুক না। আমি কি বারণ করেছি, ইচ্ছে করলে ওর নিচের ঘরেও নিয়ে যেতে পারে, একলা কথা বলতে যদি চায়, আমার কোন আপত্তি নেই। তা নয়, একপাক ঘুরে বিমর্ষমুখে চলে গেল।

সত্যি বলতে কি কাছ থেকে তাঁকে দেখে আমি একটু নিরাশ হলাম। কারণ কথা বলা তো আর তাঁর শিল্পের মাধ্যম নয়, যে মানুষটিকে স্টেজের উপরে

কখনো পর্বতচূড়া কখনো সমুদ্রের ঢেউ মনে হয়েছিল সে হঠাৎ মানুষ হয়ে গেল!

আমার আগে সকলে একসঙ্গে গাড়ি করে বেড়াতে যেতাম দূরে দূরে, বাবার চোখের অসুখের পর বাবা আর যেতে পারেন না– তাই আমরা অর্থাৎ আমি, সাবি, ছোট দুটি ভাই, শান্তি, মির্চা আমরা লেকে বেড়াতে যেতাম। তখন ঢাকুরিয়া লেক সবে কাটা হয়েছে বা হচ্ছে। বড় লেকটার সাজান গোছান শেষ হয়েছে, ওপাশের ছোট লেকটা কাটা হচ্ছে। তখন সেখানে এত জনসমাগম হত না। কলকাতাতে লোক এর এক চতুর্থাংশ ছিল কিনা সন্দেহ, সাদার্ন এভিন্যু দিয়ে হয়ত ঘণ্টায় দু-তিন খানার বেশী গাড়ি চলত না।

বেড়াতে যাবার সময় মির্চা রোজই ধুতি পাঞ্জাবী ও চটি পরে নিত, ও যেন বাড়িরই একজন–বাড়ির অল্পবয়সীরা মোটামুটি সকলেই আমাদের ব্যাপারটা জানত –কেউ কিছু বলত না। শান্তি তো বরং বেশ সুযোগ করে দিত বাচ্চাদের নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরতে চলে গিয়ে।

জন্মদিনের উৎসব আয়োজনের মধ্যে ও একটু দূরে চলে গিয়েছিল, আবার আমাদের আগের মত ভাব হয়ে গেল। ক্রমেই এমন অবস্থা হচ্ছে যে আমরা একজন আর একজনকে ছেড়ে একটুও থাকতে পারি না। অথচ থাকতে হয়। তাই সর্বদা দুঃখ এবং সুখ পাশাপাশি মেশামেশি করে মনকে ব্যাকুল করে রাখে –ও বলছে কয়েক দিনের জন্য ও দেশে ঘুরে আসবে, তাহলেই বা কি হবে। ভবিষ্যতের চিন্তা করবার বয়স আমার নয়। আমাদের যে বিয়ে হবে না সেটা মোটামুটি আমি জানি। কিন্তু ওকে ছেড়ে থাকতে পারব না তাও জানি, তবু এ দুয়ের মধ্যে যে সামঞ্জস্য করা দরকার তা আমার মনেও আসে না, চেষ্টাও করি না।

একদিন হঠাৎ ঝড় উঠে বৃষ্টি নেমেছে। আমি দুপুরবেলা নিচে নেমে এসেছি– ভাবছি উঠোনে দাঁড়িয়ে ভিজব, ও বললে–"অমৃতা এদিকে এস।"

আমরা ওর ঘরের সামনের দিকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছি, ও চৌকাঠে হেলান দিয়ে ছিল, দু হাত বাড়িয়ে আমাকে টেনে নিল।

"কেন তুমি আমার হাতটা সরিয়ে দিচ্ছ অমৃতা?"

"আমার ভয় করে।"

"ভয়, না ঈর্ষা?"

"ঈর্ষা আবার কাকে?"

"তোমার নিজেকে কি তুমি ঈর্ষা কর? তোমার শরীরকে কি তুমি ঈর্ষা কর? তোমার কি মনে হয় আমি তোমার চেয়ে তোমার শরীরটাকে বেশি ভালোবাসছি? তা নয় অমৃতা তা নয়, আমি তোমাকেই খুঁজছি তোমার আত্মাকে খুঁজছি। তুমি তো তোমার শরীরেই আছ, যে তোমাকে চোখে দেখা যায় না হাতে ছোঁয়া যায় না সেই দেহের অতীত তোমার সত্তাকেই আমি পাচ্ছি তোমাকে স্পর্শ করে।" ও আমার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে। "আমি বুঝতে পারি না মির্চা, বুঝতে পারি না।"

১৯৩০ সালের কাহিনী শেষ হয়ে এল। আমার দুর্ধর্ষ তত্ত্বজ্ঞানী পিতা ও অভিজ্ঞ মাতা এই দুই তরুণ তরুণীর প্রণয়লীলার কোনো খবরই রাখেন না। কোনো সন্দেহ তাঁদের হয় নি, তাঁরা খবর পেলেন এগার বছরের একটা মেয়ের কাছ থেকে।

সাবির অসুখের কোনো স্থিরতা নেই, ওর মেজাজ অনুসারে তা কমে বাড়ে। যখন মনোযোগ আকর্ষণের সময় হয় তখন ওলট পালট কথা বেড়ে ওঠে। সেদিন আমরা সকলে অর্থাৎ ভাইবোনদের নিয়ে লেকে বেড়াচ্ছি, ওরা ছুটোছুটি খেলছে। আমরা দুজনে একটা ঝোপের পাশে বসে আছি নূতন লেকটার উত্তর দিকে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। লোকজন বিশেষ কেউ নেই। আমার মনে পড়ে না শান্তি আমাদের সঙ্গে সেদিন ছিল কিনা। আমরা দুজনে কাছাকাছি বসে আছি, নীরব অন্ধকার মাখান আকাশ আমাদের ঘিরে আছে, সামনের তরঙ্গহীন নিথর

জলে পিছনের বাতির আলোতে আমাদের যুগল ছায়া দীর্ঘীকৃত। চারিদিক নিস্তব্ধ, আমার মনও শান্ত। এক আশ্চর্য প্রশান্তিতে আমি আবিষ্ট। ও কিন্তু চঞ্চল, অস্থির, ধৈর্যহারা হঠাৎ ও আমার ঊরু স্পর্শ করল- I

"না না মির্চা না!"

'কেন না? তুমি আমার হবে না? আমাকে তোমার ভালো লাগছে না?"

"হবে না মির্চা হবে না। ওরা কখনো রাজি হবেন না।"

"সে কি, ওঁরা তো তোমায় আমাকে দিয়েই দিয়েছেন।"

বেচারা ও একেবারে আমাদের বুঝতে পারে না। আমাদের সংস্কার ধর্ম আচার ব্যবহার ও যতই শুনুক বুঝতে পারে না। ও আমাকেও বুঝতে পারে না।

"ছেড়ে দাও মির্চা আমার ভয় করছে।"

"কখনই তোমাকে ছাড়ব না। কখনই না, এ জীবনে নয়।"

এমন সময় হঠাৎ একটা চেঁচামেচি, কে যেন ডাকল, আমরা ছুটে গিয়ে দেখি সাবি মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে, চিৎকার করে আবোল-তাবোল বকছে। মির্চা তাকে তুলে এনে বড় লেকের পাশে একটা বেঞ্চিতে শুইয়ে দিল। আমি ওর মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে ওকে শান্ত করতে চেষ্টা করছি। আস্তে আস্তে চাঁদ উঠছে, চাঁদের ছায়া পড়েছে লেকের জলে। সাবি ছটফট করছে "ইউক্লিডদা তুমি আমার কাছে বস। আমাকে একটু আদর কর।" মির্চা এগিয়ে এল "কি কষ্ট হচ্ছে তোমার, কি কষ্ট হচ্ছে?" সে ওর কপালের উপর একটা ছোট্ট চুমো খেল। সাবি বলছে; "এবার দিদিকে আদর কর, কর, কর" ও উন্মত্তের মতো হয়ে উঠেছে। "আঃ সাবি চুপ কর, কি পাগলামি হচ্ছে।" আমি যত থামাতে চাই ও বার বার জেদ করছে, মির্চাও এ সুযোগ ছাড়তে রাজি নয়। "আচ্ছা আচ্ছা করছি" এই বলে ও আমাকে জড়িয়ে ধরে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলল। কিন্তু সাবি সেই মুহূর্তে আবার চিৎকার করতে লাগল "কি করেছ তুমি দিদিকে, কি করেছ।" যত বোঝাই কিচ্ছু না কোথায় কি, এই তো মির্চা তোর পাশে দাঁড়িয়ে আছে তা সে থামবেই না। অনেকক্ষণ গল্প করে ওকে থামাচ্ছি

ভোলাচ্ছি—আর আমার বুকের ভেতর কাঁপতে শুরু করেছে। প্রেমের অমৃতকে ছাপিয়ে ভয়ের বিষ আমার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে গেছে, আমাকে বিষধর ছোবল মেরেছে। আমরা গাড়িতে উঠলাম। মির্চার কোনো চিন্তা ভাবনা নেই। ও কল্পনা করতে পারে নি কি ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে।

বাড়ি এসে পৌঁছলাম। সাবি গাড়িতে চুপ করে ছিল। আমি ভাবছি ও হয় ভুলেই গেছে। অসুস্থ তো। মির্চা গাড়ি থেকে নেমে নিচের ঘরে চলে গেল...আমি উপরে।

এদিক থেকে, ওদিক থেকে বাবা মার গলা পাচ্ছি আর আমার বুকের ভিতর কেঁপে কেঁপে উঠছে। পরে যখন এ সময়ের কথা ভেবেছি, তখন মনে হয়েছে সেদিনের আনন্দের সঙ্গে ভয় কি ওতঃপ্রোত হয়েই না মিশে ছিল, এক মুহূর্তের জন্য ছাড়ে নি, সত্যিই কি আশ্চর্য চোখ-রাঙানো ভয়-দেখানো সমাজে আমরা বাস করতুম।

ঘণ্টাখানেকও হবে না মা এসে আমার ঘরে ঢুকলেন, “রু ছাতে চল।” মার মুখ গম্ভীর, গলা কাঁপছে। আমরা ছাদে এলাম, তারা ভরা ঠাণ্ডা রাত–আমার এখন আর তত ভয় নেই। পারব, আমি হয়ত মার সঙ্গে কথা বলতে পারব।

“সাবির কাছে এ-সব কি শুনলাম রু? আমি তো বিশ্বাস করতে পারছি না।”

ছাদে একটা বড় তক্তপোষ আছে, মা তার উপর বসেছেন–দু'হাত দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে। মার চুল খোলা পড়ে আছে, মুখের উপর চাঁদের আলো পড়েছে। মাকে দেবতার মত দেখাচ্ছে। মার বয়সই বা কত? আমার চেয়ে মাত্র ষোল বছরের বড়। আমরা আস্তে আস্তে বন্ধুর মত হয়ে উঠছি।

মা বললেন, “সব আমাকে খুলে বল।

আমি খাটের উপর উপুড় হয়ে মার পায়ের উপর মাথা রাখলাম–”মা মা মা”

“বল রু বল, তুমি ওকে কি বিয়ে করতে চাও?”

গুরুত্বপূর্ণ সময়েও আমার অনেক সময় লঘু কথা মনে পড়ত – আমি ভাবছি এবার তো আমার নিজ মুখে বলতে হবে যে আমি ওকে বিয়ে করতে চাই, কি লজ্জার কথা ! ছোটবেলার ঘটনার মত হবে। ছোট থেকে শুনে আসছি বিয়ের কথাটাই খুব লজ্জার ব্যাপার, যার বিয়ে সে কোনো কথা বলতে পারে না। মাথা নিচু করে থাকে লজ্জায়। আমি ভাবতুম বিয়ের কথাতেই যখন এত লজ্জা তখন বিয়েটা করে কি করে, লজ্জায় মরে যায় না কেন? তারপর ঠাকুমার সঙ্গে এক বিয়ে বাড়িতে গিয়ে সারাদিন ছিলাম–কনে খুব চটপটে–নিজেই সবাইকে বসাচ্ছে, আপ্যায়ন করছে, আলমারী খুলে গয়না দেখাচ্ছে, লজ্জার চিহ্নমাত্র দেখলুম না। ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, “ঠাকুমা, কনের তো লজ্জা

করছে না?” ঠাকুমাও খুব বিরক্ত, “বেলজ্জা বেহায়া মেয়েমানুষ—” আজ? আজ ঠাকুমা থাকলে?

মা বলছেন, “বল রু বল সত্যি তুমি চাও কিনা। যদি তুমি চাও তাহলে ওরই সঙ্গে নিশ্চয় তোমার বিয়ে দেব। আমি আমার মেয়েকে মনে মনেও দ্বিচারিণী হতে দেব না।” আমি মার পায়ে মাথা রেখে বললুম, “হ্যাঁ মা আমি চাই, চাই আমি। ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।”

“তাই নাকি?” মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন, “আচ্ছা তাই হবে।” আমি অনেকক্ষণ মার কোলে শুয়ে রইলাম, আকাশের নিচে রাত্রের শীতল স্পর্শ মার স্নেহের মতই আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। আমার মন শান্ত, শান্ত। চারদিক কী নীরব প্রগাঢ় শান্তি। আমার এত দিনের এত আশঙ্কা ধুয়ে মুছে গেল এক মুহূর্তে। আমার অনেক আগেই মাকে বলা উচিত ছিল। আমি মাকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছিলাম। মা তো একবারও বললেন না ওকে ভালোবাসা আমার পাপ হয়েছে। আর সাবি যদি সবটা বলেও থাকে তাও তো কিছু বললেন না। অনেকক্ষণ পরে মা বললেন, “তুই তোর ঘরে চলে যা রু। আজ আর নিচে যাসনে। আমি তোর ঘরে খাবার নিয়ে আসব।”

সে রাত্রে ওর সঙ্গে আর দেখা হল না। ও সেদিন পিয়ানোও বাজাল না। নিচে পিয়ানো বাজালে আমি মনে এবং শরীরেও অর্থাৎ আমার চেতনার পর্বে পর্বে মিলনের গভীর আনন্দ অনুভব করতাম। একেক দিন আমার মনে হত—ওর সঙ্গে যদি আমার দেখা নাও হয়—শুধু সুরের মধ্যে ওর অস্তিত্বের খবর ভেসে আসে সেও যথেষ্ট। সেদিন রাতে কেবল মনে হতে লাগল ওকে আমি এত ভয়ের কথা বলেছি কিন্তু আজ বলতে পারলাম না। ‘ভয় নাহি ভয় নাহি।' কাল সকালে মা হয়ত ওকে প্রথম বলবেন। বিনিদ্র চোখে অনেক রাত অবধি আমি বিবাহরাত্রির উৎসবের দিবাস্বপ্ন দেখতে লাগলাম। আমি ওকে দেখছি আলপনা দেওয়া পিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছে—গরদের ধুতি চাদর পরে—চন্দন-

চর্চিত নীল কলেবর, পীত বসনে বনমালী, নীল কলেবর যতই ভালো হোক তার চেয়ে শ্বেত কলেবরই বেশী ভালো। ওকে কি যজ্ঞোপবীত পরান হবে? নাঃ, তা কি করে হবে? আর শুভদৃষ্টির সময়? যখন চাদরটা মাথার উপর দিয়ে দেবে আমাদের তখন শ্রীমতী মালবিকা অর্থাৎ মালাদেবী যিনি হিংসায় মরে যাবেন বা এখনই যাচ্ছেন কারণ তিনি ইতিমধ্যে একবার ঠোঁট বাঁকিয়ে আমাকে বলেছেন, কচ ও দেবযানী অভিনয় কেমন চলছে? তিনি বললেন, এঁচোড়ে পাকা মেয়েটি তো শুভদৃষ্টি আগেই সেরে নিয়েছে। আর রানু, আমার স্কুলের বন্ধু রানু, সে বিস্ফারিত চোখে আমায় বলবে, "তুই শেষ পর্যন্ত লভম্যারেজ করলি, তোর তো খুব সাহস!"

সকলের কথা আমার মনে পড়ছে—মীলু কি বলবে, দিদিমা কি বলবেন, আরাধনা? আমার মনে হচ্ছে সকলেই খুশি হবে। কেউ-ই আমাকে নিন্দে করবে না। সব ছাপিয়ে নিচে ওর ঘুমন্ত মুখটা চোখে ভেসে উঠছে, বেচারা এখনও কিছু জানে না ওর ইচ্ছা পূর্ণ হবে। ও আমাকে এত করে চায়, আমরা কখনো চার-পাঁচ মিনিটের বেশী কাছাকাছি হতেই পারি না, এখন? 'তোমাতে করিব বাস দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাস।' কিন্তু বাবা মাকে ছেড়ে থাকতে পারব ত? তা থাকতে হবেই বা কেন, ও তো এখানেই থাকবে বলেছে। বাঃ, ও যাই বলুক ওদের দেশেও যেতে হবে নিশ্চয়ই, ওর মাকে আমি দেখব না? ওর বোনকে? ওর দেশে যাবার কথায় আমার প্রিনসেপ ঘাটের কথা মনে পড়ল —একবার রবীন্দ্রনাথ বিলেতে যাবেন, তাঁকে বিদায় অভিনন্দন, যাকে বলা হত 'সী অফ করা'র জন্য আমরা গিয়েছিলাম, সে দিনের কথাটা মনে এল, কী রকম প্রকাণ্ড জাহাজ! এবার ভয়-টয় কেটে গেছে, লজ্জা, দারুণ লজ্জায় আমার ক;ান ঝাঁ ঝাঁ করছে—তাঁকে তো বলতে হবে, কে বলবে? আমিই বলব। কখন? যখন উনি কলকাতায় আসবেন! প্রায় এক বছর উনি বিদেশে।

রাত্রি গভীর হচ্ছে, আধো ঘুমে আধো জাগায় আমি স্ট্র্যাথেয়ার্ড জাহাজটাকে দেখতে পাচ্ছি, দু'ধারে তটরেখার ভিতর দিয়ে সরু জলপথে এগিয়ে চলেছে দুলে দুলে– এটা সুয়েজ ক্যানাল–ওধারে ভূমধ্যসাগরের নীল জলরাশি, সেদিকে যেতে যেতে জাহাজটা ময়ূরপঙ্খী হয়ে গেছে।

পরের দিন মার মুখ দেখে আমার বুক কেঁপে উঠল। মার চোখ ফোলা স্বর গম্ভীর। মা কি সারারাত ঘুমোন নি?

"রু তুমি আজ নিচে নেমো না, তোমার ঘরেই থাক, কারু সঙ্গে কথা বোলো না–শান্তি, ছুটকি কারু সঙ্গেই নয়। আমি আসছি একটু পরে।"

আমি স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে রইলাম–কি হল আবার?

আমার হাত পা ঝিম ঝিম করতে লাগল, দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব, আমি রাত্রের বিছানাতেই আবার শুয়ে পড়লাম।

কিছুক্ষণ বাদে মা এক গ্লাস দুধ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

"এটা খেয়ে নাও। তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

আমি দুধ খেতে ভালোবাসি না, একেবারে নয়। কিন্তু এখন বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলাম। মা আমার পাশে খাটে বসে খুব কঠিন স্বরে আমাকে বললেন, "তোমার বাবা আমাকে খুব ভালো করে খোঁজ নিতে বলছেন তোমরা কতদূর পর্যন্ত গিয়েছ?"

আমি চুপ করে আছি। আমি ভাবছি সাবি বা শান্তি কেউই বানিয়ে মিছে কথা বলবে না! শান্তি যদিও বানিয়ে গল্প করতে পারে–সাবি কখনো বলবে না। আমরা ভাইবোনেরা মিছে কথা বলি না। মা বলে দিয়েছেন–'যদি দণ্ড সহিতে হয়, তবু মিথ্যা বাক্য নয়।' আমরা তো দূরে কোথাও যাই নি ওখানেই ছিলাম। মা আবার বললেন, "বল বল কথার উত্তর দাও, কতদূর পর্যন্ত গেছ তোমরা?" মার প্রশ্ন আমার ঠিকমতো হৃদয়ঙ্গম হয়নি–আমি বললাম, "তুমি ওদের জিজ্ঞাসা কর না লেকের থেকে অন্য কোথাও দূরে যাইনি আমরা।" মা নিশ্চিন্ত হলেন। আমার অজ্ঞতায় খুশি হলেন।

অনেকক্ষণ আমরা চুপ করে আছি। নিচে বাচ্চাদের কোলাহল শোনা যাচ্ছে। জাগ্রত বাড়িতে রোজকার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু হয়েছে—কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের যেন কোনো যোগ নেই—এই মুহূর্তে আমি আর মা যেন অনেক দূরে অন্য জগতে অন্য কোনো সময়ে চলে গেছি। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ পরে মা বললেন, "রু সত্যি কথা বল, মির্চা তোমায় কি কি করেছে ?" আমি বালিশে মুখ গুঁজলাম। আমি এসব প্রশ্নের উত্তর দেব না, কিছুতে না, নয়ত মিথ্যা কথা বলব। কি করে আমি সত্য কথা বলব ? তাহলে সব তো ওর দোষ হবে। শুধু ওরই কি দোষ? আমার দোষও কম নয়, একটুও কম নয়, ওর এখানে মা নেই বাবা নেই কেউ নেই, পরের বাড়িতে আছে। এখানে আমার বাবাই ওর সব, এখন তিনিও যদি বিরূপ হয়ে যান ও কোথায় যাবে?

মা বললেন, "রু ওঠ, মুখ তোলো, আমার দিকে তাকাও।" মার স্বর কঠিন, স্নেহলেশশূন্য । আমি মুখ তুলেছি কিন্তু মার দিকে তাকাতে পারছি না, মার চোখে চোখ রেখে মিথ্যা কথা বলা! আমার মুখ শুকিয়ে গেছে, গলা শুকিয়ে গেছে, কথা বলতে পারছি না। অত সুন্দর জিনিস পাবার জন্য এত নিচে নামতে হবে কেন?

"তুমি কথা বলছ না কেন রু, তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছই বা না কেন? তোমার মুখ এমন কাল হয়ে গেছে কেন? কোথায় আমার তেজস্বিনী সত্যবাদিনী মেয়ে যে মিথ্যার সঙ্গে কখনো আপস করে না? আজ তার এ'দশা কেন? ছিঃ অপরাধের ভারে তোমার মাথা নিচু হয়ে গেছে এও আমায় দেখতে হল!" মার গলা ধরে এসেছে। আমি জানি মা যা বলছেন তা সত্য কিন্তু যত অন্যায়ই হোক আমি মিথ্যা কথাই বলব। ওকে কখনো বিপদে ফেলব না।

"বল রু, ও তোমাকে চুমো খেয়েছে?"

"হ্যাঁ"

"কোথায়?"

এইবার মনে পড়ে গেছে, একটা নিরাপদ উত্তর দিতে হবে—

“কপালে—”

“শুধু এই?”

“হ্যাঁ

‘তোমরা কোনো গন্ধর্ব বিবাহটিবাহ কর নি তো?”

‘সে আবার কি?”

‘কেন গন্ধর্ববিবাহ কি তুমি জান না? মালা বদল, আংটি বদল বা ঐ রকম কিছু ?”

“না মা, ও সব কথা আমাদের মনেই হয়নি।” পরে বুঝতে পেরেছি মা ভাবছিলেন ও রকম একটা কিছু হয়ে থাকলে মার পক্ষে আমাদের সাহায্য করা সহজ হবে। “দেখ রু, আমি তোমাকে যা বলেছিলাম, তা পারলাম না, তোমার বাবা কিছুতে রাজী হলেন না।”

আমি কাঁপছি—মা আমার গায়ের উপর হাত রাখলেন—”শান্ত হও।”

“কেন মা? কেন মা?”

‘তোমার বাবা বলেছেন ওদের আমরা কিছু জানি না—ওদের বংশ জানি না, ওর বাপ কেমন ঠাকুর্দা কেমন কে জানে? ওর হয়তো কোনো খারাপ অসুখও থাকতে পারে।” আমি অবাক হয়ে গেছি, এ আবার কি অদ্ভুত কথা—”মা আজ প্রায় এক বছর ও আমাদের এখানে আছে একদিনের জন্য জ্বর পর্যন্ত হয়নি। ওর অসুখ হবে কেন?”

“সে অসুখ নয়, সে সব অনেক কথা ও তোমার দরকার নেই জেনে। তুমি তো জান না ফরাসীরা কি রকম খারাপ লোক হয়, একেবারে অসভ্য।”

“কিন্তু ও তো ফরাসী নয়—”

“ওই একই হল—ওদের সভ্যতাটা ফরাসী সভ্যতা।”

“ফরাসী সভ্যতা খারাপ হবে কেন? সমস্ত ইয়োরোপই তো ফরাসীদের অনুকরণ করে।”

“করে! করে কি উন্নতি হয়েছে?”

"ইয়োরোপের উন্নতি হয় নি?"

"আরে সে কথা নয়– -ওদের জীবনটা কি তা তো তুই জানিস না। বড় হলে মোপাসাঁর গল্পগুলি পড়লে বুঝতে পারবি। স্বামী-স্ত্রী তে বিশ্বস্ততা নেই–এ ওকে ক্রমাগত ঠকাচ্ছে–একজনকে বিয়ে করছে আর একজনের সঙ্গে চলে যাচ্ছে, ওরকম একটা বিশ্রী সমাজে তুই বাঁচতে পারবি না।"

"আমি মোপাসার গল্প পড়েছি 'নেকলেস', কিছুই খারাপ না।

"আরে না না, কত গল্প আছে–আর তোর বাবা যা সব বললেন, ভয়ে আমার হাত পা গুটিয়ে যায়। এ কখনো ভালো হবে না রু।"

"মা মা মাগো।"

"কি করব রু–উনি বলেছেন এ বিষয়ে আমি যদি জোর করি তাহলে উনি মরে যাবেন। তুমি ওঁকে মেরে ফেলতে চাও? তুমি ওঁকে একটুও ভালোবাস না? ঐ ছেলেটাই তোমার অত আপন হল?"

আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, আমার মনে বাবার অসুখের কথায় কোনো দুশ্চিন্তা আসছে না–বরং রাগ হচ্ছে–এই অসুখের ভয় দেখিয়েই মাকে উনি সর্বদা নিজের মতে নিয়ে আসেন। আর কি কারু ব্লাডপ্রেসার হতে পারে না? আমার কেন ব্লাডপ্রেসার হয় না? হে ভগবান আমার এখুনি ব্লাডপ্রেসার হোক। মা বলছেন "রু তুমি যদি এ নিয়ে বাড়াবাড়ি কর তাহলে ওর স্ট্রোক হয়ে যেতে পারে। সেটা কি তুমি চাও ? নিজেকে সামলে নাও, যা চাওয়া যায় তার সব কি পাওয়া যায় ?"

জানি না আমার-ঘণ্টা মিনিট কোথা দিয়ে কেমন করে কাটল। দুপুরবেলা মা এলেন, "রু ওঠ, মির্চা চলে যাচ্ছে, ও বলেছে যাবার আগে ও তোকে একটি বার দেখতে চায়।" আমি উঠতে পারছি না, আমার শরীরের সমস্ত হাড় যেন গুঁড়ো হয়ে গেছে–আমি কি করে উঠে দাঁড়াব?

"রু ওঠ ওঠ, ও নিচে রোদে দাঁড়িয়ে আছে—তুই ওপরের বারান্দায় দাঁড়াবি—তোর বাবা রাজি হয়েছেন, ও শুধু তোকে একবার দেখেই চলে যাবে।"

এই উনিশ শ' বাহাত্তর সালে যখন আমি আবার উনিশ শ' ত্রিশ সালে প্রবেশ করলাম তখন আবার ঠিক সেই আঠারই সেপ্টেম্বরের অবস্থা হল! আবার আমার হাড় গুঁড়িয়ে গেল, বুকে মোচড় দিতে লাগল— কী আশ্চর্য আমি জানতামই না তেতাল্লিশ বছর ধরে আমার সত্তার একটা অংশ উনিশ শ' ত্রিশ সালেই স্থির দাঁড়িয়ে আছে—'অজঃ নিত্য শাশ্বতোহয়ং পুরানো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'—আজ সে শরীর নেই কিন্তু সে আছে, সেই আছে, সে অমৃতা।

আমি বারান্দার মাঝখানের ফাঁকটার কাছে দাঁড়িয়েছি, ও নিচে দাঁড়িয়েছে মাধবীলতাটার অল্প ছায়া ওর মুখের উপর পড়েছে—সেই যন্ত্রণাকাতর মুখ আমার দিকে তুলে আছে—মনে হচ্ছে ওকে যেন কেউ আগুনের শলা দিয়ে বিঁধছে। আমি আজ পর্যন্ত কারু মুখে অমন যন্ত্রণার চিহ্ন দেখি নি। ও হাত তুলে আমায় নমস্কার করল— "বিদায়—"

"না, না, মির্চা না"—আর ঠিক সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম, ওকে তো বলা হল না, কতবার ভেবেছি এইবারে বলব কিন্তু বলাই হল না। আর কোনও দিনও বলা হবে না।...

তারপর আমার কিছু স্পষ্ট মনে পড়ে না—আমার ধারণা মা আমাকে শুইয়ে দিয়েছিলেন। পরে শুনেছি আমি পড়ে গিয়েছিলাম। আশ্চর্য নয়। আমার হাড়গুলোই যে নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। যখন আমার জ্ঞান হল, দেখি আমার ঘরের পাশের সরু বারান্দা যেটা মির্চার ঘরের সামনের সরু গলির উপর সেখানে শুয়ে আছি—মা আমার মাথায় জল দিচ্ছেন আর তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে, তিনি বলছেন, "দুর্গা শ্রীহরি, দুর্গা শ্রীহরি—কি করি আমি, কি করি এখন?"

মির্চা চলে গেছে—কোথায় গেল কে জানে? কে আমাকে বলবে ? আমার সঙ্গে কারু দেখা হচ্ছে না—মা আমাকে বেরুতে দিচ্ছেন না, আমার শোকাহত মূর্তিটা সকলের সামনে থেকে আড়াল করে রাখতে চান—লোকে যে হাসবে। আমি শরবৎ ছাড়া কিছু খাই না, খাওয়া অসম্ভব। মা তো ছোটখাট ডাক্তার বললেই হয়, মাও জোর করেন না। মা বলেন—দুঃখ শোক রাগ এর যে কোন অবস্থায়ই শরীরে বিষ হয়। তখন জলীয় কিছু খেলেই যথেষ্ট। মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছে হয় সাবিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করি যাবার সময় ওকে কিছু বলে গেছে কিনা। আবার ভাবি, না থাক, ও ছেলেমানুষ, ওর সামনে এই যে কাণ্ডটা হল এটাই যথেষ্ট অন্যায় হয়েছে, এ রকমটা না হওয়াই উচিত ছিল। তা ছাড়া ওকে আর বলবেই বা কি?

পরে শুনেছি ও বলেছিল—"কি করলে সাবি, এ কি করলে?" সাবি বেচারা কেঁদে কেঁদে বলেছে—"আমি বুঝতে পারি নি ইউক্লিডদা, আমি বুঝতে পারি নি। তোমার এত কষ্ট হবে, দিদির এত কষ্ট হবে।"

ক'দিন পরে কি জানি—একটা সন্ধ্যা দেখতে পাচ্ছি—বাইরে তখনও ম্লান আলো আছে—ঘরের ভিতর অন্ধকার—এককোণে নীল বাতি——ঢাকনা পরান——বেশির ভাগ দরজা বন্ধ। আমাকে বন্দী করা হয় নি, লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা হয়েছে, হঠাৎ দরজা ফাঁক করে একজন কে ঢুকল—তার কথাগুলো মনে আছে, কিন্তু তার মুখটা আমি দেখতে পাচ্ছি না! তার শাড়ির বেড় দেওয়া পা দুটো আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে আসছে, সে কে? কাকীমা, না শান্তি, না চাঁপা পিসি, না অন্য কেউ? সে আমার বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল—"দেখো রু, পালাবার চেষ্টা করো না। জেনো তুমি এখনও নাবালিকা--তুমি যদি পালাও, তোমাকে তো ধরে আনা হবেই— অবশ্য তোমার আর কোন ক্ষতি হবে না, কিন্তু ওকে জেলে দেওয়া হবে। সে কোনো ভদ্রলোকের জেল নয়, চোর ডাকাতের সঙ্গে থাকতে হবে। হাফ প্যান্ট পরিয়ে ওকে দিয়ে পাথর ভাঙাবে।"

"কেন তোমরা আমাকে শাসাচ্ছ"—আমি বালিশে মুখ গুঁজে আছি, কি নিরুপায় আমি কি নিরুপায়—"আমি কি কোথাও যাচ্ছি? আমি তো এই ঘরে একলা পড়ে আছি—এত বাক্যযন্ত্রণার দরকার কি?"

"তোমার ভালোর জন্যই বলছি।"

বেশ দু'একটা দিন কেটে গেছে। আমার সবচেয়ে কষ্ট এই, ওকে কোনো কথা বলা হল না। কত কথা বলার ছিল, এ জীবনে আর বলা হবে না। যাবার আগে যদি একটা ঘণ্টাও একলা কথা বলতে পারতাম। যতদিন ছিল শুধু কষ্টই দিয়েছি ওকে, আর কিছু না, আর কিছু না—

এখন ভোরবেলা দরজাটা একটু ফাঁক হল, খোকা ঘরে ঢুকল, ঢুকেই ওর স্বভাবসিদ্ধ ভাঁড়ামি শুরু করেছে—"এ্যাঃ পড়ে পড়ে কান্না, ধিক্ ধিক্ কোথা হতে এলে তুমি নির্মম পথিক্..." ও বিদায়-অভিশাপ থেকে দেবযানীর বক্তব্য আওড়াচ্ছে—"ওঠো, মির্চা তোমার একখানা বই চেয়েছে, ওর কাছে নেই।"

"তুমি জানো সে কোথায় গেছে?"

"জানি বইকি, সেই রিপন স্ট্রীটে।"

"সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের বাড়িতে?" হায় কপাল! ও যে ওদের একেবারে ঘৃণা করে, ওদের ওখানে থাকতে ভালোবাসে না—ওখানকার মেয়েগুলো ভালো না রে..."

"তা যাবে কোথায় ? একদিনের মধ্যে তাড়িয়ে দিলে এই বিদেশে বেচারা যাবে কোথায় ?"

"ও খোকা ভাই-ওরে খোকা রে—কি করি ভাই এখন...?"

"চুপ চুপ চুপ" ও মুখে তর্জনী ঠেকিয়ে ভঙ্গিমা করে ঘুরে নিল এক পাক —"চারিদিকে স্পাই—আমি পালাব—শীঘ্র বই বার কর আমি বারান্দায় দাঁড়াই।"

আমি বইটা বের করে বারান্দায় এলাম...তখনই আমার মনে হল ওকে সাবধান করে দিই—বাবা যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহলে কিছু যেন স্বীকার না করে—

ও তো জানেই না যে অন্যায় কাজ করেছে তাই- বলে ফেলতেও পারে—আমি বইটার পিছনের পাতা খুলে লিখতে গেলাম—আমার হাত কেঁপে গেল, লাইন বেঁকে গেল, আমি একটা মিথ্যা কথাকে প্রেমের মূল্যে অক্ষয় করে দিলাম সেকথা জানতেও পারলাম না – Mircea Mircea Mircea I have told my mother that you have kissed me only on my forehead.

"খোকা ভাই আমি একটা চিঠিও দেব। নিয়ে যাও, উত্তর নিয়ে এস।" "তাড়াতাড়ি কর—মামা টের পেলে এই মুহূর্তে বিদায় করে দেবেন আমাকে।"

আমি ছোট্ট একটা কাগজ নিয়ে চিঠি লিখতে বসলাম। কি লিখব? কত কিছু লেখার ছিল মনে পড়ছে না। থাক। দুটোই কথা আছে খুব জোরের সঙ্গে বলতে হবে। মনে একান্ত বিশ্বাস নিয়ে এ সত্য আমি রাখবই রাখবই...আমি লিখলাম, তোমাকে কখনও ভুলব না 'I shall never forget you never forget you, never forget you' আর লিখলাম তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করব — I shall wait for you, wait for you.' লাইনের পর লাইন একই কথা লিখে কাগজটা ভরিয়ে আমি খোকাকে দিলাম—

"খোকা এই চিঠি ওকে দাও তারপর যা হয় করা যাবে।"

আমার অনেক চুল এই ক'দিনে জটা হয়ে গেছে। আমি মাকে ছুঁতে দিই নি। মার সঙ্গে সর্বদা খিটিমিটি করছি, মা সমস্ত সহ্য করছেন। আমি চিঠিটা ওকে দিয়ে ঘরে এসে আবার শুয়ে পড়লাম। আমার দীর্ঘ কেশভার ঝুলিয়ে দিয়ে চোখের উপর বাহু ঢাকা দিয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করতে লাগলাম—"ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না।" মনের উপর তো বাবার হাত নেই—সেই প্রতিজ্ঞা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আমার অগোচরে নামতে লাগল—পা ফেলে সন্তর্পণে নিচে বহু নিচে মনের অতলে যেখানে বাইরের জগতের যাতায়াত নেই, যেখানে দিন রাত্রি পৌঁছয় না, যেখানে সকাল সন্ধ্যা নেই, যেখানে সূর্য ওঠে না, চন্দ্র তারা জ্বলে

না, সেইখানে নেমে গিয়ে মহাযোগনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়ল—তখন কে জানত তেতাল্লিশ বছর পরে তার ঘুম ভাঙবে?"

দুতিন দিন কেটে গেল খোকার আর দেখা নেই—শেষটায় একদিন ওকে ধরলাম, "কি হল? আমার বই আর চিঠিটা দিয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

"তারপর?"

"তারপর আর কি?"

"তারপর আর কি মানে? ও কিছু বলল না ?"

"না তো।"

"না তো! তুমি আজই একবার যাও ভাই, বল তাকে আমি উত্তর চাই।" "সে তো ওখানে নেই, তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, ওদের বাড়িতে বললে সে সেখানে নেই।"

"ও মা। সে কি কথা! এতদিন আমায় বল নি কেন?"

"বললে তুমি কি করবে? ও যদি জলেই ঝাঁপ দেয় তোমার কিছু করবার আছে ?"

"ও খোকা, ভাই তুমি কিছু কর লক্ষ্মীটি, তোমার পায়ে ধরছি ওর খবরটা আমাকে এনে দাও—"

"আচ্ছা আচ্ছা", খোকা পালিয়ে গেল—

সকাল হচ্ছে, রাত্রি আসছে, কী অমোঘ নিয়মে চাকা ঘুরছে। সেই ঘূর্ণমান চক্র আমাদের ভিতরে সুখ দুঃখ, শোক আনন্দকে পরিসুত করে এক ভাবকে অন্য ভাবে পরিণত করছে। মা বলেন, শোকের দাহ থাকে প্রথম তিন দিন, তখন আগুনে পোড়ায়, তারপর আস্তে আস্তে কমে আসে। মাতা পুত্রশোক ভোলে — বিধবা উঠে দাঁড়ায়। ক্ষয় হচ্ছে প্রতিদিন আবার ক্ষতিপূরণও হচ্ছে। সবাই জানে একথা, কানে শুনে কিংবা বইয়ে পড়ে- -সে জানা জানাই নয়,

এই দুঃখদহন আমাকে শেখাচ্ছে কি করে সত্যকে জানতে হয়। আমি ভেবেছিলাম চুল কেটে ফেলব—পারি নি- -এখন আর ইচ্ছেও নেই। আমার অন্য মন বলছে চুল কেটে কি হবে, বিশ্রী দেখাবে। এটাই তো জীবনলিপ্সা। আমি তা জানি।

মা আমার কাছে বসে নানা গল্প করছেন— কাকা কি রকম খারাপ ব্যবহার শুরু করেছে, ওরা অন্য বাড়িতে চলে যাবে! বৌটি সুবিধের নয়। বাপের বাড়ি গিয়ে বাবার নামে মার নামে লাগাচ্ছে। আমার নামেও। আমি কিছু শুনছি না— বালিশে মুখ গুঁজে আছি। এসব কথা শুনে কি হবে ? এরা যা খুশি করুক। এ সংসার আমার কাছে নিতান্ত পর হয়ে গেছে।

মা আঙ্গুল চালিয়ে চালিয়ে আমার চুলের জট ছাড়িয়ে দিয়েছেন, চুলে বিনুনী করে দিয়েছেন, মা আস্তে আস্তে বলছেন, "রু দুঃখ পাওয়াটারও দাম আছে— সব জ্ঞানীগুণীরাই তাই বলে গেছেন, তুমি ভগবানকে ডাক, তিনিই তোমার মন ঠিক করে দেবেন। শান্ত করে দেবেন। দুঃখ পেলেই তবে মানুষ তাঁর শরণাগত হয়, অমনি তো হয় না—'বাণ খেয়ে যে পড়ে, সে যে ধরে তোমার চরণকে'।"

মা ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে চলে গেলেন – গানের কলিগুলি ঘুরে ফিরে মনের মধ্যে আসছে কিন্তু আমার আচ্ছন্ন আবিষ্ট মনে তার অর্থবোধ হচ্ছে না। 'আরামে যার আঘাত ঢাকা, কলঙ্ক যার সুগন্ধ', 'কলঙ্ক যার সুগন্ধ' আমার কলঙ্ক হয়েছে? নিশ্চয়। পাশের বাড়ির বৈদ্যনাথবাবু বলেছেন, "এই সব বড় ঘরের কীর্তি! বাড়ির মধ্যে একটা খেস্টান ছোঁড়াকে রেখে ঢলাঢলি ব্যাপার।" বাবা ভীষণ রেগে গেছেন, এ বাড়ি আমরা ছেড়ে দেব। এ অসভ্য পাড়ায় আর থেকে দরকার নেই। সবাই নিন্দা করছে...আমার আচ্ছন্ন মন অদ্ভুত তন্দ্রায় জড়িয়ে আসছে—'কলঙ্ক যার সুগন্ধ',... 'ধরে তোমার চরণকে'.......'দেহি পদপল্লবম্'...'দেহি মুখকমলমধুপানম্'...ধরে তোমার চরণকে...ধরে

তোমার চরণকে—গানের কলিগুলি পিনাকীর হাতের পিনাক হয়ে গেছে, সোজা এসে আমার মাথার মধ্যে লাগছে তার টঙ্কার——ঝনননন, ঝনননন, তোমার চরণকে...আমি বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছি, হঠাৎ আমি খাট থেকে পড়ে গেলাম।

সেদিন যখন আমার জ্ঞান ফিরে এল ঘরের মধ্যে সবাইকে দেখলাম, বাবাকেও। মির্চা চলে যাবার পর এই আমার বাবার সঙ্গে সামনাসামনি দেখা। বাবা মাকে বলছেন— "দুধের সঙ্গে একটু ব্রাণ্ডি খাইয়ে দাও।"

"কালকে শ্যামাদাস কবিরাজকে ডাক—"

কাকা কতকগুলো কড়া কড়া কথা বলে ঘর থেকে চলে গেল। এই প্রথম আমি তাঁকে বাবার সামনে, উদ্ধত হতে দেখলাম। আমার কাকার উপর রাগ হচ্ছে। আস্পর্ধা দেখ, বাবাকে ওরকম বলবে—বাবা ওঁকে মানুষ করেছেন না ! আমি নির্বাক তাকিয়ে আছি—ঘরে দুটো আলো জ্বলছে কিন্তু মানুষগুলো যেন অন্ধকারে ছায়ামূর্তি—এমন কি বাবাও—বাবার ছায়াটা আমার বইয়ের তাকের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বাবা খুঁজে খুঁজে বই বার করছেন। প্রথম বইটা একটা জাপানী রূপকথার বই, উজ্জ্বল নীল কাপড়ে বাঁধান তার উপর সোনালী রঙের ছাপ দেওয়া একটা অদ্ভুত জানোয়ারের ছবি। বাবা আস্তে আস্তে পাতা খুলে উপহারের পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ফেললেন। ঐ বই ও আমাকে দিয়েছিল। তারপর 'হাঙ্গার' বইটার থেকেও ছিঁড়লেন। একটা একটা করে বই বের করছেন আর উপহারের পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ফেলছেন——গ্যেটের জীবনীখানা বের করে উপহারের লেখাটা খুঁজে পেলেন না—ওটা প্রথম পাতাতেই ছিল, মলাটের সঙ্গে লেগে রইল। ঐটুকুই ওর হাতের লেখা এবং একমাত্র চিহ্ন সারাজীবন আমার সঙ্গে আছে আর কিছু নয়—একখানা ছবি পর্যন্ত নয়!

বাবা আস্তে আস্তে কাগজগুলো কুচি কুচি করে জানালা দিয়ে নিচে ফেলে দিলেন—অন্য বাড়ি হলে হয়ত বইগুলোই নষ্ট করা হত। এ বাড়িতে তা হতে

পারে না—এ বাড়িতেও চেঙ্গিস খাঁ আছেন কিন্তু তিনি বই নষ্ট করতে পারেন না—মানুষ পোড়াতে পারেন—কিন্তু বই নয়—বই তাঁর ঈশ্বর।

মধুপুরে বাবার বন্ধু সপরিবারে যাচ্ছেন পূজার ছুটিতে—আমাদেরও হাওয়া বদলান দরকার—বাবা বলছেন নূতন জায়গায় গেলে শরীর মন ভালো হবে।

মন কিন্তু আমার ক্রমে খারাপ হচ্ছে-~-অন্য সব কারণ ছাপিয়ে একটা কথা তীক্ষ্ণ ছুরির ধারের মত আমার বুকের ভিতরটা খুঁচিয়ে দগদগে করে ফেলেছে— একবার যদি ওকে জিজ্ঞাসা করতে পারতাম – চিঠির উত্তর দাও না কেন? কিন্তু কি করে হবে? কে আমাকে রিপন স্ট্রীটে নিয়ে যাবে? আমি কলকাতার রাস্তা চিনি না যে তা নয়, কিন্তু একা বেরুনো তো অসম্ভব এবং বিপজ্জনক। একলা কলকাতার রাস্তায় আমি কখনো হাঁটি নি। ড্রাইভারটাকে পাঠান যায় কিন্তু ও লোকটাকে ভালো লাগছে না—ওর চোখ দুটো শ্বাপদের মতো, ও আমাদের লক্ষ্য করে। ওকে তাই আমার ভয় করে।

খোকা তো আর আসেই না।

আমরা যেদিন মধুপুরে যাব সেদিন সে এল। আমাদের সঙ্গে স্টেশনে যাবে। জিনিসপত্র তুলতে সাহায্য করবে।

আমি ওকে একটু একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"খোকা তুমি আর আস না কেন ভাই? অন্তত তোমার সঙ্গে একটু ওর কথা তো বলতে পারি।"

খোকা নীরব। "কেন আস না, বল না?"

"আমি তোমার এত কষ্ট দেখতে পারি না রু; মানুষের তো সহ্যশক্তির একটা সীমা আছে।"

"কিন্তু তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলে আমার কষ্ট তো কমে। ও কি করছে এখন ?"

"ও তো এখানে নেই, হিমালয়ে চলে গেছে।"

"হিমালয়ে! দার্জিলিং বল?"

"না না হিমালয়ে, দার্জিলিং নয় ঋষিকেশ~~ও সন্ন্যাসী হয়ে গেছে।"
"সন্ন্যাসী হয়েছে? সে আবার কি? সন্ন্যাসী হওয়া কাকে বলে ? তাই জন্যই কি চিঠির উত্তর দিচ্ছে না?"

ট্রেনে উঠে আমি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছি। এই অদ্ভুত খবরটার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না। কোথায় আমায় চিঠি লিখবে—একটা পরামর্শ করবে—তা নয় হিমালয় চলে গেল। আমি কাঁদছি। বাবা মা দুজনেই বুঝতে পারছেন আমি কাঁদছি। নিজেরা আস্তে আস্তে কথা বলছেন— ভাইবোনদের খাওয়াচ্ছেন শোয়াচ্ছেন, অবশ্য এ সব কাজ মা একলাই করছেন—বাবা তো একেবারে শিশু, জীবনে বোধহয় নিজে এক গ্লাস জলও গড়িয়ে খান নি। কাঁদতে কাঁদতে আস্তে আস্তে আমার চোখের জল শুকিয়ে গেছে—যন্ত্রণা কমে এসেছে—দুঃখদহনের একটা অলৌকিক তৃপ্তি আছে তা আমার মনকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলছে—আমি সেই স্তিমিত জগতে হঠাৎ শুনতে পেলাম বাবা মাকে বলছেন, "ওর দিকের জানালাগুলো বন্ধ করে দাও, যদি লাফ দিয়ে পড়ে।" তখন জানালায় রেলিং থাকত না। আমি মনে মনে ভাবছি অমন কাজ কখনো করব না—জীবন সুন্দর ও দুঃখও সুন্দর—এই জীবন আলোর মত জ্বলবে—'বিরহানলে জ্বালোরে তারে জ্বালো'—এইবার এই গানটার অর্থ বুঝতে পেরেছি।

মধুপুরের বাড়িটা সুন্দর, চারদিকে খোলা প্রকৃতি, এখানে এসে শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। ওরও হয়ত হিমালয়ে গিয়ে ভালই লাগছে। প্রকৃতি আমাদের সেবা করে নিঃশব্দে—প্রকৃতি মার মতো। আমার সঙ্গে মাও আছেন। ওর কেউ নেই, ও একেবারে একা। একদিন পুকুরের ঘাটে বসে মা আমাকে আস্তে আস্তে বললেন —"মনটাকে ঠিক করে নাও রু—ওর সঙ্গে তোমার আর কোনো দিনও দেখা হবে না।"

"কেন মা, কেন মা?"

"তোমার নিষ্ঠুর বাবা ওকে দিয়ে ভীষণ করে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন যে তোমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবে না।"

আমি তো মিশনারীদের স্কুলে পড়েছি—'নান'-দের 'ভাউ' নেবার কথা শুনেছি, আমার তাই হাসি পেল—"ও প্রতিজ্ঞা রাখবে কেন? ও কি 'নান' নাকি?"

কিন্তু কোনোদিনও দেখা হবে না, কথাটা মনের ভিতর ঘুরতেই লাগল একটা দীর্ঘশ্বাসকে পাক দিয়ে দিয়ে– যার নাম হাহাকার –

আমরা মধুপুরে থাকতে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের গল্প খুব হত, সম্ভবত সেই সময়ে ঘটনাটা ঘটল, তাছাড়া যাঁদের বাড়িতে ছিলাম তাঁরা এবং আমরাও ঐ ঘটনার স্থানটির সঙ্গে এবং পাত্রদের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। যে পাহাড়তলীতে যুদ্ধটা হল সে আমাদের চেনা জায়গা—ঐ সব ছেলেরা আমাদের বয়সী। তাই তাদের এই অসম সাহসে আমরা গর্বিত। বাবা যখন বলতে লাগলেন এরকম পাগলামির কোনো অর্থ হয় না, তখন আমরা খুব তর্ক করলাম। এর ফলাফলে স্বাধীনতা কতটা এগুবে তা কে জানে কিন্তু ওরা নিজেরা তো এগোল, এত বড় একটা কাজ করাই কি কম কথা? আমি ভাবছি এরকম একটা বড় কাজের মধ্যে যদি আমি যেতে পারতাম তাহলে আমার দুঃখটা নিশ্চয় চলে যেত। কিন্তু আমার যে কোনো উপায় নেই নিজের কোনো পথ খুঁজে নেবার। ওরা দেশকে স্বাধীন করতে চায়, মানুষকে স্বাধীন করবে কে? আমাকে, আমার মাকে? পুকুরের ধারে বসে আমি ভাবতাম যদি কোনোদিন সুযোগ পাই এই সমাজের সব সঙ্কীর্ণ নিয়:;মগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। আমি না হয় ছোট, মার পরাধীনতাই আমার খারাপ লাগছে বেশি। নিজের মেয়ের সম্বন্ধে তাঁর কোনো অধিকার নেই। আমি জানি মার কতটা খারাপ লেগেছে। মা এই প্রেমকে সম্মান করছেন কিন্তু তাঁর উপায় নেই।

আমি যখন উনিশ শ' ত্রিশ সালের কথা ভাবি তখন জানি বলেই ঐ বিশেষ বছরটা চিহ্নিত করতে পারি, নৈলে আমার অনুভূতিতে সাল তারিখ নেই। দিন বছর মাস সব অর্থহীন, আকাশে যেমন দিকচিহ্ন নেই, সীমাবদ্ধ পৃথিবীকে দিয়েই দিকের অর্থ বুঝতে হয়, তেমনি মহাকালে প্রবিষ্ট যে সব অনুভূতি তারও সন তারিখ, সকাল সন্ধ্যা নেই। তার বিপুল ব্যাপ্তি নিয়ে সে তখন ক্ষণকালিক

উপস্থিতিকে অতিক্রম করে যায়, তখন দূরেও যা কাছেও তা। চলাও যা, না চলাও তাই—তদ্দূরে তদ্বন্তিকে তদেজতি তন্নৈজতি।

আমি তাই ঠিক বলতে পারব না সেটা কবে এবং কোনদিন, মধুপুরে যাবার আগে কি পরে—কারণ আমি যেন একটা পড়া বইয়ের পাতা উল্টাতে গিয়ে যে ঘটনাটা পাতার ডান দিকে দেখব ভেবেছিলাম সেটা বাঁয়ে দেখেছি। এরকম তো হয়।

আমার ঘরে আমি শুয়ে আছি। মা বসে বসে গল্প করছেন, গল্পের বিষয়বস্তু বাবার অসুখ। বাবার অসুখটা যে কত সাংঘাতিক তাই বলে মা আমার মনটাকে তাঁর প্রতি অনুকূল করতে চাইছেন। বাবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা একটুও কমে নি, ভালোবাসা তো নয়ই। তবু বাবার অসুখ নিয়ে মা এত ব্যস্ত কিন্তু মার অসুখ হলে বাবাও গ্রাহ্য করেন না, মাও না, এটা কি রকম? কাজেই আমি মার কথায় সায় দিচ্ছি না। মা আমার বিমুখ মনের ভাব বুঝতে পেরে বিপন্ন বোধ করছেন, এমন সময় বাবার পায়ের শব্দ শোনা গেল, তিনি দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। বাবার চোখ খুব বড় বড়, খড়্‌গনাসা, রং উজ্জ্বল তাম্রবর্ণ, রাগ হলে তা লাল হয়ে যায় আরো বেশি। এখন বাবার মুখ লাল।

"এই রকম করে পড়ে পড়ে কাঁদলেই চলবে? পরীক্ষা দেওয়া হবে না? ছুটকি পর্যন্ত পরীক্ষা দিচ্ছে। আশ্চর্য ব্যাপার! এত শোকের হয়েছেটা কি!" বাবা খুব জোরে জোরে বকছেন রীতিমত চীৎকার করে।

মা তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন। দরজার কাছ থেকে বাবাকে সরিয়ে বন্ধ দরজার দিকে নিয়ে গেলেন। ও দরজাটাও বন্ধ নয়, একটু ফাঁক আছে—আমি সব শুনতে পাচ্ছি। কারণ আমি উৎকর্ণ। মা বলছেন, "সব কিছু নিয়ে কি জবরদস্তি করা যায়? নিষ্ঠুরতার একটা সীমা আছে?"

"তাই বলে এরকম করে আমাদের চোখের সামনে জীবনটা নষ্ট করবে। পরীক্ষা দেবে না?"

"পরীক্ষা দেওয়াটা যদি অত দরকার মনে কর তবে স্কুল ছাড়ালে কেন? এ বছরেই হয়ে যেত পরীক্ষা।"

"বাঃ স্কুলে পড়াশুনো হয় নাকি– স্কুল গেলে ও এত সাহিত্য পড়তে পারত? সমস্ত রবীন্দ্রকাব্য ওর মুখস্ত । এম. এ. ক্লাসের ছেলেরাও অত পড়ে নি—এত কবিতা লিখতে পারত ? হোম ওয়ার্ক দ্যান মাস্টারনীরা, হোম ওয়ার্ক! লাল কালি দিয়ে 'গুড্' 'ব্যাড্' অশ্বডিম্ব!"

"তাহলে তো হয়েছেই। পড়াশুনো তো করেছে। পরীক্ষা না হয় পরেই দেবে।"

"না না তা হয় না, পরীক্ষা দিতে হবে—বাঃ, আমার মেয়ে পাশ করবে না? কি যে সর্বনাশ হয়ে গেল, কিছু হবে না, এত করে আমি ওকে তৈরী করছিলাম। সব আমার নষ্ট হয়ে গেল, ও আর কবিতা লিখবে না, পড়াশুনো করবে না, আমার আশা ভরসা সম্পূর্ণ নির্মূল, তাহলে দেখে শুনে একটা বিয়েই দিয়ে দাও", বাবা হাহাকার করে উঠলেন।

মা যেন ছোট শিশুকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, "আমায় একটু সময় দাও লক্ষ্মীটি। একটু সময় লাগবে। তোমার সব যেমন ছিলো আমি তেমনি করে দেব।"

"তুমিও তো ঠিক ভাবে চলছ না। তুমি ওর মনটাকে বিমুখ কর! মেয়েকে বল, ওরা ইয়োরোপের নাগরিক, ওরা মৃগয়াপটু।"

"তা আমি কিছুতেই পারব না। বেচারা পরের ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার জন্য কিছু করতে না পারি অপবাদ দিতে পারব না।"

"ওকে এ কথা বললে তার কি ক্ষতি হবে? সে তো টেরও পাবে না। তার সঙ্গে কি আমি খারাপ ব্যবহার করতে বলছি ? যুদ্ধ জিততে হলে বুদ্ধির ব্যবহার কর, খালি ভাবালুতায় হবে—nothing is wrong in love and war – "

"আমার সে মত নয়। মন্দ যা তা মন্দই, বিবেকের বিরুদ্ধে আমার বুদ্ধি বড় হবে না।" মা বাবার সঙ্গে কঠিন তর্ক করছেন। মা সব সময় তা করেন। মার

নিজস্ব মত আছে কিন্তু তা প্রয়োগ করতে পারেন না। স্নেহের কাছে পরাভূত হয়ে যান।

মা বাবার তর্ক শুনছি কিন্তু কি আশ্চর্য আমার যন্ত্রণাবিদ্ধ মন বাবার কথাই গ্রহণ করেছে। ‘মৃগয়া’ ঠিকই বটে! নৈলে চিঠির উত্তর দিল না কেন? আমাকে জানালো না কেন আমি কি করব। ও তো পুরুষ মানুষ। আমার চেয়ে বড়। ও যদি না বলে কে আমার পথ ঠিক করে দেবে? তার মানে ও চায় না আমাকে আর। খেলা শেষ হয়ে গেছে। মৃগয়া !

একদিন বাবা আমাদের শকুন্তলা পড়াচ্ছিলেন, আমরা মাটিতে মাদুরে বসে আছি, মাঝখানে বাবা। আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। বাবার মুখে সংস্কৃত পড়া যে শোনে নি সে জানবে না কি তার অপূর্ব সৌন্দর্য। সংস্কৃত ভাষা তার সমস্ত মাধুর্য, ঐশ্বর্য নিয়ে কাব্যের অর্থকে শব্দার্থের থেকে ছাড়িয়ে মনের পর্বে পর্বে ঝঙ্কার তুলছে। বাবা বলছেন,—”ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্ মৃদুনি মৃগশরীরে তুলারাশাবিবাগ্নিঃ—”

“মৃগয়াপটু নাগরিক দুষ্মন্ত এসেছেন বনে শিকার করতে। বনের মৃগ সরল অসহায়, মৃদু অর্থাৎ কোমল—দুষ্মন্ত রথের উপর থেকে উদ্যতধনু, এখনই তিনি বাণ ছুঁড়বেন। বনবাসীরা এই নিষ্ঠুরতা করতে নিষেধ করছেন— তাঁরা দুই হাত তুলে বলছেন, ‘মেরো না, মেরো না বাণ—তুলার রাশিতে আগুন দিও না!’ এই বাণ কার? মদনের! এই মৃগ কে? শকুন্তলা। কুসুমতুল্যকোমলা, বল্কলেও মনোজ্ঞা পুষ্পাভরণা শকুন্তলা, অনভিজ্ঞা, সরলা—নাগরিকদের আচার আচরণ তিনি কিছুই জানেন না। তিনিই মৃগ। দুষ্মন্ত একটু পরেই তাঁকে শরবিদ্ধ করবেন। পুষ্পরাশিতে আগুন দেবেন। এখানে তারই পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছে, এটা suggestive, যে ঘটনা পরে ঘটবে তারই আভাস দেওয়া হল।”

আমি ভাবছি, ভাবছি, ভাবছি, বাবা ঠিকই বলেছেন ‘মৃগয়া’ কিন্তু আমি সরলা তো নই

নিশ্চয়ই। অভিজ্ঞতাও তো অনেক হল। এ শর আমি তুলে ফেলবই ফেলব। পরের দিন আমি মাকে বললাম, "মা তুমি বাবাকে বল আমি পরীক্ষা দেব, এখনও তো তিন মাস আছে। সিলেবাস এনে দিন, যথেষ্ট সময় আছে।"

"যথেষ্ট বৈকি। ইচ্ছা হলে তোমার আর কতক্ষণ লাগবে।"

মার খুব আনন্দ হয়েছে—আমাকে খোশামোদ করছেন, "তোমার বাবা বলেন—কত সাধ করে নাম রেখেছি, ও জ্ঞানের অমৃত পান করবে, ব্রহ্মবাদিনী হবে। তোমার বাবার আশাটা পূর্ণ কর মা। সামান্য কারণে জীবনটা তছনছ করে ফেল না।"

প্রথম যেদিন বাবার কাছে পড়তে বসলাম সে দিনের অভিজ্ঞতা দুঃখজনক তো বটেই, আজকালকার দিনে অবিশ্বাস্য। বাবা আমাকে বলছেন, 'অভূততভাবে চ্বির" কতকগুলি দৃষ্টান্ত লেখ। আমি মন দিতেই পারছি না। বাবা ঘোরাফেরা করে এসে বসলেন। আমি শূন্য খাতা হাতে নিয়ে শূন্যদৃষ্টিতে বসে আছি—যাকে ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বলে যাওয়া বলে বাবার হয়েছে তাই, এতটুকু একটা মেয়েকে বশে আনতে পারছেন না?

"কি হয়েছে কি? সব কি গুলে খেয়েছ? লিখছ না কেন? লেখ লেখ।" আমার হাত আরো অনড় হয়ে গেছে, কিছু তো মনে পড়ছেই না। হঠাৎ বাবা আমার গালের উপর প্রকাণ্ড এক চড় মারলেন। পাঁচ আঙ্গুলের দাগ বসে গেল কিন্তু কি আশ্চর্য আমার ব্যথা লাগল না। মা ছুটে এলেন, "কি, ব্যাপার কি? এত বড় মেয়েকে তুমি মারলে?"

বই ফেলে বাবা উঠে পড়েছেন, "অসহ্য, অসহ্য ওর এই গোয়ার্তুমি, ইচ্ছে করে পড়বে না।"

মা চুপ করে রইলেন। সেদিন বাবার উপর নয়, মার উপরই আমার অভিমান হয়েছিল। কারণ বাবা যা ঠিক মনে করেছেন তাই করেছেন। মা যা ঠিক মনে করেছেন তা তো করতে পারছেন না। মা জবরদস্তির কাছে মাথা নিচু করেন,

এ ভুলের খেসারত তাঁকে দিতে হয়েছিল। বাইরে বেরিয়ে অর্থাৎ বসবার ঘরে যেখানে আমি পড়তে বসেছিলাম সেখান থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছে দেখি শান্তি দাঁড়িয়ে আছে। সে আমার দিকে জল ভরা চোখে চাইল—"দেখ্ রু আমি আর এ বাড়িতে থাকব না।"

আমি ভাবছি আমাকে তো থাকতেই হবে কারণ সে তো আর আমার খোঁজই করল না। আমি আর যাব কোথায় ?

মধুপুরে গিয়ে কারুরই শরীর ভালো হল না। সেখানে পুকুরের জলে স্নান করে প্রত্যেকেই এক একরকম ব্যাধি সংগ্রহ করল, ভাইটির বয়স চার, তার সাংঘাতিক টাইফয়েড, সাবির যৌবনে প্রবেশের অসুখ, সেই সময়ে ও মানসিক আঘাত পেয়েছে আমার জন্য। তারপর আমি তো মাকে হয়রাণ করে ফেলেছি। মার কষ্টের চূড়ান্ত হচ্ছে—এর মধ্যে বাবা বললেন তাঁর সব রকম পরীক্ষা করান দরকার সেজন্য হাসপাতালে কেবিন নিয়ে থাকবেন। মেডিকেল কলেজে কেবিন নেওয়া হল— বিরাট ঘর, তখনকার হাসপাতাল কি পরিচ্ছন্নই না ছিল, পাথরের মেঝে, ধপধপ করছে বিছানা, আসবাব চমৎকার। বাবার সব রকম পরীক্ষা হচ্ছে, শরীরে তো কষ্ট নেই, রাশি রাশি বই আসছে—পড়া হচ্ছে—সন্ধ্যেবেলা অগুনতি ভক্ত শিষ্য সমাবেশ—আড্ডা, গল্প, আলোচনা। খাবার হাসপাতালে যা দেয় ও বাড়ি থেকে যা নেওয়া হয় তা প্রচুর, অতিথিদের খাওয়ান চলে। কেবিনে আত্মীয়স্বজনকে থাকতে দেয়, মা তো আসতে পারেন না, আমি সারাদিন থাকি। মা এক টাইফয়েডের রুগী নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন—তখনকার দিনে টাইফয়েড বড় ভয়ঙ্কর অসুখ ছিল। মাকে সাহায্য করবার কেই নেই শান্তি ছাড়া। আমি তো বাবার কাছে সারাদিন তাঁর পরিচর্যা করছি।

একদিন হাসপাতালে বাবা আমাকে আস্তে আস্তে বললেন, "রু তুই আর কবিতা লিখবি না?" আমি চুপ করে রইলাম। আসলে আমি তখন কবিতা লিখছিলাম কিন্তু যা লিখতে চাই তা এত স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে তাতে কোনো আড়াল থাকে না। অমন লেখা কি কাউকে দেখান যায়? সবাই যে মনের

ভিতরটা দেখে ফেলবে। প্রায় একটা বই লেখা হয়েছিল--আমি শুনেছি ব্যক্তিগত জিনিসকে নৈর্ব্যক্তিক করে তোলাই সাহিত্যের কাজ। আমার যা, তা সকলের হল, কিন্তু তা হচ্ছিল না-বড় নির্লজ্জ রকম আমার কথা হয়ে যাচ্ছিল! ঐ সময়কার একটা কবিতা আমার মনে আছে, আমি শেক্সপীয়রকে জিজ্ঞাসা করছিলাম–"তখন তুমি কোথায় ছিলে শেক্সপীয়র যখন আমি বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম? ওটা জানালা নয়, বারান্দা, তাতে তফাৎ কি? সে বাড়ি সামান্য একটা দোতলা ভাড়াটে বাড়ি, ধনীগৃহের অলিন্দ নয়, আর সে নিচে ছিল, রাস্তার উপরে, বাগানে নয়, সেখানে কোনো প্রাচীর ছিল না, কিন্তু একটা মাধবীলতা তো ছিল, বাগানে না হয় নাই হল। পাশে রাস্তা ছিল, কলকাতায় ঐ মলিন রাস্তায় ফুল ফোটে নি, তা নাই বা ফুটল–তাতেই কি ঘটনাটা তুচ্ছ হয়ে গেল? মহাকবি! আমি তো আশা করেছিলাম যে মুহূর্তে সে বিদায় নিচ্ছিল তুমি তাকে দেখেছ– তুমি আমার পিছনে ছিলে মণ্ডলীকৃত–প্রতিমার পিছনে যেমন চালচিত্র থাকে–আমি তো ভেবেছি আমার ঐ আহত প্রেমকে তুমি আবার প্রাণ দেবে! স্বর্ণমূর্তি কি জুলিয়েটকে অমর করতে পারে? আমি তাকে অমর করেছি বলে তুমি আমার ভক্ত হবে– আমার বন্দনা কর মহাকবি–আমার ঘরে এস–"

এ সব কবিতার চার-পাঁচ বছর পরে আমি বহ্ন্যুৎসব করেছি, কিন্তু আমি এখন জানি বাবাকে যদি তখনও দেখাতাম তিনি রাগ করতেন না, যে বস্তু লেখা হয়েছে তা যদি ভালো হয়ে থাকে তাহলে তা ঈশ্বর হয়ে গেছে–তখন কে লিখল, কেন লিখল তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামাবেন না। আমার প্রেমে পড়ায় তাঁর আপত্তি ছিল কিন্তু প্রেমের কবিতা লেখায় নয়! তখন বলবেন–"নানা অভিজ্ঞতা হওয়া ভালো। এ তো সব অবিদ্যা, মায়া, এই অবিদ্যার জগতের ভিতর দিয়েই তো জ্ঞানের জগতে পৌঁছতে হবে–অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা, বিদ্যয়াহমৃতশ্নুতে"–জ্ঞানের অমৃত পানে বাবা সতত উন্মুখ–অবিদ্যার–জগতে সুখ-

দুঃখকাতর যে মানুষ বাস করে তাদের জন্য তিনি তত ভাবিত নন—সবার উপরে মানুষ সত্য, এ তাঁর জীবনের বাণী নয়।”

হাসপাতালে রুগী পরিচর্যা করতে যেতাম, করতামও। সারাদিন বাবাকে পড়ে শোনান, বিকালে যে সব অতিথি অভ্যাগত আসবে স্টোভে তাদের জন্য খাবার তৈরী করে রাখা ইত্যাদি কাজ করতাম। বাইরে থেকে এখন আমি স্বাভাবিক কিন্তু ভিতরটা কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না—সন্ন্যাসী হয়ে বনে বাদাড়ে বেড়াবার কথা ভাবলেই আমার বুক ভেঙে কান্না আসে—অনুশোচনায় জ্বলতে থাকি। আমার মনে হয় সাপে কামড়ে দেয় যদি তাহলে ওকে আমিই খুন করলাম। ও কি করে জঙ্গলে রয়েছে, ও তো সাহেব। ওদের কত ভালোভাবে থাকা অভ্যাস। বাবা সব সময় আমায় বলতেন, “একদিন অন্তর খাবার টেবিলের চাদর বদলে দিও রু যেন ঝোলের দাগটা না থাকে, ওরা ইয়োরোপে কত পরিচ্ছন্ন থাকে জানো?” এ সব কথা যখন মনে পড়ত তখন বাইরেটা স্বাভাবিক রাখতে হত বলেই ভিতরটা রক্তাক্ত হয়ে যেত। বাবার সামনে দুর্বলতা প্রকাশ করতে আমার লজ্জা বোধ হত। আত্মসম্মানে লাগত। তাই আমি খুব হাসিখুশি থাকতে চেষ্টা করতাম, তা সত্ত্বেও একদিন হাসপাতালেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। ঠিক অব্যবহিত কারণটা কি ছিল মনে পড়ছে না, হয়ত ছিলই না কিছু। ডাক্তার বললেন, নার্ভাস ব্রেকডাউন হবার উপক্রম হয়েছে। মা তো ভেবেই অস্থির। বাবা বলতে লাগলেন, একটু মনের জোর করলেই ঠিক হয়ে যায়, তা করবে না তো কি হবে! ইচ্ছে করে এরকম করছে—আমায় জব্দ করবে। ডাক্তার যদি অন্য কেউ হতেন তবে বাবা তাঁকে ডাক্তারী বিষয়েই প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্ন করে ডাক্তারী শাস্ত্রে তাঁর অজ্ঞতা প্রমাণ করে তাঁর মাথা হেঁট করে দিতেন। কিন্তু ডাক্তার তো আর কেউ নয়, চিকিৎসক-শ্রেষ্ঠ নীলরতন সরকার যিনি রুগীর গন্ধ পেয়ে টাইফয়েড বা নিউমোনিয়া চিনে ফেলেন—যিনি ঘরে ঢুকলে মৃত্যুভীত অভয় পায়, আমাদের চিরশুভানুধ্যায়ী সেই ডাক্তার আমাকে আরোগ্য করলেন। সাত আট

মাসের মধ্যে আমি সেরে উঠলাম। পরীক্ষাও দেওয়া হল, ফলও ভালই হল। রোগটা যখন সেরে গেল তখন আমার ভারি দুঃখ হতে লাগল, যেন যুদ্ধের প্রধান অস্ত্রটাই ভোঁতা হয়ে গেছে, আর লড়ব কি দিয়ে।

সেবারে আমার পরীক্ষার বিষয় বলতে গেলে একটা কথা আজকের দিনে বিশেষ করে মনে হয় যখন দেখি মা-বাবাও সন্তানের জন্য প্রশ্নপত্রের সন্ধানে ঘোরেন, জালজুয়াচুরিতে দ্বিধাহীন হন।

আমি যে পরীক্ষা দেব সেটা আগে থেকে ঠিক ছিল না বলে বাবা সংস্কৃত প্রশ্নপত্র করেছিলেন কিন্তু পরে আমি পরীক্ষা দেওয়ায় পরীক্ষকের পদ ছেড়ে দিলেন। প্রশ্নপত্র বাবাই করেছিলেন, আমাকে পড়িয়েছিলেনও তিনিই, কিন্তু কিছুমাত্র বুঝতে পারিনি প্রশ্নে কি আছে—। পরীক্ষা দিয়ে আসার পর বাবা খুব হাসছেন—-"কি আগে কিছু বুঝতে পারিস নি তো?" আজকের দিনে এটা হয়ত অসম্ভব আষাঢ়ে গল্প শোনাবে। তখনকার দিনে বাপ-মা'রা চাইতেন যে ছেলেমেয়েরা যেন লেখা-পড়া শেখে, এখন চান শুধু ডিগ্রী! দেশের এ একটা পরিবর্তন বটে!

নয় দশ মাস কেটে গেছে কিম্বা এক বছর, এর মধ্যে আমি ওর কোনো খবর পাইনি। খোকাও আসে না। ওর বইয়ের দোকানে গিয়েও আর ওকে ধরা আমার হয় না। আমার ছোট একটি বোন হয়েছে। কাকারা চলে গেছে, বাবার সঙ্গে খুব ঝগড়া করেছে—মুখোমুখি নয়, সে সাহস তার হয় নি, সে মাকে বকাবকি করেছে—মা স্বামীর পক্ষ নিয়ে ঝগড়া করেছেন। আমারও কাকার উপর রাগ হয়েছে, আমিও ঝগড়া করেছি। কাকীমা তো বাপের বাড়ি গিয়ে বসে আছে নাগালের বাইরে। কাকার রাগের ভিতরের কারণটা কি তা আমি বুঝতে পারি নি কিন্তু এরকমভাবে চলে যাওয়ায় আমার দুঃখ হয়েছে খুবই। কাকাকে এত ভালোবাসতাম, প্রতিজ্ঞা করেছি কোনদিন আর তার মুখ দেখব না।

মা বললেন, সংসারটা ভাঙতে শুরু করল। আত্মীয় পরিজন আশ্রিত অতিথি সবাইকে নিয়ে যে সাজান সংসারটা গল্পে হাসিতে কবিতায় উল্লাসে গত একবছর ঝলমল করছিল মা তো সেখানে রাজেন্দ্রাণী, একে একে যেন এক একটা বাতি নিবে যাচ্ছে।

একদিন আমি সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছি, বাবা বসবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন—"কাল মির্চা এসেছিল?" আমার ভিতরটা ধ্বকধ্বক করে উঠেছে—হা ঈশ্বর কি শুনব এখন? "দাড়ি রেখেছেন, একমুখ দাড়ি। সন্ন্যাসী হয়েছেন, আমি তো চিনতেই পারি না। হাঃ হাঃ হাঃ।" আমি কোনো উত্তর না দিয়ে বাবার দিকে মুখ না ফিরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। বাবা ডাকলেন—"রু, রু, সে দেশে চলে যাবে তার যে কিউরিওগুলো পড়ে আছে গাড়িতে তুলে দিস।" আমি ভাবছি কেন ও দাড়ি রাখল, এটা কি শোক? আমি তো কিছুই করতে পারলাম না। চুলও কাটা হল না। স্বার্থপর আমি স্বার্থপর।

মির্চা যখন একবার দার্জিলিঙে গিয়েছিল তখন সেখান থেকে খুব সুন্দর সুন্দর বড় বড় তিব্বতী কিউরিও এনেছিল, সেগুলো এখানেই সিঁড়ির তাকে সাজান ছিল—সে চিহ্নগুলো আমি দেখতাম। আজ নিজের হাতে সেগুলো গাড়িতে তুলে দিলাম। যাক, তাতে আমার দুঃখ নেই। কোনোও দিনই অর্থাৎ ছোটবেলা থেকেই আমি মূর্তিপূজক নই। অর্থাৎ কোনো বস্তু আমার কাছে ভাবের প্রতীক হয় না। ওর যে একটাও ছবি নেই আমার কাছে সেজন্য আমার দুঃখ হয় না। ছবি দিয়ে কি হবে? ছবি তো মানুষকে দেবে না।

বাবা যখন ওর একমুখ দাঁড়ির কথা বলছিলেন তখন আমার বুকের ভিতরটা থেঁতলে যাচ্ছিল—আমি ভাবছি বাবা হাসছেন কেন? তাহলেই কি ব্যাপারটা আমার কাছে হাস্যকর ছেলেমানুষী বলে মনে হবে? মনে দুঃখ পেলেই কি এভাবে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো সোজা কথা। মনে দুঃখ তো ছিলই, তার

সঙ্গে আবার শরীরের দুঃখও যোগ হল। কিন্তু এ কাজে সে পারঙ্গম—নিজেকে কষ্ট দিতে তার জুড়ি নেই—নিজেকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই—হয়ত সেটা বোকামি, তবুও মানুষ সে কাজকে সম্মান করে, সতীদাহের মত ভয়াবহ জিনিস আর নেই তবু যখন ঠাকুমা বলতেন তাঁদের পূর্বপুরুষে একজন সতী হয়েছিলেন, তখন তাঁর মুখটা আলো হয়ে যেত। নিরাভরণ উপবাসজর্জর বৈধব্য ঠাট্টার বস্তু নয়। কিউরিওগুলো গাড়িতে তুলছি আর ভারছি বাবা পারবেন কারু জন্য নিজেকে কষ্ট দিতে, নিজেকে একটু বঞ্চিত করতে? অসম্ভব। কেন ওকে বিদ্রূপ করলেন—he jests at scars who never felt a wound ! মহিমাময় শেক্সপীয়রের জ্ঞানচক্ষু আমার মধ্যে উন্মীলিত হল।

আমাদের করুরই শরীর ঠিকমত ভালো হয়নি— তাই আবার আমরা বাইরে যাব। কাশীতে যাওয়া হবে। আমাকে তো আমি দেখতে পাচ্ছি না, আমার ধারণা আমি খুব স্বাভাবিকভাবে চলেছি, আর কেউ আমার মনোবিকার বুঝতে পারছে না। মনোবিকার! আবার কি! প্রেম-ট্রেম সব বাজে কথা। কিন্তু মার মনে শান্তি নেই—শান্তি না থাকার প্রধান কারণ মার নিজের ভিতরে! মা ভাবছেন তিনি আমায় বিয়ে দেবেন কি করে? আমি কি আর কোনো মানুষকে ভালোবাসতে পারব? না সেটা উচিত হবে? ভালোবাসা যে একটা বস্তু নয়, তা একজনের কাছ থেকে অপহরণ করে তবেই অন্যকে দিতে হয় তাও নয়, একথা তখন বোধ হয় ঠিকমত জানা ছিল না। মানুষ নিশ্চয় জানত, সমাজ জানত না। মা একদিন আমাকে বললেন, "রু তোরা কি কোনো বিবাহের মন্ত্র পাঠ করে কোনো অনুষ্ঠান করেছিলি ?"

"মা তুমি আর একবারও জিজ্ঞাসা করেছিলে, আমি বলেছি তো তোমাকে ওসব আমাদের মনেও আসে নি।"

"তবে হাসপাতালে যে দিন পড়ে গিয়েছিলি, সেদিন ঐ মন্ত্র বলবি কেন?"

"কি মন্ত্র? মমব্রতে তে হৃদয়ং দধান?"

"না, না, ইংরেজী মন্ত্র।"

"ইংরেজি মন্ত্র! ওদের বিয়ে কি আমি দেখেছি কোনো দিন যে সে মন্ত্র জানব? কেন আমায় মিছিমিছি অপবাদ দেওয়া।"

"অপবাদ নয় রু, যদি বলেই থাকিস্ আমায় বল না।"

"কি মন্ত্রটা কি?"

"আমি তো ঠিক বুঝলাম না ওটা মন্ত্র কি করে হবে—কোনো মন্ত্রর মত তো শোনাচ্ছে না, কিন্তু তোর বাবা বললেন, ওটা বিবাহের মন্ত্র—অবশ্য তিনি যখন বলছেন—"

"কথাটা কি?"

"-in sickness and in health..."

"এ আবার কি মন্ত্র—এ আমি কোনো দিন শুনিই নি।" মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

অনেক পর আমার মনে পড়েছে আমি একটা সিনেমায় ঐ মন্ত্রটা লেখা দেখেছিলাম—তখন নীরব সিনেমা ছিল। তার অর্থ— সুখে দুঃখে রোগে স্বাস্থ্যে পরস্পরকে অতিক্রম করব না till death do us part— সেইটা হয়ত অজ্ঞাতসারে বলে থাকব। জ্ঞাতসারে ঐ মন্ত্র আমি কখনো ভাবি নি। ব্যাপারটা কিছুই তাই গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু মা ঐ কথাটার আশ্রয় চেয়েছিলেন—আমার এত কষ্ট—মির্চার এত কষ্ট সেটা উপেক্ষা করা যায় কিন্তু একটা যদি মন্ত্র পাঠ হয়ে থাকে সেটা অনতিক্রমণীয়—মানুষ কিছুই নয়, অনুষ্ঠানই সব। এই ছিল আমাদের দেশ। হয়ত এখনও আছে।

কিন্তু মা যে সত্যই অনুষ্ঠানের এত মূল্য দেন বা গোঁড়ামীতে ভরা এ কথা ভাবলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে, তা নয় কিন্তু এ ক্ষেত্রে বাবার সঙ্গে লড়াই করবার একটা হাতিয়ার খুঁজছিলেন, এই মাত্র। -

যখন আমার সাত বছর বয়স আর সাবির দুই—তখন ঠাকুমা, মা, আমরা দুই বোন ও চাঁপাপিসি আমরা দু বছর পুরীতে ছিলাম, বাবা তখন বিলাতে। একদিন জগন্নাথের মন্দিরে গর্ভগৃহের সামনে দাঁড়িয়ে আছি—সেদিন কোনো পুণ্য দিবস—লোকের ভীড়— চারিদিকে ঠেলাঠেলি~~ হঠাৎ একজন মধ্যবয়সী বিধবা ও তার সঙ্গে পনের-ষোল বছরের একটি ছেলে আমাদের দিকে এগিয়ে এল – সোজা আমাদের কাছে এসে সাবির হাতে একটা মিষ্টি ও আমার গলায় একটা ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে বললে, ‘জগন্নাথ সাক্ষী তোমাকে মাল্যদান করলাম —' তারপর ভীড়ের মধ্যে দ্রুত চলে গেল মাতা পুত্র। ঠাকুমা চিৎকার করে উঠলেন, “কেডারে, কেডারে”— তারপর ভিড়ের মধ্যে খুঁজতে গেলেন। মা আমার গলা থেকে মালাটা টান মেরে ফেলে দিয়ে খুব শান্তভাবে বাড়ির দিকে এগিয়ে চললেন আমাদের নিয়ে। ঠাকুমা কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসেছেন, উদ্ভ্রান্ত —”ও বৌমা, কি সর্বনাশ হইল, জগন্নাথ সাক্ষী কইল যে!”

“চুপ করুন। কোন্ পাগলে কি বলেছে তাতে কি হবে, জগন্নাথ কারু প্রলাপ শোনে না।”

“ও বৌমা”, ঠাকুমা কপালে করাঘাত করছেন, “আজ যে অমুক তিথি”

“আপনি একেবারে চুপ করুন। আর একটিবারও একথা বলবেন না। আমি তাহলে কালই কলকাতা চলে যাব।” পরে মা আমাকে বলেছিলেন, ওদের হয়ত কোনো মানত ছিল জগন্নাথের সামনে অমুক তিথিতে কোনো কুমারী কন্যাকে মাল্যদান করবে। অদ্ভুত এই দেশ! বিচিত্র তার সংস্কার যা বুদ্ধিমান মানুষকেও নির্বোধ করে তোলে।

অন্তরের দিক থেকে মা কতখানি সত্যাশ্রয়ী ও সংস্কারমুক্ত ছিলেন তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। তাঁর একটি কাজে তা বোঝা যাবে। এরকম কাজ আজও এদেশে কম মেয়েই পারবে। ১৯২৪ বা ২৫ সালে আমার বয়স তখন দশ, আমরা কালীঘাটে একটা বড় বাড়িতে ছিলাম। সে বাড়ির দুপাশে দুটো দারোয়ানের ঘর ছিল। একটা ঘরে আমাদের দুর্দান্তপ্রতাপ দারোয়ান সুরজপাল

থাকত। একদিন দেখি সে বিমর্ষভাবে তার জিনিসপত্র বার করে অন্য ঘরে যেখানে দুটি ভৃত্য থাকে—তাদের সঙ্গে রাখছে। "দারওয়ান এ ঘর খালি করছ কেন ?"

"মাজি কা হুকুম।"

"কেন? কার জন্য ?"

"মহারানীকা বাস্তে।" অনেক জিজ্ঞাসার পর জানলাম পাঁচি হচ্ছে সেই মহারানী। পাঁচি আমাদের বাসন মাজার ঠিকা-ঝি। কয়েক দিন আগে মাকে দেখেছি তাকে খুব বকছেন আর সে মার পা ধরে কাঁদছে। সেই পাঁচির জন্য দারোয়ানকে ঘর ছাড়তে হল— আমি ভাবছি ও হয়ত কান্নাকাটি করে আদায় করেছে। অবিচারের বিরুদ্ধে আমি সর্বদাই সংগ্রামী তাই আমার রাগ হচ্ছে, আশ্চর্যও লাগছে—দারোয়ান এ রহস্যভেদ করতে নারাজ। তাই আমার সমস্ত রকম জ্ঞানদায়িনী ঠাকুমার কাছে গেলাম— ঠাকুমারও সমস্ত অভিযোগ জানাবার জায়গা আমি— তাঁর ধারণা বাড়ির মধ্যে কেবল আমিই তাঁকে ভালোবাসি। "ঠাকুমা তুমি কাঁদছ কেন?"

"এ বাড়িতে আর থাকব না খুকি—এ বাড়ি অপবিত্র হয়ে গেছে—'

"কি হয়েছে ঠাকুমা, কি হয়েছে?" আমি তাঁর গলা জড়িয়ে ধরলাম, "তুমি চলে গেলে আমিও চলে যাব।"

"ঐ পাঁচি—সাত বাড়ি কাজ করে বেড়ায়, কোথা থেকে পাপ এনেছে—ওটা পাপিষ্ঠা, ওর সঙ্গে এক বাড়িতে থাকলে চৌদ্দ পুরুষ নরকে যায়—তা তোর মা দয়ায় গলে গেছেন - ওকে দারোয়ানের ঘরে রাখবে—ওর সেবা করবে। আর তোর বাবা হয়েছে বৌয়ের ভেড়ুয়া। বৌ যা বলবে তাই—মা কেউ নয়।"

বাবাকে হঠাৎ ভেড়া কল্পনা করে আমার খুব হাসি পেল...কিন্তু পাঁচি কেন পাপিষ্ঠা, কি কি পাপ করেছে তা জানবার জন্য ঠাকুমাকে অতিষ্ঠ করে তুললাম। ঠাকুমা মার ভয়ে বলতে নারাজ—তা আমার সঙ্গে পারবেন কেন—আর

তাঁর নিজেরও যথেষ্ট বলার ইচ্ছা। "ওর যে সন্তান হবে – বিধবার সন্তান হওয়া মহাপাপ, তার ছায়া মাড়ানোও পাপ।" আমি মার কাছে গিয়ে বললাম, "মা পাঁচির কেন সন্তান হবে? বিধবার সন্তান হওয়া মহাপাপ–তাকে তুমি এ বাড়িতে রাখবে কেন?"

মা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছেন, "তোমাকে এসব বলল কে? ঠাকুমা নিশ্চয়।" খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মা বললেন, "রু, ছেলে হওয়া তো মানুষের হাতে নয়, তাই, না? ভগবানের কাজ। মানুষ কি মানুষ বানাতে পারে? বিধবার সন্তান না হওয়াই উচিত কিন্তু ভগবানও মাঝে মাঝে ভুল করে ফেলেন, তখন মানুষের বড় কষ্ট হয়– মানুষের কষ্ট হলে, বিপদ হলে, মানুষকে সাহায্য করতে হয়। সেটা কখনো অন্যায় নয়।"

আত্মীয়স্বজন, ছেলেমেয়ে, ভৃত্যকুল নিয়ে একটি বিরাট দল আমরা কাশী গেলাম। সেখান থেকে মা, বাবা, আমি ও আমার সদ্যজাত শিশু ভগ্নীটিকে নিয়ে দিল্লী, আগ্রা হয়ে ঋষিকেশ লছমনছোলা যাব। ঋষিকেশ যাব ভেবেই আমার মনটা আনন্দে ভরে গিয়েছে। মনে হচ্ছে যেন ওখানে গেলেই ওর সঙ্গে দেখা হবে—অথচ আমি তো জানি, ও দেশে চলে গেছে। তবে এমন মনে হচ্ছে কেন? যুক্তির নাগালের বাইরে যেসব ভাব আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে এও তার একটি। আমাদের ভ্রমণের অন্য কোনো অংশ আমার মনে নেই শুধু হরিদ্বার ও ঋষিকেশ ছাড়া। হরিদ্বার থেকে একটা মোটর ও একজন গাইড যোগাড় করে আমরা স্বর্গদ্বারের দিকে রওনা হলাম। এই প্রথম হিমালয়ের আশ্রয় পেয়েছি—দেবতার আশ্রয়ের মতো তার নিশ্চিন্ত শান্তি। সমুদ্রের বাতাসের প্রভাব আছে মনের উপরে কিন্তু পাহাড়ের মতো নয়। চারধারে বড় বড় সোজা সোজা গাছ, এদের নাম জানি না। নদীর এত গতি কখনো দেখি নি—বাতাসের এমন স৻ুখস্পর্শ আগে কখনো পাই নি। আমার বুকের ভিতর সবগুলি স্ফুলিঙ্গের উপর ঠাণ্ডা বাতাস লাগছে, মনে হচ্ছে আগুনটা নিবে যাবে! মির্চা এখানে এসে ভালোই করেছিল। বাতাস শুধু তো ঠাণ্ডা নয়—বাতাসে আরো কিছু আছে। কি আছে? হিমালয় নামে নাগাধিরাজের কি মহিমা আমি কি জানি? আমি তো আগে কখনো ভাবতেই পারিনি প্রকৃতি মানুষের মনকে শান্ত করতে পারে। শকুন্তলা পদ্ম পাতায় শুয়েছিল— আমি ভাবতাম কবিত্বের মধ্যেও একটা সম্ভবপরতা থাকা চাই—আমাকে পদ্মফুল দিয়ে কবর দিলেও শান্তি পাব না।

আমরা একটা সমতলভূমি দিয়ে চলেছি। দুধারে শণবন, গাড়ির মাথার চেয়েও উঁচু, সেটা ঠিক কোন্ জায়গা পরে আর চিনতে পারি নি। হঠাৎ গাড়ি বিগড়ে গেল। মা আর আমি তো রোরুদ্যমান শিশুটিকে নিয়ে বিব্রত—এমন সময় গাইড হঠাৎ বললে, এই শণের বনে শের থাকে। আমি আবার হিন্দী বিদ্যায় একেবারে অজ্ঞ— আমি ভাবছি 'সের' তো ওজন, এখানে যে 'শের' থাকে সে বস্তুটা কি? বাবা আঁতকে উঠেছেন—"কি সর্বনাশ। শের থাকে! তবে এখানে আনলি

কেন রে হতভাগা।” বাবা যত রেগে উঠছেন গাইড তত নির্বিকার মুখে বলে যাচ্ছে—”মৎ ঘাবড়াইয়ে” শেরেরও তো প্রাণের ভয় আছে—আমরা হর্ন বাজালেই পালিয়ে যাবে।

আমি মনে মনে ভাবছি—দেখ আমরা এতজন আছি তবু ভয় পাচ্ছি—এখানে একলা একলা ঘুরতে লাগবে কেমন? হাসির কথা নয় মোটেই। স্বর্গদ্বারে গিয়ে আমরা নৌকায় ওপারে গেলাম—এই প্রথম আমি পার্বত্য নদী দেখলাম, এর পরে তো তারই তীরে জীবন কাটিয়েছি। ঢালুর উপর দিয়ে বয়ে আসছে বলে সে প্রবলা, পাথরে পাথরে ঘা খেয়ে খেয়ে তার স্বচ্ছ জলরাশি ঘূর্ণমান, কখনো ঊর্ধ্বোত্থিত চূর্ণীকৃত। মুখে চোখে এসে বিন্দু বিন্দু ঠাণ্ডা জল লাগছে। বাবা এক অঞ্জলি ভরে পান করলেন। আমরাও করলাম, কি অপূর্ব স্বাদ! অমন মিষ্টি প্রাণ জুড়ানো জল আগে কখনও খাই নি, এ যে অলকানন্দা! আমরা তো স্বর্গে পৌঁছে গেছি—স্বর্গের দরজা পার হলাম — আমি মুখে চোখে জল দিয়ে নদীর বন্দনা করলাম—সুরনর-নিস্তারিণী পাপতাপনিবারিণী পতিতপাবনী সাগরগামিনী গঙ্গে—স্বাভাবিকভাবে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে কবিতা বলায় বাবা খুশি —”বল বল সবটা বল”—আমরা ওপারে এসে পৌঁছেছি। পাহাড়ে পায়েচলা পথ দিয়ে আমরা এগুচ্ছি—ছোট্ট বোনটাকে একবার মা নিচ্ছেন, একবার আমি। পাহাড়ের গায়ে গায়ে ছোট ছোট গুহার মতন আছে—গাইড বললে ওখানে বসে সাধুরা তপস্যা করেন। এক একটা গুহায় এক একজন বসে আছেন—নানা রকম আসনে— পদ্মাসনেই বেশি। কেউ ছাইমাখা জটাধারী, কেউ মুণ্ডিতমস্তক—দু'একজন সন্ন্যাসী হাতে কমণ্ডলু ঝুলিয়ে, কেউ বা ত্রিশূল নিয়ে পথ ধরে এদিক ওদিক যাচ্ছে। এদের খাবার দিয়ে যায় কালীকম্বলিওয়ালার ধর্মশালা থেকে, বিনা মূল্যে। পুণ্যলোভী ধনী ব্যক্তিরা চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন, যাঁরা ঘোরাফেরা করেন তাঁরা গিয়ে খেয়ে আসেন, আর যাঁরা ধ্যানাসনে বসে আছেন তাঁদের খাবার দিয়ে যায়। আমরা এগিয়ে চলেছি এমন সময় গাইড একটা গুহা দেখিয়ে বলল—এইখানে একজন সাহেব ছিল. কিছুদিন, সে চলে গেছে। গুহাটি

খালি। বাবা দাঁড়িয়ে গেলেন। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল, "সে-ই নিশ্চয়, একেই বলে কর্মফল। এল পড়াশুনো করতে তা নয়, বনেবাদাড়ে ঘুরে দেশে ফিরে গেল।" বাবা বকতে বকতে এগোচ্ছেন, আমি বুঝতে পেরেছি তাঁর মন কেমন করছে। তিনি ওকে ভালোবাসতেন। তাঁর পক্ষে যতটা ভালোবাসা সম্ভব তা বাসতেন। আমার জন্যই এমনটা হল। বাঃ, কে আগে খেলা শুরু করেছিল ? আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করছি। কিন্তু আমার মনে পড়ছে না এর আরম্ভটা কোথায়—শেষ কোথায় তা তো জানি। জানি কি?

বড় বড় গাছের ছায়াঢাকা পাথুরে বন্ধুর পথ— আমরা সারিবদ্ধ এগোচ্ছি—এর পরের গুহাটায় একজন সাধু বসে আছেন একটা ছোট লাঠির উপর থুনিটা রেখে। তাঁর চোখ বড় বড়, দৃষ্টি দূরে নিবদ্ধ। মুখ দেখে বোঝা যায় এতক্ষণ যে সব সাধু দেখেছি তাঁর চেয়ে ইনি অন্যরকম। গাইড বলল, ইনি একজন বাঙালী জজ ছিলেন – ঈশ্বরের আহ্বান শুনতে পেয়ে সব ছেড়ে এখানে চলে এসেছেন দুবছর। ইনি কোথাও যান না। দুদিন অন্তর একবার খান। একটিও কথা বলেন না। ঘুমোতেও কেউ দেখে নি, এইরকম বসে থাকেন। কৃচ্ছ্রসাধনের কথা শুনলেই আমার খুব ভক্তি হয়— আমি যে একটুও কৃচ্ছ্রসাধন করতে পারি না। আমি মনে মনে ভাবছি পাশের গুহায় যে সাহেব ছিল সে মির্চা কিনা এর কাছ থেকে জানতে হবে। স্বর্গদ্বারের এই জঙ্গলে তো আর দলে দলে সাহেব ঘুরে বেড়াচ্ছে না। আমি ঐ জজ সন্ন্যাসীর গুহার সামনে হোঁচট খেলাম। আমার পায়ে লাগল। আমি বাবাকে বললাম, "তোমরা একটু এগিয়ে যাবে তো যাও, আমি এখানে অপেক্ষা করি, আমার পায়ে লেগেছে।" বাবা, মা এগিয়ে যেতে আমি সেই জজসাহেব সাধুর কাছে গিয়ে বললাম—"আপনি তো কথা বলেন না, কিন্তু আপনারা তো সাধু—জগতের দুঃখকষ্ট দূর করাও তো আপনাদের কাজ। ঐ গুহায় যে সাহেব ছিল তার কথা একটু বলবেন? তার নাম কি মির্‌চা?"

সন্ন্যাসীর মুখে রেখাপাত হল না। অনিমেষ দূরবদ্ধ দৃষ্টিতে কোনো ভাব নেই। আমি কাঁদতে লাগলাম—"বলুন না, বলুন আমার বড় জানা দরকার। একটা কথা বললেই কি আর আপনার সাধনা নষ্ট হয়ে যাবে?" কোনো ফল হল না। আর একজন আগন্তুক এসে দাঁড়িয়েছে—সে এ ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে গেছে। হঠাৎ এই বনের মধ্যে জটাধারী গুহাবাসীর কাছে বসে সুন্দরী তরুণীর রোদনের দৃশ্য তাকে খুবই অভিভূত করেছে—মানুষের উপর সম্পূর্ণ নির্দয় হয়ে ওঠার মত উপযুক্ত সিদ্ধিলাভ তার তখনো হয়নি। সে বললে, "মৎ রোইয়ে, মৎ রোইয়ে—কারণ যতই না কেন তুমি কাঁদ উনি কিছুতেই কথা বলবেন না। তুমি কি জানতে চাও মা?"

"ঐ গুহায় যে সাহেব ছিল তার নাম কি?"

"নাম তো জানি না। সাধুসন্ন্যাসীদের নাম কে জিজ্ঞাসা করে?"

"তুমি তাকে দেখেছ?"

"হ্যাঁ"

"দেখতে কি রকম?"

"সাহেবের মতো?"

"সাহেবের মতো মানে?"

"মানে ফর্সা।"

"কতটা লম্বা, চোখে চশমা আছে?"

লম্বা সে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল। চোখে চশমা আছে কিনা সে বলতে পারে না। আমি ফিরে ঐ গুহায় গিয়ে ঢুকলাম। চারিদিকে দেখছি কোথাও নাম লেখা আছে কিনা, কিছু লিখে রেখে গেছে কিনা। তন্ন তন্ন করে দেখছি। আমার বুক ধড়ফড় করছে, যেন দেওয়ালের গায়ে নামটা দেখলেই ওকে দেখা হবে। আমি পাগলের মতো খুঁজছি, এক্ষুনি মা বাবা এসে পড়বেন। কোনোখানে কিছু লেখা নেই। বাংলা অক্ষরে কয়েকটা অঙ্ক কষা আছে। আবার আমার বুদ্ধি ও নির্বুদ্ধিতে লড়াই লেগেছে। নির্বুদ্ধি বলছে, এ তো ইচ্ছে করে আমায় কষ্ট দেওয়া

—এখানে একটা নাম কি লিখে যেতে পারত না? তাতে তো আর বাবা ওকে বকতেন না—এটুকু করতে কি হত? আবার বুদ্ধি বলছে—বা রে, সে কি করে জানবে তুমি এখানে আসবে? এজন্য অত উতলা হবার কারণ কি ? অত রাগই বা করছ কেন ? কিন্তু আমি অভিমানের সমুদ্রকে শাসন করতে পারছি না। তার তরঙ্গ উত্তাল হয়েছে—আমার কি শক্তি আছে, কি সাধনা আছে, যে এর সঙ্গে লড়াই করব ? এখানে যে একটা নাম লেখা নেই সেটা ইচ্ছা করেই করা হয়েছে, আমার সঙ্গে সম্বন্ধচ্ছেদ করবার জন্যই করা হয়েছে...আর কিছু নয়। দূরে গাইডের সঙ্গে বাবা কথা বলছেন গলা পাওয়া গেল, আমি বেরিয়ে জজ সাধুর কাছে বসলাম। এ লোকটা কথা বলে না ভালই, নইলে বাবাকে বলে দিত।

আমরা রাস্তা পেরিয়ে ঘাটের দিকে চলেছি। নৌকায় অনেক ভীড়। দড়ি ধরে বসতে হয়। কিছুদিন আগে পাথরে ধাক্কা খেয়ে নৌকা উল্টে ত্রিশ জন লোক মারা গেছে—এ নদীতে নাকি একবার পড়লে আর রক্ষা নেই। এত স্রোত যে অত্যন্ত বেগের সঙ্গে পাথরে পাথরে ধাক্কা লেগে লেগে মুহূর্তের মধ্যে মানুষের শরীর চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। আমি নৌকার কিনারে বসেছি। ডান হাত বাড়িয়ে জল ছুঁচ্ছি। আর মনে হচ্ছে নাম না লিখে যাওয়ার উপযুক্ত শাস্তি দেবার এই সময়। আমি যদি এখানে পড়ে যাই মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে যাব। আমি তো কৃচ্ছ্রসাধন করতে পারিনা, এবার একটা চূড়ান্ত শারীরিক কষ্ট পেয়ে দেখাই যাক না, উপযুক্ত শাস্তি হবে তাহলে। কি করে উপযুক্ত শাস্তি হবে? সে তো টেরই পাবে না— টেরপাবে না আর কি! বাবা যা একখানা চিঠি লিখবেন, এক নম্বর মেলডি স্ট্রীটে সেই মহাশয়টি সে চিঠিখানা পড়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে। বাবা লিখবেন, "তোমাকে আমি বিশ্বাস করেছিল;;ম, আশ্রয় দিয়েছিলাম, অন্ন দিয়েছিলাম, শিক্ষা দিয়েছিলাম । পরিবর্তে তুমি আমায় মৃত্যু দিয়েছ, তোমার প্রতি স্নেহই আমার সেই ছিদ্র যে-পথে শনি হয়ে প্রবেশ করে তুমি আমার

সংসার ধ্বংস করেছ।” আর মা-বাবা দুজনেরই উপযুক্ত শিক্ষা হবে। প্রতিহিংসার উল্লাস আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। হঠাৎ মা বললেন, “রু একটু সরে বোস, ও কি অত ঝুঁকছিস কেন?”

আমি কল্পনা করছি মীলুকে ; ও মাথা কুটে কুটে কাঁদবে। দিদিমা, শান্তি, খোকা সকলকে মনে পড়ছে। ঠাকুমা বলতেন, ঠিক মৃত্যু সময়ে সকলের মুখ মনে পড়ে, আমার তাই হয়েছে নিশ্চয়, সকলকে মনে পড়ছে। সকলকে? হঠাৎ আমার কোনো মানুষ নয়—ভবানীপুরের আমার ঘরের দেওয়ালে যে ছবিটা টাঙান আছে, মখমলের টুপি পরা—যে ছবির দৃষ্টি তুমি যেদিকেই যাও তোমাকে অনুসরণ করে ফিরবে, সেই ছবিটা দেখতে পেলাম। সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমায় বলছে “ছিঃ তুমি এই? এত অল্পে পরাজিত হয়ে গেলে? তাহলে আমার গান তোমার জন্য নয়।” আমি যেন মোহাচ্ছন্ন অন্ধকার থেকে মুখ বাড়িয়ে সকালের আলো দেখতে পেলাম। বাবা হাত বাড়িয়ে আমাকে টেনে নিলেন, “সরে আয়, অত ধারে কেন?” আমি যে বাবাকে শিক্ষা দেব বলে ঝাঁপ দিতে চাইছিলাম তাঁরই গলা জড়িয়ে বুকে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলাম ।

মা খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, বলতে লাগলেন, “ও আবার কাঁদে কেন?” বাবা বললেন, “চারিদিকে সুন্দর দৃশ্য সুন্দর জায়গা দেখলে বরাবরই ওর চোখ দিয়ে জল পড়ে।” বাবা সবটা হাল্কা করে দিচ্ছেন— আর পারছেন না ওরাও—এ শোকভার সহ্য হচ্ছে না।

আমরা হরিদ্বারে ফিরে এলাম। বাংলোর বারান্দায় বসে আছি—নদীর শব্দ শোনা যাচ্ছে—কল্লোলিনী নদী, এদেশের প্রাণবহা পুণ্যসলিলা গঙ্গার ধারা আমাকে ধুইয়ে দিয়ে যাচ্ছে। আমি চোখ বুজে ভাবছি এতদিনে ঐ গানটার মানে বুঝলাম—

কখনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি শরমে সে হয় সারা।

ন হন্যতে ॥ দ্বিতীয় পর্ব

আমাদের অল্প বয়সে অর্থাৎ আমি যে সময়ের কথা লিখছি তখন থেকে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে সকলে অর্থাৎ বাঙালীরা ‘রবিবাবু’ বলত, ছোট বড় সকলেই। বিদেশে বলত তাগোর, তাগোরে বা টেগোর। আজকাল দেখি বাঙালীরাও ‘ট’তে একট ‘য’ফলা লাগিয়ে বলে ট্যাগোর, এর চেয়ে শ্রুতিকটু উচ্চারণ আর নেই। ‘রবিবাবু’ও উপযুক্ত সম্ভাষণ নয়, তবু ঐটাই চল ছিল। কেউ কেউ রবিঠাকুরও বলতেন, রবীন্দ্রনাথ বলা অনেক পরে চালু হয়েছে। রামানন্দবাবু কবি বলতেন, আমি তাঁর কাছ থেকে সেটা শিখেছিলাম। আমি জীবনেও তাঁকে গুরুদেব বলি নি। তাঁকে যে ‘গুরুদেব’ বলা হয় সেটা ধর্মগুরু হিসাবে নয়—। তাঁকে তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রর গুরু বলেছে শিক্ষককে যেভাবে গুরু বলা হত সেই অর্থে। তিনি ধর্মগুরু নন, শিক্ষক। সে অর্থে এ দেশের সকলেই তাঁকে গুরু বলতে পারে—কিন্তু তাঁর কবি পরিচয়টাই তিনি মনে করতেন সত্যতর। উনিশ শ' ত্রিশ সালটা তিনি প ুরোপুরিই প্রায় বিদেশে ছিলেন। শেষের দিকে রাশিয়া গিয়েছিলেন। রুশ পণ্ডিত বগদানফ একবার আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন, মনে হয় তিনি বাবার কাছে কবির রুশদেশে যাওয়া সম্বন্ধে কোনো বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন, বাবাও রুশদেশ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন কিন্তু সরকারী অনুমতি পান নি। একটা গল্প তিনি প্রায়ই করতেন- ~~যখন তিনি ইংলণ্ডে থাকতেন, তখন একজন উচ্চপদস্থ রুশ কর্মচারী তাকে নিমন্ত্রণ করে ভোজ খাওয়াতেন, বাবাও বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর কোন উদ্দেশ্য আছে। অবশেষে একদিন রুশ কর্মচারিটি অনুরোধ জানালেন যে বাবা যেন তাঁর সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লবীদের যোগাযোগ করিয়ে দেন—কারণ স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতকে সাহায্য করবার উদ্দেশ্য তাঁদের আছে। প্রত্যুত্তরে বাবা তাঁকে বলেন যে যোগাযোগ করিয়ে দেবেন ঠিকই যদি তিনি বলতে পারেন যে তাঁদের সাহায্যে ইংরাজকে তাড়াবার পরে কার সাহায্যে আমরা তাঁদের তাড়াব? বলা

বাহুল্য, সেই র্‍্যান্‍শ কর্মচারী এর সদুত্তর দিতে পারেন নি। এই গল্পটা খুব গর্বভরে বলতেন বাবা, কোনোরকম রাজনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল না। বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চাই তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য।

রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এসেছেন প্রায় আট-ন মাস। এর মধ্যে তাঁর সঙ্গে দু একবার দেখা হয়েছে কিন্তু কোনো কথা বলবার সুযোগ হয় নি। যখনই আমি গিয়েছি, বাবার সঙ্গে গিয়েছি নয়ত সেখানে কেউ উপস্থিত আছেন। 'নবীন' নামে নৃত্যোৎসব কলকাতায় মঞ্চস্থ হল, সেই সময় আমি দুদিন জোড়াসাঁকোয় গিয়েছি। কিছু বলা হয় নি। ঋষিকেশ থেকে ফিরে আমি তাঁকে একটা চিঠি লিখলাম। চিঠিতে কি লিখেছিলাম তা আমার একেবারেই মনে নেই। কিন্তু আমার মানসিক অবস্থার একটা আভাস দিয়েছিলাম মাত্র। খুলে কিছু লেখবার আমার সাহস হয় নি, লজ্জাও ছিল। সাহস হয় নি কারণ উত্তরটা যদি বাবা দেখতে চান তাহলে তো জানতে পারবেন।

এইখানে কবির সঙ্গে বাবার সম্পর্কটা একটু বলি। বাবা রবীন্দ্রকাব্য ভালো করে পড়েছেন, কাব্য ব্যাখ্যায় তিনি পারঙ্গম। কবির সম্বন্ধে তাঁর আকর্ষণ গভীর এবং প্রবল, তা সত্ত্বেও তাঁরা দুজনে সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র। সেজন্য তাঁর কবির প্রতি বিরূপতাও যথেষ্ট—অপর পক্ষে কবিও যে বাবার প্রতি খুব অনুকূল তা নয়। এমন অবস্থায় আমার বিপদটা অনুমেয়। বাবা জানেন আমি তাঁর কাছে সহজে পৌঁছতে পারি। তিনি আমার প্রতি অনুকূল। কাজেই আমি যখন কোনো চিঠি লিখি তখন বাবা চান তার মধ্যে তিনি তাঁর নিজের কথাটাও লিখে দেবেন, আমার চিঠি আর আমার চিঠি হয়ই না। এ আমার আর এক কষ্ট। ছোটবেলা থেকে এই কষ্ট পাচ্ছি আমি। বাবা বলে দেবেন, আমি চিঠি লিখব, তারপর বাবা তার বানান শুদ্ধ করবেন, ভাষা শুদ্ধ করবেন, ভাব ঢোকাবেন তারপর সে চিঠি যাবে এবং উত্তর এলে বাবা তার সমালোচনা করবেন; এ

বন্দীদশা সহ্য হয়? কবি একবার আমাকে হেসে বলেছিলেন, "তুমি যখন আমায় চিঠি লেখ তখন দর্শনশাস্ত্র না লিখে তোমার মনে সহজভাবে যা আসে যদি লেখ তাহলে ভালো হয়।" আমি জানি দুচারটে বানান ভুল থাকলেও তাঁর খারাপ লাগবে না। তাঁর অন্য ভক্তদের যে স্বাধীনতা আছে আমার তা নেই। আমি তো ইচ্ছে করলে তাঁর কাছে যেতেও পারি না।

এবারে আমি কাউকে না দেখিয়ে তাঁকে চিঠি লিখলাম। যথাসময়ে অর্থাৎ চিঠি পাবার দুদিন পরই যে উত্তরটা পেয়েছিলাম তা এখানে তুলে দিচ্ছি—

কল্যাণীয়াসু,

তোমার চিঠিতে যে বেদনা প্রকাশ পেয়েছে তাতে আমি অত্যন্ত পীড়া বোধ করলুম। জীবনের সঙ্গে সংসারের যদি অসামঞ্জস্য ঘটে তবে সেটা সহজে সহ্য করে ধীরে ধীরে সুর বেঁধে তোলা তোমার বয়স ও তোমার অভিজ্ঞতায় সম্ভব হয়ে ওঠে না। তোমাকে কি পরামর্শ দেব ভেবে পাইনে। নিজের অল্প বয়সের কথা মনে পড়ে, তীব্র দুঃখে যখন দিনগুলো কণ্টকিত হয়ে উঠেছিল তখন কোনোমতে সেগুলো উত্তীর্ণ হয়ে যাবার রাস্তা পাই নি। মনে করেছিলাম অন্তহীন এই দুর্গমতা। কিন্তু জীবনের পরিণতি একান্ত বিস্মৃতির ভিতর দিয়ে নয়, দিনে দিনে বেদনাকে বোধনার মধ্যে নিয়ে গিয়ে কঠোরকে ললিতে, অম্লতাকে মাধুর্যে পরিপক্ক করে তোলাই হচ্ছে পরিণতি। তোমার যে তা ঘটবে না তা আমি মনে করিনে—কেননা তোমার কল্পনাশক্তি আছে, এই শক্তিই সৃষ্টিশক্তি। অবস্থার হাতে নিস্ক্রিয়ভাবে নিজেকে সমর্পণ করে তুমি থাকতে পারবে না—নিজেকে পূর্ণতর করে তুমি সৃষ্টি করতে পারবে। আমি জানি আমাদের দেশের পক্ষে উদার শক্তিতে আত্মবিকাশ সহজ নয়—বাইরের দিকে প্রসারতার ক্ষেত্র তাদের অবরুদ্ধ—অন্তরলোকে প্রবেশের যে সাধনা সে সম্বন্ধেও আনুকূল্য তাদের দুর্লভ। তবু তুমি হতাশ হয়ো না—নিজের উপর শ্রদ্ধা রেখ, চারিদিক থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে

নিয়ে সেই গভীর নিভৃতে নিজেকে স্তব্ধ কর যেখানে তোমার মহিমা তোমার ভাগ্যকেও অতিক্রম করে। তোমার পীড়িত চিত্তকে সান্ত্বনা দেবার শক্তি যদি আমার থাকত তাহলে চেষ্টা করতুম। কিন্তু একান্তমনে তোমার শুভকামনা করা ছাড়া আমার আর কিছু করবার নেই। যদি বাহিরের কোনো ক্ষুদ্রতা তোমাকে পীড়ন করে থাকে তবে তার কাছে পরাভব স্বীকার করতে লজ্জা বোধ করো।

ইতি—১৪ই শ্রাবণ, ১৩৩৮

এই চিঠি পাবার ঠিক এক বছর আগে অর্থাৎ ১৩৩৭ সালের ভাদ্র মাসের শেষের দিকে মির্চা চলে গেছে। হিন্দু নিয়ম অনুসারে ভাদ্র মাসে মানুষ দূরের কথা পশুকেও তাড়ান হয় না—কিন্তু আমরা আধুনিক পরিবার ওসব কুসংস্কারে বিশ্বাসী নই।

চিঠিটা বহুবার পড়লাম। ভালো লাগছে তবু বিষাদে মন ছেয়ে আছে, আমার মনের যা অবস্থা এ চিঠি তার চেয়ে বহুদূরে। কলকাতায় ফিরে আমি খুব স্বাভাবিকভাবে চলছি। বাবা জানেন আমার মনে আর কোনো দাগ নেই কিন্তু মা এখন খুব চোখ খুলে আছেন। এখন বাড়ি শূন্য। শান্তি ও খোকা চলে গেছে, কাকা কাকীমাও, মির্চার ঘর খাঁ খাঁ করছে। ছোট্ট বোনটির জন্য একজন দক্ষ পরিচারিকা এসেছে, আমাকে আর বিশেষ কিছু কাজ করতে হয় না। সেদিন চিঠিটা হাতে নিয়ে বসে আছি মা এসে ঘরে ঢুকলেন। আমি মাকে চিঠিটা দিলাম। মা পড়ে আমার হাতে ফিরিয়ে দিলেন।

আমরা মাতাপুত্রী বসে আছি—অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে। আমি বললাম, "মা আমি একবার শান্তিনিকেতনে যেতে চাই, পাঠিয়ে দেবে?"

মা বললেন, "আমিই তোকে কয়েকদিন থেকে বলব ভাবছিলাম।" আমার মা খুব ভালো করে কথা বলতে পারেন। অনেক পণ্ডিত দেখেছি, পি. এইচ.

ডি-ও কম দেখলাম না, কিন্তু মার মত করে হৃদয় দিয়ে বুঝতে ও কথা বলতে কম লোককেই দেখেছি।

সেদিন সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে মা আমাকে কোলে টেনে নিয়ে বলতে লাগলেন, "রু তোমার জীবনে আশ্চর্য জিনিস তুমি পেয়েছ। এ সৌভাগ্য ক'জনের হয়? যে শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা সংসারের সম্বন্ধের সঙ্গে জড়িত নয়, স্বার্থশূন্য, জাগতিক প্রয়োজনের সঙ্গে সম্বন্ধরহিত সে ভালোবাসার স্বর্গীয় রূপ ক'জন দেখতে পায়? ক'জনের জীবনে ঘটে? তোমার জ্ঞান হবার আগে থেকেই যেন তুমি প্রস্তুত হয়ে রয়েছ—পুষ্প যেমন আলোর লাগি না জেনে রাত কাটায় জাগি—তারপর প্রতিদিন তাঁর কবিতায়, গানে, চিন্তায়, মননে তোমার মন ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। এ তো একটা তপস্যার ফল—নিজেকে ভেঙেচুরে ফেলে এ দুর্লভ সৌভাগ্যকে বিফল করো না। তুমি তাঁর কাছে যাও, মনে কোনো দ্বিধা সংকোচ না করে সব তাঁকে খুলে বল। আমি যা বুঝতে পারছি চিঠিতে তুমি সংকোচ করে লিখেছ। এটা ঠিক নয়। তোমার যখন এমন জায়গা আছে যেখানে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করতে পার, তোমার সুখদুঃখ পাপপুণ্য সমস্ত অকপটে বলে তুমি শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যাও মা। তিনিই তোমাকে পথ দেখাবেন।"

"মা আমি একলা যেতে চাই।"

"নিশ্চয়।"

কিন্তু আমি মার কথা রাখতে পারলাম না। কোন্ তারিখে কার সঙ্গে আমি শান্তিনিকেতনে পৌঁছেছিলাম, সে সময়টা দুপুর না বিকেল তাও ঠিক মনে পড়ে না।

তাঁর কাছে যখন আমি যাই সব সময়ই একটা দুর্গম পথ পার হতে হয়। বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটের মোড় থেকেই আমার বুক ধড়ফড় করে। দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলির মোড়ে এসে দ্রুততর হয়। যতক্ষণ না আমি তাঁর কাছে পৌঁছে কথাবার্তা

শুরু করি ততক্ষণ রীতিমত হৃদ্‌রোগাক্রান্ত—পাহাড়ে উঠতে গেলে যেমন অবস্থা হয়। সেদিন শান্তিনিকেতনের পথটা দুর্গমতম হয়েছিল—মনে হচ্ছিল বাতাসে সব অক্সিজেন ফুরিয়ে গেছে।

আমি যখন তাঁর ঘরে ঢুকলাম তখন তিনি ইজিচেয়ারে, বসেছিলেন, চারদিকে ছবি ছড়ানো তখন ছবি আঁকার যুগ চলেছে। উনি আমাকে হঠাৎ দেখে অবাক হন নি, আমি এমনি খবর না দিয়ে হঠাৎই আসি, বললেন "বৌমারা কেউ নেই, এখন আতিথ্যের জন্য গণপতিই ভরসা।"

আমি পায়ের কাছে বসে পড়লুম।

"তুমি ভূতুড়ে লেখাগুলো পড়বে?"—অর্থাৎ প্ল্যাঞ্চেটের লেখাগুলো। আমার তখন ভূতের দিকে মন নেই—বর্তমানের উৎপীড়নেই অভিভূত

"আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি।"

"হ্যাঁ, আমি তোমার দুটো চিঠিই পেয়েছি। কি হয়েছে অমৃতা?"

আমি চুপ করে বসে আছি— আমার মাথা হেঁট—আমি ওঁর ইজিচেয়ারের একটা অংশ ধরে আছি। কি করে বলি, কিই বা বলি। আর বলেই বা কি হবে, আমি কিছুতেই চাই না বাবার সঙ্গে এঁর মনোমালিন্য হয়ে যাক, তাহলে আমার সর্বনাশটা পুরো হবে।

উনি আমার হাতটা তুলে নিলেন, আমাকে সাহায্য করবার জন্য বলতে লাগলেন, "বল অমৃতা বল, কি হয়েছে?"

"আমাদের বাড়িতে সেই যে একজন ছেলে ছিল না..."

"কোন্ ছেলে?"

"আপনি তাকে দেখেছেন।"

"কে সে? আমি কোথায় দেখেছি?"

"এইখানে আমরা এসেছিলাম—"

"এইখানে এসেছিলে? কবে? তোমার কাকার কথা বলছ?"

"না, বাবার ছাত্র—"

"কোন্ ছাত্র? রবীন্দ্র সমিতির?"

"না। বলছি... সেই যে আমরা টেনিসকোর্টের কাছে বেড়াচ্ছিলাম, আপনার মনে নেই?"

"ও হ্যাঁ, সেই সায়েব? তারপর কি হল ?"

আমি সে কথার উত্তর না দিয়ে বললাম—"আপনি এতদিন চলে গেলেন কেন?" উনি একটু হাসছেন, এ সব কথার উনি খুব ভালো উত্তর দিতে পারেন। সামান্য একটু কথা দিয়ে সুধাসিন্ধু বইয়ে দিতে পারেন। প্রত্যেক সম্পর্কের মাধুর্য বিকাশ করে অথচ তাকে এতটুকু বিপর্যস্ত না করে, যথাস্থানে রেখে, তার থেকে যতটুকু পাবার তা গ্রহণ করে, তার পূর্ণ মূল্য চুকিয়ে দিতে পারেন। কারণ একই সঙ্গে নির্মম দূরত্ব বজায় রেখে অন্তরের গভীরতম স্থানে পৌঁছবার আশ্চর্য কৌশল তাঁর জানা আছে—"থাক থাক নিজ মনে দূরেতে—আমি শুধু বাঁশরীর সুরেতে পরশ করিব তার প্রাণ মন'। এ একটা শিল্প এতে কারু ক্ষতি হয় না—কেউ ধ্বংস হয় না, শুধু তার জীবনের দীপটা উজ্জ্বলতর হয়।

"চলে গেলুম কেন? ছবি দেখাতে...ছবি দেখাতে...এদেশে তো কেউ ছবি দেখতে জানে না...তা তুমি তো বারণ কর নি, তাহলে না হয় নাই যেতুম।" উনি আমার মাথাটা একটু নেড়ে দিলেন। জানি এটা পরিহাস কিন্তু মধুর।

"বল, কি হল সে সায়েবের, সে কোথায়?"

"চলে গেছে"...

আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। আমি ওঁর কাছ থেকে উঠে গিয়ে পশ্চিমদিকের দরজাটার কাছে উপুড় হয়ে কাঁদতে লাগলাম।

"এদিকে এসো অমৃতা, এদিকে এসো, আমি শুনি সবটা!"

আর আমার ক্ষমতা নেই উঠে যাবার বা বলবার। আমি ঝড়ে পড়েছি, কান্না থামিয়ে তিন-চার গজ দূরত্ব পার হয়ে আবার ওঁর কাছে যাওয়া? অসম্ভব।

আমি মার কথা শুনছি না। ওই সব কথা বলতে আমার বুক ফেটে যাবে। আমি কি করে বলব? কোথা থেকে শুরু করব ? কার দোষ? ওর, না আমার? আমি বুঝতে পারছি আমি অবাধ্যতা করছি—যদি সম্ভব হত আমি এখনই এই দরজা দিয়ে উড়ে মার কাছে ফিরে যেতাম, আমি এ পরীক্ষায় পাশ করতে পারব না। হঠাৎ বুঝতে পারলাম উনি চেয়ার ছেড়ে উঠে এসেছেন। আমার, পাশে একটা মোড়াতে বসেছেন—"অমৃতা, ওঠ, স্থির হও—"

আমি উঠলাম। উনি আমাকে ঠেসান দিয়ে বসতে সাহায্য করলেন—"তোমার কি আমাকে বলতে কষ্ট হচ্ছে ?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে কিছু বলতে হবে না। বলবার দরকার নেই। শান্ত হও, শান্ত হও।"

আমি শান্ত হবার চেষ্টা করছি।

উনি আবার বললেন, "তোমাকে কিছু আর বলতে হবে না, অমৃতা, শুধু বল, আমি তোমার জন্য কিছু করব? কোনো সাহায্য চাও?"

উনি সাধারণত যখন কারু সঙ্গে কথা বলেন তখন তার দিকে তাকিয়ে বলেন না। হয় নিচের দিকে, নয় দূরের দিকেই চেয়ে থাকেন বেশির ভাগ সময়। উনি মানুষকে সম্ভাষণ করছেন, সামনের ঐ ব্যক্তিটিকে নয়—তার সমস্যা মানুষের সমস্যা। একথা পরে বুঝেছি, তখন বুঝতাম না—তখন আমার অভিমান হত। এখন বুঝতে পারি মানুষ তার প্রেম ও আনন্দ নিয়ে, সুখ দুঃখ কাতরতা নিয়ে, তার হৃদয়ভরা জিজ্ঞাসা নিয়ে, তাঁর কাছে এসেছে। কোনো একজন ব্যক্তি নয়। এখন বুঝতে পারি এই নির্ম্মমতা না থাকলে তাঁর সংবেদনশীল মন এই দুরূহ কঠিন কর্ম্মসাগর পার হতে পারত না, জ্ঞানের ঐ পর্বতচূড়ায় পৌঁছতে পারত না, আঘাতে প্রত্যাঘাতে তা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেত। তিনি কোনোদিন কাউকে বলতেন না, আজ যেও না দুদিন থেকে যাও। অবশ্য অসুস্থ হয়ে

যখন দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন তখনকার কথা বলছি না, তখন আমাদের জন্য তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তেও আমি দেখেছি

কিন্তু সেদিন সেই দ্বিপ্রহরে তিনি আমার সঙ্গেই কথা বলেছিলেন,—"বল অমৃতা, বল, আমার দিকে তাকাও"—উনি আমার চোখের দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি যা বলবে আমি তাই করব।"

"তুমি যা বলবে আমি তাই করব"...কথাটা যেন নেচে উঠল,—তোমার সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত নাচাও যে ঝঙ্কারে'। সেই মুহূর্তে আমার মনের ভাবটা ঠিক কি রকম হয়েছিল তা বর্ণনা করবার আমার সাধ্য নেই—কিন্তু বর্ণনাটা আমি পরে পেয়েছিলাম যখন চণ্ডালিকা দেখতে যাই। চণ্ডালিনী বলছে—'আমার কূপ যে হলো অকূল সমুদ্র'—কূপ কি করে একটি কথায় অকূল সমুদ্র হতে পারে শত শত দর্শক যারা দেখছে তারা জানে কি? ওটা যে সত্য তা জানে কি? 'একটি গণ্ডুষ জলে'র মত একটি কথায় জীবনের গণ্ডীর মধ্যে অসীম নেমে আসতে পারে।

উনি আবার কথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন, "বল বল—কি চাও? তুমি যা বলবে আমি তাই করব।"

আমার শরীর মন জুড়িয়ে যাচ্ছে, আমি চন্দনের সুবাস পাচ্ছি—কি আর চাইবার আছে ? আমি বললাম, "আমাকে আপনার কাছে থাকতে দিন।"

"সে আর মুশকিল কি? এখানে ভর্তি হয়ে যাও না। ভোরবেলায় আমি যখন বারান্দায় বসব তখন তুমি গন্ধরাজ ফুল নিয়ে এসে আমার সঙ্গে বসবে। সন্ধ্যাবেলায় কবিতা পড়া হবে। কিন্তু আমার লেখার সময় কোনো গোলমাল করবে না।"

শান্তিতে আমার মন ভরে গেছে, আমি ভাবছি এ তো স্বর্গের বর্ণনা, আমার জীবনে এ কখনো হবে না, বাবা আমায় কিছুতে এখানে ভর্তি করবেন না।

পরে সেদিন আমায় তিনি বললেন, "আজ তো তোমাকে ছেড়ে দিতে পারছি না— তুমি আজ রাতটা ভালো করে ভেবে দেখ, কাল আমায় বলো আমি কিছু করতে পারি কি না। এসব কথার তো দু'মিনিটে মীমাংসা হয় না...তোমার চলনদারের যদি তাড়া থাকে ছেড়ে দাও...নেপালবাবু কাল তোমায় পৌঁছে দিতে পারবেন।"

সেদিন রাত্রে নিচের ঘরে একলা শুয়ে ঘুম তো আর আসে না। চারিদিক নিঝুম। যতক্ষণ ভৃত্যকুল জেগে ছিল ততক্ষণ একটু একটু শব্দ, শক্তিপদ বা গণপতির গলা পাচ্ছিলাম, আস্তে আস্তে সব নীরব হয়ে গেছে। আমি ভাবছি ওঁকে কি বলব! উনি কি কিছু করতে পারবেন? পারবেন না কেন? উনি এন্ড্রুজ সাহেবকে বলতে পারেন—"এই কন্যাটিকে আপনি ইউরোপে পৌঁছে দিন তাহলে আমারই কাজ করা হবে।" এন্ড্রুজ সাহেব নিশ্চয় করবেন। তিনি সাধু সন্ন্যাসী যাই হোন, মানুষের দুঃখ বোঝেন। কিন্তু তা কি এঁরা পারেন? বাবাকে বাদ দিয়ে? ইনি রামানন্দবাবু এঁরা দুজনে যদি বাবাকে ডেকে বলেন, "দেখুন নরেনবাবু এই যা আপনি করেছেন এটা ঠিক নয়—"তাহলে? তাহলে বাবার ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বলে যাবে। বাবা বলবেন, "দেখুন রবিবাবু আপনি যখন আপনার মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন তখন কি আমার সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন? আপনি খুব ভালো কবিতা লেখেন ঠিকই, কিন্তু আমার সংসারটা আমারই।" তখন? তখন কি রকম লাগবে? আমার জন্য কি উনি অপমানিত হবেন? তাছাড়া যাবই বা কোথায়? কার কাছে? এক বছর হয়ে গেছে সে একটি খবর দেয় নি – সেই যে এবাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল আর তার চিহ্ন নেই। খোকাকেও তো একটা চিঠি দিতে পারত? তাও দিল না। তবে? আমি কি উপযাচিকা হব? সব সংস্কৃত কথাগুলো মনে পড়ছে—স্বৈরিণী, উপযাচিকা ! ধিক্কারে আমার মন ভরে যাচ্ছে। যথেষ্ট হয়েছে। ইউরোপের মৃগয়াপটু নাগরিক, তোমার ঐ বিষাক্ত শর আমি তুলে ফেলব। তোমাকে ভুলব, ভুলব, ভুলব। আমি কাল সকালে

ওঁকে বলব আমার জন্য কিছুই করবার দরকার নেই। আমার মন শান্ত হয়ে গেছে। আমাকে কবি শিখিয়ে দিয়েছিলেন যখন মন উদ্বিগ্ন হবে তখন বলবে —‘আনন্দম্ পরমানন্দম্ পরম সুখম্ পরমা তৃপ্তি’—আমি বার বার বলতে লাগলাম, চন্দনের সুগন্ধে আবার সেই অন্ধকার রাত্রি ভরে গেল। আমার বুকের ভিতর যে দগদগে ঘা-টা এই এক বছরে একটু শুখায়নি তার উপর চন্দনের প্রলেপ পড়ল। খোলা জানালাটা দিয়ে বাইরের আকাশ দেখা যাচ্ছে—আমি ভাবছি এই তো কত সহজে ভুলে গেলাম। একদিন অর্ধচৈতন্যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ভুলব না—আজ সজাগ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে স্থির করলাম ভুলব, ভুলবই। জ্বলজ্বলে তারাটা তাকিয়ে আছে—এ তারার চোখ আছে, তা হাসছে, হাসছে, এই অব্যবস্থিত মনের উপর কৃপাদৃষ্টি মেলে হাসছে।...

ভবানীপুরের বাড়ি ছেড়ে আমরা ১৯৩১ সালেই অন্য বাড়িতে এসেছি। এ সময় থেকেই আমার মায়ের সুন্দর সাজানো সংসারটাতে ভাঙন ধরেছে। পুরানো লোকেরা সব চলে গেছে—এখন একজন নূতন মানুষ এসেছে যে ধীরে ধীরে এই সংসারের স্নেহভালোবাসার বন্ধনগুলি সব খুলে ফেলতে সমর্থ হচ্ছে। সেই মেয়েটির নাম রমা। তার আকৃতি সুন্দর নয়, মুখ চক্রাকার, চোখ বের করা, নাসিকা ঈষৎ বর্তুল এবং মুখের তুলনায় ছোট। সে খুব বেঁটে। কিন্তু তার গলার স্বর মিষ্টি। সে খুব আস্তে কথা বলে, নম্র এবং ভদ্র। তার শান্ত ভাব, আমরা যেরকম হুড়মুড়ে দুদ্দাড় সেরকম নয়। আমি তাকে খুব ভালোবাসতাম, তার কথাবার্তা প্রীতিপদ, সে বিদূষী। বিদূষী বটে অর্থাৎ পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়েছে। কিন্তু কবিতা একেবারে পড়ে নি। তার শিল্পরুচি নেই। এক লাইন লিখতে পারে না বা সুন্দর করে কথা বলতে পারে না, কিন্তু তার ধৈর্য আছে—একটা বিষয় নিয়ে পড়ে থাকতে পারে, যাকে বলে পারসিভিয়ারেন্স—তার প্রমাণ সে দিয়েছে ১৯৩১ সালে শুরু করে দশ বছর লেগেছে তার ডক্টরেট করতে! এ কর্ম আমার দ্বারা হত না। আমার ধৈর্য নেই। তাকে আমরা আপন জনের মতো কাছে টেনে নিয়েছি। মা যেমন আমাদের সেবা করছেন সব সময়, তারও করছেন। সে বাবাকে খুব সাহায্য করে। সব সময় তাঁর সঙ্গে থাকে, যখন কাজে যান তখনও। এই আগ্রহ আমার খারাপ লাগে না। শুধু ক্রমে ক্রমে সংসারে মার আসনটা নড়ে যাচ্ছে তাতে আমি পীড়িত। মাকে বাবা সব সময় বকছেন। মার ত্রুটি যেন বেড়েই চলেছে। আগে মা সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন, এখন যত দিন যাচ্ছে প্রতিদিনই যেন মা একটু একটু করে সরে যাচ্ছেন। মা কাতর, খুব খোসামোদ করেন। আমার তাতে লজ্জা বোধ হয়।

পৃথিবীতে যদি একজনও কেউ জানে তবে আমি জানি যে ভালোবাসার জন্য কোনো আত্মীয়সম্পর্ক প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমি এও জানি যে ভালোবাসা আলোর মত—তা সকলকেই উজ্জ্বল করে! সেটা তো একটা পদার্থ নয় যে এক

জনের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অন্যকে দিতে হবে! আমি আরো জানি ভালোবাসলে তার সম্পর্কে যে যেখানে আছে সবাই প্রিয় হয়—তার বাড়ির ভৃত্যটি পর্যন্ত আপন মনে হয়। সে ক্ষেত্রে আমি কি দেখছি? কেবল সাংসারিক অধিকার বাড়াবার চেষ্টা এবং মাকে অপদস্থ করবার চেষ্টা, আরো আমার অসহ্য হয়েছে মিথ্যার আশ্রয়—সত্যকে স্বীকার করলেই হয়। যত কষ্টই হোক সত্যের মুখোমুখি আমি দাঁড়াতে পারি কিন্তু আমি মার মতো চোখ বুজে থাকতে পারি না। কাজেই প্রতিটি দিন আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে আমাদের উপরও বাবার টান কমে যাচ্ছে। আমাকে যে কারণে বিদেশে বিয়ে দিতে রাজী হলেন না তাও তো শুনছি আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না বলে। কিন্তু এখন আমার পড়াশুনোর উপরও তাঁর টান কমে গেছে। আমার উপরও। আমি কলেজে ভর্তি হয়েছি। আমাদের সংসারের ভিতর যে একটা ভিন্ন স্রোত বইছে তা বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারে না। মা সবটা ঢেকে রাখছেন। কিন্তু নিরাপত্তাবোধ হারিয়ে ফেলেছেন। মার মনে হচ্ছে আমার খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়া দরকার। আমারও তাই মত। এ সংসারে আমার একটুও থাকবার ইচ্ছে নেই—আমি এখান থেকে পালাতে চাই। আমি নিজেই বুঝতে পারছি রাগে দুঃখে আমার ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছে, মিথ্যার সঙ্গে আপস করতে হচ্ছে বলে। আমি যা জানি, ভালো করে বুঝতে পারছি, তা যেন বুঝতে পারি নি, যেন তা নয় এইভাবে চলতে হচ্ছে বলে।

বছরের পর বছর গড়িয়ে চলেছে, প্রতিদিনই মার পক্ষে অপমানজনক ও অপ্রীতিকর কিছু ঘটে। বিশেষত বাইরের লোক এখন খুব নিন্দা শুরু করেছে। কাগজেও লিখছে! বাবার নিন্দা মাকে শুনতে হয়, সহ্য করতে হয়। আমি বুঝতে পারছি রমার ভালোবাসায় স্বার্থের খাদ বড় বেশি। শ্রদ্ধার ও ভালোবাসার পাত্রকে কেউ নিন্দিত অপমানিত করতে পারে? তার সংসারে বিশৃঙ্খলা, অশান্তি আনতে পারে? আমাদের দেশে নিন্দা একটা 'ইনস্টিট্যুশন', এই প্রতিষ্ঠানের

কাজ খুব বেড়ে গিয়েছে—মা যতই আড়াল করবার চেষ্টা করুন, ‘এও একটি আমার মেয়ে' বলে পরিচয় দিন, লোকের জিহ্বা বশ মানছে না। যা হোক এ কাহিনী মার জীবনী নয়, কাজেই এ-কথার বিশদ ব্যাখ্যায় তত প্রয়োজন নেই। শুধু এটুকু আমি বুঝতে পেরেছি—এই ভালোবাসার দুটো রূপ পাশাপাশি ঘেষাঘেষি করে বাস করে, একটা মানুষকে ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারে যেখান থেকে ক্ষুদ্র স্বার্থ দূর হয়ে যায়,যা চারপাশ আলোয় ভরে দেয়, যে আলো পড়ে সামান্য জিনিস অসামান্য হয়ে ওঠে, প্রিয় প্রিয়তর হয়—এমন কি অপ্রিয়ও প্রিয় হয়, কাউকে তাড়িয়ে দিতে হয় না। আর একটা, সেও ঐ একই নাম ধরে আসে, কিন্তু সে গলায় ফাঁস দিয়ে টানে, শিকল দিয়ে বাঁধে, সে বলে কৈ প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা বের কর, ইনসিওরেন্স আমার নামে লিখে দাও। বাড়িটা পেলেও ভালো হয়। বইয়ের কপিরাইট আমায় লিখে দাও, তোমার নাম খ্যাতিটাই বা নয় কেন? অন্তত আমি তোমার নামটা নেব।

মানুষ যেন সার্কাসের জানোয়ারের মতো দড়ির উপর দিয়ে চলেছে—চলতে জানলে ওপারে যথাস্থানে পৌঁছে দেবে, নৈলে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে।

মার দিনে রাত্রে ঘুম নেই, আমারও। কি করে এই বাড়ি ছেড়ে যাই, আবার ভাবি মাকে কার কাছে রেখে যাব? বাবা আমাকেও খুব বকেন আজকাল কারণ আমার চোখে তিনি নিশ্চয় নীরব ভ সনা দেখতে পান। যখন আমি বি. এ. পড়ি বন্ধুদের সঙ্গে চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম, এমন কিছু দুষ্য ব্যাপার নয়, তাতেই বাবা এত বকলেন যে আমি দিশাহারা হয়ে গেলাম। তারপর সেদিনটাও ভুলতে পারি না যেদিন যতীন দাসের মৃতদেহ নিয়ে প্রশেসন চলেছিল রসা রোড দিয়ে। আমি আমার সমবয়সী কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছি, কী উৎসাহ কী উদ্দীপনা। সুভাষ বোস চলেছেন আগে আগে। কত লোক চলেছে খালি পায়ে। বিচিত্র ধ্বনি উঠছে বাতাস ভেদ করে, সে জয়ধ্বনি আমাদের কানে এসে মন্ত্রের মত আমাদের অভিভূত করে দিচ্ছে, আমাদের সমস্ত মন টানছে নেমে যেতে, ঐ শোভাযাত্রায় যোগ দিতে। প্লাকার্ডে নানা কথা

লেখা আছে—তার মধ্যে দেখছি ঐ লাইনগুলি—'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই, ওরে ভয় নাই, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।' কবিতা আমার রক্তে চলে যায়, আমাকে ব্যাকুল করে তোলে, আমি বারান্দা থেকে আবৃত্তি করছি পরের লাইনগুলো যা ওখানে লেখা নেই—হে রুদ্র তব সঙ্গীত আমি কেমনে গাহিব কহি দাও স্বামী, মরণ নৃত্যে ছন্দ মিলায়ে হৃদয় ডমরু বাজাব—ভীষণ দুঃখে ডালি ভরে লয়ে তোমার অর্ঘ্য সাজাব—' কবিতাটা বলতে বলতে আমার মন যেন মন্ত্রাবিষ্ট হয়ে গেছে—ঐ পুষ্পাচ্ছাদিত শবাধারের দিকে চেয়ে আমরা যেন হিপ্নটাইজড্ । "ছুটকু চল ভাই আমরাও শোভাযাত্রায় যোগ দিই।"

"চল" তারপর একটু ভেবে, "তোর বাবা কিন্তু তোকে বকবেন।" "বকুন। চল যাই।"

আমরা সেই জনসমুদ্রে নেমে গেলাম। এমন ভীড় এর আগে কখনো দেখি নি। জগন্নাথের রথযাত্রায় দড়ি ধরেছি কিন্তু এ তার চেয়ে বেশি। হঠাৎ সাদা ঘোড়ায় চড়া এক গোরা সার্জেন্ট ভীড়ের মধ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে ঢুকলো। সেই নৃশংস আক্রমণে জনতা দলিত পিষ্ট হয়ে গেল। আমরাও কিছুটা আহত হলাম। বাড়ি যখন ফিরলাম তখন কাপড়চোপড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে, ধূলিধূসরিত অবস্থা। ভেবেছিলাম মিথ্যা কথা বলব—বললাম না। মনটা সে সময় এত উঁচু তারে বাঁধা ছিল যে মনে হল মহৎ মৃত্যুর অসম্মান করব যদি মিথ্যা কথা বলি। সত্যই বললাম। সেদিন বাবা আমায় এত বকেছিলেন যে আমার মাথার ভিতরটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল।

আমি কি করে স্বাধীন হব এই আমার সর্বক্ষণের চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মা তো আগেও স্বাধীন ছিলেন না, ইচ্ছেমতো কাউকে কুড়ি টাকাও দিতে পারতেন না—লুকিয়ে ছাড়া। তবু তখন বাবার উপর তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল, বুঝিয়ে অনেক কিছুই করতে পারতেন, এখন আর কোনো প্রভাব নেই। বাবা মাকে খুঁটিনাটি

নিয়ে সর্বক্ষণ বকছেন। আমি মাঝে মাঝে ভাবতাম যারা নিজের স্বাধীনতা ভালোবাসে তারা অন্যকে পরাধীন করে রাখে কোন যুক্তিতে? অবশ্য এই যুক্তি-হীনতাই তো সর্বত্র, কি পরিবারে, কি রাষ্ট্রে! 'Rule Britania rule the waves— Britons will never never be slaves' অথচ সেই ব্রিটনরাই তো আমাদের পরাধীন করে রেখেছে, শুধু আমাদের কেন আরো কত জাতিকে, আবার সেটাও তাদের গর্ব——Sun never sets in British Empire : মানুষ যুক্তির প্রয়োগ করে কমই।

মা পাত্রের সন্ধানে উদব্যস্ত। রীতিমত একখানি খাতা করা হয়েছে তাতে উপযুক্ত পাত্রদের নাম, গুণাবলী, তাদের অভিভাবকদের নাম-ঠিকানা সব লেখা হয়েছে। ভালো পাত্র অর্থাৎ দামী সরকারী চাকরি করবে, বিষয় আশয় থাকবে আবার বিদ্যাও থাকবে এমন পাত্রের আকাল সব সময়ই। তখন আরো ছিল। একটি উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পেলে সমস্ত অবিবাহিত কন্যার মায়েরা জাল পাততেন। সেই সময়ে নিন্দার প্রতিষ্ঠানটির একটি উপশাখা 'ভাংচির' কাজ শুরু হয়ে যেত। মা সেই ভয়ে ভয়ে আছেন। একে তো মির্চার কথা আত্মীয়স্বজন অনেকে জেনে গেছেই—আবার বাবা এই কাণ্ড শুরু করেছেন, তা না হলে রূপ, গুণ, বিদ্যায় ফেলনা মেয়ে তো নয়, এত ভাবনা কেন?

এই সময় থেকে ভাবছি এদেশের সবচেয়ে যে বড় অন্যায় জাতিভেদ তার জন্য আমি কিছু করব। কি করে কি করি! কেই বা আমার কথা শুনবে? আমি ছাড়া। তাই বাবাকে একদিন বললাম, "তোমরা তো আমার বিয়ে দেবে তা অন্য জাতে দেও না কেন? তাহলে তো খুব ভালো হয়।"

"অন্য জাতে?" বাবা বিস্মিত। "কেন আমাদের জাত দোষটা করল কি?"

"তাহলে বিয়েও হয়। দেশের একটা কাজও হয়।"

বাবার বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, "কি! বিয়েও হয়, দেশের একটা কাজও হয়! আমি ওসব রিফর্মেটরি ম্যারেজের মধ্যে নেই।"

একটি পাত্র এল, ডাক্তার, দামী সরকারী চাকুরে, বিষয়আশয় বোধ হয় 'লবডঙ্কা', তা হোক আসল দোষ হচ্ছে রংটি বেশ ঘোর কৃষ্ণ। আমরাও তো বর্ণবিদ্বেষী কম নয়। মা খুব কাতর হয়ে বলছেন, "বড্ড যে কালো রে, কি করি?"

আমার খুব মজা লাগছে, ভাবলাম বলি, ফর্সা তো আবার তোমাদের পছন্দ নয়। থাক, ও সব কথা না তোলাই ভালো। ডাক্তারের বৃদ্ধ বাবা আমাকে ছাড়তেই চান না, কিন্তু ডাক্তারের আমাকে পছন্দ হল না। তাঁর একটা নিজস্ব মত ছিল। তিনি বাঙালি জাতির উন্নতির জন্য চিন্তিত। দোষ দিতে পারি না, আমি যেমন জাতিভেদ দূর করে বাঙালি জাতির আত্মিক উন্নতির জন্য চিন্তা করি তিনিও দৈহিক উন্নতির চেষ্টা করছেন। তাঁর নিজের উচ্চতা পাঁচ ফুট তিন চার ইঞ্চি হবে, তাই তিনি অন্তত পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি মেয়ে খুঁজছেন। আমি তো পাঁচ ফুট দুই বা তিন। তাঁর ধারণা ছেলে যদি বেঁটে হয় তার লম্বা মেয়ে দরকার। তা না হলে বেঁটের সঙ্গে বেঁটের বিয়ে হলে বাঙালি জাতির ভবিষ্যৎ কোথায়? ঐ পাত্রটি উচ্চপদে আছেন, তাই স্বজাতির ঘরে যত অবিবাহিত কন্যা আছে মেপে মেপে বেড়াচ্ছেন, অবশেষে এক বাড়িতে গিয়ে দেখেন পাত্রীর দিদিমা খুব লম্বা । রোগা লম্বা, চ্যালা কাঠের মত শরীর বৃদ্ধার। তা তিনি রসিকা মন্দ নন। তাঁকে দেখে ডাক্তারের ভালো লেগেছে—"আপনি তো খুব লম্বা।"

তিনি তাঁর রোগা লিকলিকে হাতখানি ঘুরিয়ে উত্তর দিলেন, "তাহলেও তো তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না বাপু।"

শুনেছি ঐ পাত্রের আর কোনদিন বিয়েই হয় নি, মাপসই পাত্রীই পাওয়া গেল না। পাত্রের বৃদ্ধ বাবা আমাকে খুব স্নেহ করেছিলেন, তিনি তাঁর মৃত্যুশয্যা থেকে আমার বাবাকে লিখেছিলেন, 'আমার মূর্খ ছেলে অমন লক্ষ্মীকে আমার ঘরে এনে দিল না, কিন্তু আমি আশীর্বাদ করে যাচ্ছি আমার ছেলের চেয়ে শতগুণে

ভালো ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হবে।' সেই স্নেহপরায়ণ বৃদ্ধের জন্য আমি এইখানে একটি প্রণাম রেখে দিলাম।

অবশেষে পাত্র পাওয়া গেল। বাঁচলাম। মা ঠিক করেছিলেন ভাংচির আপিসে খবরটা পৌঁছবার আগেই কাজটা সেরে ফেলা ভালো। কাজেই ঠিক পাঁচদিনের মধ্যেই বিয়ের ব্যবস্থা হল। পাত্র বিদ্বান ব্যক্তি, বাবা বলছেন, "পাঁচ বছরে ডক্টরেট করেছে, কম কথা নয় !" মা বলছেন, "তোমার ছাত্র ছাত্রীরা তো ঘেসটাচ্ছেই, ঘেসটাচ্ছেই, কত দিনে করবে?"

বাবা খুব রেগে গেছেন, "সায়েন্স আর আর্টস এক হল ? সায়েন্সে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় !"

আমার বাবা পাত্রকে নিমন্ত্রণ করে এলেন। কিন্তু তিনি এলেন না। পরে শুনেছি তাঁর না আসবার কারণ হচ্ছে তিনি শুনেছিলেন পাত্রী সুন্দরী। দেখতে এসে তিনি যদি প্রেমে পড়ে যান যার সম্ভাবনা খুবই আছে, আর মেয়েটি যদি তাঁকে দেখে বিমুখ হয় যার সম্ভাবনাও ততোধিক—তাহলে? কাজেই কাজ কি গোলেমালে! দেখাশোনার চেষ্টা না করাই ভালো। জীবনে এই প্রথম ও শেষ বোধহয় তিনি নিজের জন্য একটি চাতুরী অবলম্বন করেছিলেন।

বিয়ের আয়োজন এগিয়ে চলেছে। আত্মীয়স্বজন কেউ আসতে পারবে না। অত তাড়াতাড়ি আসবে কে? মাও তো সুস্থ নন। মন খারাপ হলে যে অসুখ হয় মার তারই সুত্রপাত হয়েছে—গ্যাস্ট্রিক আলসারের মতো। মার অস্থির লাগছে, শত হলেও তাঁর মেয়ে তো পূর্ববঙ্গের গ্রাম থেকে আসে নি, এত লেখাপড়া কবিতা লেখা ইত্যাদি করে নামডাক হবার পর একেবারে দেখাশোনা না করে গ্রাম্যবিবাহ! মা খুঁত খুঁত করছেন। অবশেষে একদিন বললেন, "আমি যাই ওকে ডেকে নিয়ে আসি। তুই তো দেখবি একবার? না দেখে কি করে হয়?"

"কখনো না—কোনো দরকার নেই।"

"দরকার নেই? দেখতে চাস না?"

"মা তোমার লজ্জা করে না একথা আমাকে বলতে? কি জন্য দেখব? ধর যদি দেখে আমি বলি, একে আমার পছন্দ হয় নি, আমি অমুককে বিয়ে করব, সে অন্য জাত, তা হোক আমার তাকেই পছন্দ, তাহলে তোমরা শুনবে? তোমরা তো তখন যুক্তি বিস্তার করবে, তবে?"

"বাঃ, অপছন্দই বা হবে কেন? পুরুষ মানুষের চেহারাই তো সব নয়। ধলামূলো কত আছে?"

"মা, বাজে কথা বোলো না। তোমরা সব এক– তোমাদের সত্যকে স্বীকার করবার সাহস নেই। আর তুমি, তুমিই সবচেয়ে দোষী। তুমি চোখ বুজে থাক।"

মা কাঁদতে শুরু করেছেন–"তোদের জন্য যত করি তোরা সকলে মিলে আমাকে তত বকিস।"

কথাটা সত্যিই। মার উপর রীতিমত নির্যাতন করি আমি। কথায় কথায় আমার রাগ। সাবি গেল ও বাড়িতে। ফিরে এসে আমার গলা জড়িয়ে কাঁদতে শুরু করেছে–"ও দিদি তুই এখানে বিয়ে করিস না, করিস না, আমার একটুও পছন্দ হয় নি।" আমি খুব হাসছি। মনে মনে বলছি, আমি যাকে পছন্দ করি তুমি তো তাকে তাড়াও। মুখে কিছু বলছি না, ও নিশ্চয় সে সব কথা ভুলে গেছে। ছেলেমানুষ। ভুলে যাওয়াই ভালো। কেন যে এ রকম একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটল আমার জীবনে। জীবনের উপর তো রবার চালানো যায় না। যে ছবিটা একবার আঁকা হয়ে গেছে তা আর মোছবার সাধ্য নেই। সাহিত্যে যায়। দেখি তো কবিকে কেটে কেটে লাইন বাদ দিচ্ছেন, পাতার পর পাতা লেখা বরবাদ হয়ে যাচ্ছে–কিন্তু জীবনে যে লেখাটা হয়েছে তার উপর আর রবার চালান যাবে না। যদি যেত আমি এই মুহূর্তে সমস্ত শক্তি দিয়ে রবার ঘষে ঘষে উনিশ শ' ত্রিশ সালটা মুছে ফেলতাম। আমার জীবনের বৃত্ত থেকে ঐ বছরটা শুকনো পঃাতার মত উড়ে চলে যাক, যেমন মির্চার প্রতি ভালোবাসাটা গেছে। তার মুখও আর আমার মনে পড়ে না, পড়লে হর্ষও হয় না বিষাদও নয়। চার বছর তো হয়ে গেল আর কতকাল মনে থাকবে।

আশীর্বাদের দিন থেকে আমি কাঁদতে শুরু করেছি। অবিশ্রান্ত কাঁদছি, কিছুতেই সংবরণ করতে পারছি না। কেন কাঁদছি নিজেই জানি না। যদি কেউ বলতো "থাক তবে তোমার আর বিয়েতে দরকার নেই"—আমি কি রাজি হতাম? কখনো নয়। কত কষ্টে বলে এ বাড়ি থেকে বেরুবার দরজাটা পেয়েছি। আমি স্বাধীন হতে পারব। আর কিছু না হোক শান্তিনিকেতনে তো ইচ্ছে মতো যেতে পারবো। কিন্তু তবু আমি কাঁদছিই, কেন কে জানে ? লোকে ভাবছে পিতৃমাতৃভক্ত কন্যা, এঁদের ছেড়ে যেতেই বোধ হয় কাঁদছে। ঠিক তার উল্টো। আমার কিছু ভালো লাগছে না।

বিয়ের দিন ভোরবেলা সানাই বাজছে। দধিমঙ্গল হয়ে গেল। আমার একজন ব্রাহ্ম জ্যাঠামশাই খুব ভালো গান করতেন। তাঁর একটি সুন্দর অন্তর্জীবন ছিল। তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করতাম। তিনি কয়েকটি গান করলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'জ্যেঠামশাই আজ রাত্রে আপনি আমায় একটা গান শুনিয়ে যাবেন।' বিয়ে হয়ে গেল।

এই সময় কবি সিলোনে ছিলেন। বাবা টেলিগ্রামে আশীর্বাদ চেয়েছিলেন, টেলিগ্রামেই আশীর্বাদ এসেছে। বিয়ের সময় থেকেই আমি বুঝতে পেরেছি আমার জীবনটা এলোমেলো হয়ে গেল—আমি একে গুছিয়ে নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারব তো?

রাত্রে বাসরঘরে কড়িখেলা হচ্ছে আমি দেখলাম ঘরের সামনে দিয়ে জ্যেঠামশাই যাচ্ছেন। আমি কড়ি খেলা 'ফেলে রেখে উঠে এলাম,—একটা গান শোনা আমার বড় দরকার, কড়িখেলা নয়। জ্যেঠামশায় বিশ্বাসই করতে পারেন নি যে আমি উঠে আসতে পারব। তিনি বিস্মিত এবং হৃষ্ট। জ্যেঠামশায় বারান্দায় বসে গান করলেন—

'মোদের কে বা আপন কে বা অপর, কোথায় বাহির কোথা বা ঘর—ওগো কর্ণধার চেয়ে তোমার মুখে মনের সুখে নেব সকল ভার—আমাদের যাত্রা হলো

শুরু এখন ওগো কর্ণধার তোমারে করি নমস্কার'—

"যাও মা তোমার ঘরে যাও — নির্বিঘ্ন হোক তোমার সংসারযাত্রা—"

আমার স্বামীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমায় আশীর্বাদ করে আমার বাবা-মা চলে গেলেন বাসরঘরের দরজাটা বন্ধ করে। আমার স্বামীর বয়স চৌত্রিশ বছর, তিনি আমার চেয়ে চৌদ্দ বছরের বড়। আমরা পরস্পরকে দেখছি। ইনি দেখতে ভালো নয়, আরো ত্রুটি আছে কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি একান্ত ভালো লোক, আমার ভয়ও করছে না, বিরক্তও লাগছে না। আমি সবুজ ডুরে সুতির শাড়ি পরে আছি, আমার কপালে কনেচন্দন কিন্তু সিঁথিতে সিঁদুর নেই—কারণ কুশণ্ডিকা হয় নি। কুশণ্ডিকা না হলে বিবাহ সম্পূর্ণ নয়। এমন অবস্থায় হিন্দু সমাজের সাধারণ নিয়মে বর কনে এক ঘরে থাকে না। ঘরে কয়েকজন বালকবালিকা অন্তত পাহারা থাকে। কিন্তু আমরা ও সব কুসংস্কার মানি না আমরা তো আধুনিক।

আমি ভাবছি একেবারে চেনা নেই, একজন ভদ্রলোককে এই প্রথম দেখলাম, এর সঙ্গে এক বিছানায় কি করে শোয়া যায়! আমার কোনো ভয় নেই শুধু অস্বস্তি। আমি বললাম, "আমি মাটিতে কার্পেটে শোব।" উনি বললেন, "তা হয় না তাহলে আমিই শোব।" তা কি আর হয় হাজার হলেও এটা আমাদের বাড়ি, ইনি অতিথি। বেশ খানিকক্ষণ বিতর্কের পর আমি বললাম, "তাহলে এখানেই শুচ্ছি।" প্রথম দিনই অবাধ্যতা কিছু নয়। কথা বলবার আমি কিছু খুঁজে পেলাম না। ইনি তো কোনোদিনও পান না, সেদিনও পেলেন না। সেটা আমার লক্ষ্য হল না। আমি একটা চাদর মুড়ি দিয়ে ওঁর দিকে পিছন ফিরে শুতে শুতে বললাম, "আমি ভোর পাঁচটায় উঠতে চাই তখন জ্যেঠামশায় আসবেন, আপনি যদি আমার আগে ওঠেন আমায় একটু জাগিয়ে দেবেন?"

আলো নিবিয়ে আমরা শুয়ে পড়েছি, তারপর একটা কাণ্ড হল। যে মির্চাকে আমি আজ চার বছর দেখি নি তাকে দেখলাম। একটা মহাদেশ পার হয়ে, ভারত সাগর পার হয়ে সে হঠাৎ এই বন্ধ দরজার ভিতর দিয়ে এসে ঢুকল। যখন সে আমাদের বাড়িতে ছিল তখন ভূমিকম্পের দিন ছাড়া কোনোদিন আমি তাকে এত রাত্রে দেখি নি বা এক শয্যাতে বসিও নি, আর আজ ? আজ সে আমার বাসরশয্যাতে এসে বসল। আমি অবাক হয়ে গেছি– "মির্চা এতদিন তোমার কথা ভুলে গিয়েছিলাম–"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, কিন্তু আজ সকাল থেকে ভাবছি।"

"কি ভাবছ?"

"ভাবছি তুমি আসছ না কেন? তুমি তো হিমালয়ে তপস্যা-টপস্যা করেছ তাই ভাবছিলাম এমনও তো হতে পারে যে তোমার, কোনো শক্তি হয়েছে, তুমি চলে আসবে এবং বাবাকে বোঝাতে পারবে, তা তো এলেই না।"

"এই তো এসেছি– ""

"এখন তো অনেক দেরী হয়ে গেছে–'

"কিসের দেরী? আগেই বা কি পরেই বা কি, দেরীই বা কি শীঘ্রই বা কি?" এই বলে সে আমার হৃৎপিণ্ডের উপর মুখ রাখল—ঐখানেই তো রক্তবহা শিরা উপশিরা তার চুম্বনে দলিত পিষ্ট হয়ে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল ফোঁটা ফোঁটা করে, খাট বেয়ে গড়িয়ে গিয়ে বারান্দা দিয়ে নিচে প্রতাপাদিত্য রোডের উপর পড়ে তার ধারা গঙ্গার সন্ধানে চলল–পতিতপাবনী গঙ্গে, তুমি আমার রক্তস্রোতকে সমুদ্রে নিয়ে যাও–আমার শরীর থেকে সমস্ত রক্ত চলে যাক–নূতন রক্ত হবে, নূতন জীবন হবে, আমি সকালবেলা নূতন জীবনে জেগে উঠব ।

যখন ঘুম ভেঙে গেল তখন দেখলাম আমার স্বামীই আমার ঘুম ভাঙিয়েছেন– তিনি বললেন, "তুমি বলেছিলে পাঁচটার সময় উঠবে–এখন পাঁচটা বেজেছে–" আমি অবাক হয়ে দেখছি, আমার মনে হল–এই ব্যক্তি বিনিদ্র ছিল। আমি

জিজ্ঞাসা করলাম, “আপনি কি সারারাত ঘুমোন নি?” তিনি মৃদু হাসলেন, “হ্যাঁ, তুমি বলেছিলে পাঁচটায় উঠিয়ে দিতে, পাছে ঘুমিয়ে পড়ি তাই জেগেই ছিলাম।”

এই আমার স্বামী। তারপর দীর্ঘকাল আমরা একসঙ্গে চলেছি, উনি চিরদিন আমার প্রতি এই রকমই অতন্দ্ৰ আছেন।

সকালবেলা বাবা একটা চিঠি দিলেন। এই চিঠিটা আমার স্বামী আমাকে লিখেছেন কিন্তু অতিরিক্ত ভদ্রতা হেতু সোজা আমাকে না পাঠিয়ে আমার বাবার নামের খামের মধ্যে অন্য একটা খামে আমার নাম লিখে পাঠিয়েছেন। চিঠিটা ইংরেজিতে লেখা। অনুবাদ না করে ইংরাজিটাই তুলে দিচ্ছি। চিঠিটা দু'দিন আগে এসেছে আমি আজ পেলাম। পত্রলেখকের উদ্দেশ্য ছিল যেহেতু আমাদের দেখাশোনা হয় নি চিঠির মারফৎ কিছুটা নিজের ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেওয়া। চিঠিটা এই

Mademoiselle,

Understanding that you are going to choose a partner in life I beg to offer myself as a candidate for the vacancy. As regards my qualifications I am neither married nor am I a widower; I am in fact the genuine article-a bachelor what is more I am a real ripe bachelor, being one of long standing.

I should in fairness refer also to my disqualifications. I frankly confess that I am quite new to the job and I cannot boast of any previous experience in this line-never having had occasion before to enter into such partnership with anyone. This my want of experience is likely. I am afraid, to be regarded as a handicap and disqualification. May I point out, however, that

though want of experience is likely, I am afraid, to be regarded as handicap and a disqualification in other avenues of life, this particular line is the only one where it is desirable in every way. A more likely handicap is the fact that I am an old bachelor with confirmed bachelor habits. Lest fears be entertained about my ability to adapt myself to the new conditions, may I draw your attention to the fact that I am not such a hopeless case as Sir P. C. Ray.

For further particulars I beg you to approach your mother who studied me the other day with an amount of curiosity and interest that would have done credit even to an eminent Egyptologist examining a rare mummy.

In fine permit me to assure you that it will be my constant endeavour to give you every satisfaction.

I have the honour to be
Mademoiselle
Your most obedient servant

17th June, 1934

চিঠিটা পড়ে আমি অবাক হয়ে গেছি—ঝড়ের দুর্যোগের মধ্যে এক পশলা রোদের ধারা। হাসির মত জিনিস আছে? আমি হাসতে হাসতে মাকে দিলাম, "চিঠিটা তোমরা পড়েছ?"

"হ্যাঁ, তোর বাবা একটু একটু..."

"আমাকে কাল দাও নি কেন ?"

"আমরা ভালবাম কি জানি, কে কি লিখল-"

"কি জানি কে কি? নিচে তো নাম দেওয়াই আছে—" আমি ভাবছি কাল চিঠিটা পেলে দু'একটা কথা বলার বিষয় পাওয়া যেত, অন্তত বলতে পারতাম —"আপনি তো খুব হাসাতে পারেন!" তা হল না। কি যে করেন এঁরা!

এ বাড়ি থেকে আমি প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাব, তারপর চলে যাব হিমালয়ের দূরতম প্রান্তে কোনও নির্জন স্থানে যার নামও কেউ শোনে নি। দেওয়ালে যে একটা প্রকাণ্ড ম্যাপ টাঙানো আছে সেখানে খুঁজে দেখেছি ঐ পাণ্ডববর্জিত দেশটির নাম কোথাও নেই। বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় বাবা ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে লাগলেন। আমি তো কাঁদছিই অবিরাম। বাবার উপর সব অভিমান চলে গেছে, আমি ভুল বুঝেছিলাম, যা করেছেন আমার ভালোর জন্যই করেছেন। রমার জন্যও আমার মন কেমন করছে, আমার বিয়েতে ও কম তো খাটে নি।

আমার বিয়ের তিন-চার দিন পর কবি সিলোন থেকে ফিরেছেন। তাঁর সঙ্গে আমরা দেখা করতে যাব কিন্তু আমি বাবার সঙ্গে যেতে রাজি নই। সাহস করে বললাম, "তোমরা আগে যাও আমি পরে একলা যাব।"

বাবা খুব গম্ভীরভাবে বললেন, "বেশ কথা, আমি আমার জামাইকে নিয়ে সকালে যাচ্ছি তুমি দুপুরে যেয়ো।"

দুপুরবেলা আমি গাড়িতে একলা যাব ভেবেছি তা রমা আমার সঙ্গে চলল। ও যে কেন এল জানি না, ওর সঙ্গে কথা বলবারও আমার ইচ্ছে হচ্ছে না। আমার মনের ভিতরটা একটা অদ্ভুত আবেগে কম্পমান, কি কারণে আমি এত অস্থির ও উদ্ভ্রান্ত তা জানি না। ঘোরান সিঁড়িটা দিয়ে আমি দ্রুত উঠছি, আমার পরনে বেনারসী, তার আঁচলটা লুণ্ঠিতহচ্ছে, রমা তুলে দিচ্ছে– হাতে গলায় কানে গয়না, মাথায় সিঁথি, পায়ে নূপুর ও নূতন সিঁদুরে আমার বধূবেশ সম্পূর্ণ। উনি অপেক্ষা করছিলেন—আমাকে দেখেই দুই হাত বাড়িয়ে দিলেন —"এসো অমৃতা—"

আমি তাঁর কোলের উপর পড়ে কাঁদতে লাগলাম। আমি শুনতে পেলাম, উনি বললেন, "রমা, তুমি পাশের ঘরে গিয়ে একটু বসো, আমি ওর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলব।"

রমা চলে গেল। উনি আমাকে একটুক্ষণ সময় দিয়ে তারপর বললেন, "উঠে বোসো।" আমি উঠে বসলাম। উনি বলতে লাগলেন—"আমি উপদেশ দিতে ভালোবাসি না! বড় বড় কথার পাথর চাপিয়ে আমি আর্ত মনকে আরো ক্লান্ত করে দিতে চাই না। তবু আজকে আমার তোমাকে কয়েকটা কথা বলতেই হবে।" একটুক্ষণ নীরবতার পর—"তোমার বাবা আজ সকালে ছেলেটিকে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে আর কি কথা বলব? কেবল পণ্ডিতরাই এরকম নিষ্ঠুরতা করতে পারে। কিন্তু তোমার উপর কেউ নিষ্ঠুরতা করেছে বলে তুমিও নিজের উপর নিষ্ঠুরতা করবে এটা কোনো কাজের কথা নয়। আর কেউ আমাদের হাতে নেই অমৃতা, আমরা কেবল নিজেই নিজের হাতে আছি। আমি জানি না যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে তিনি কেমন, তাঁর পারিপার্শ্বিক তোমার অনুকূল কিনা, কিন্তু অবস্থা যেমনই হোক, ভাগ্য যেমনই হোক, তুমি তার চেয়ে বড়ো হবে। আমি আশা করছি, তুমি তোমার চারপাশে যারা আছে তাদের সকলকে সুখী করবে, সবচেয়ে বড় কথা নিজে সুখী হবে। যদি তুমি সুখী না হও অমৃতা, যদি তুমি ভেঙে পড়, পরাজিত হও প্রতিকূল অবস্থার হাতে, তাহলে আমি মনে করব সে আমারি পরাজয়। কিন্তু আমি জানি তা হবে না। তুমি নিশ্চয়ই পারবে। যদি তুমি একখানি নীড় তৈরী করতে পার যেখানে তোমার আনন্দের সংসারে সকলে আনন্দিত তাহলে আমি কথা দিচ্ছি আমি যাব তোমার সেই ঘরে।"

উনি পরম স্নেহে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, আমি নিচু হয়ে তাঁর পায়ের উপর মাথা রাখলাম— নরম মসৃণ পায়ের পাতা চুম্বন করে বললাম —"তাই হবে, তাই হবে, তাই হবে।"

বাড়ি ফিরে রমা গোপনে বাবাকে সব বলে দিল। কি বললে কে জানে? আড়ি না পাতলে তো ওর জানবার কথা নয়। আর আড়ি পাতলেও তো এমন কোন কথা হয় নি যা নিন্দনীয় বা আমি কোনো নালিশ করেছি। আমার অশ্রুজল যদি নালিশ হয় তাহলে তো নাচার। কিন্তু সেদিন বাবা আমাকে এমন

বকলেন অমন ভয়ানক বকুনী আমি আগে আর কখনো খাইনি। সে আর থামেই না, থামেই না। আমাদের সে যুগটা ছিল অদ্ভুত, গুরুজনেরা মনে করতেন ধমক দিয়ে কান্না থামাবেন, ধমক দিয়ে হাসাবেন ও ধমক দিয়েই ভালোবাসাবেন। যাহোক আমি সেদিন ভেবেছিলাম এই যে চলে যাচ্ছি আর কোনোদিনও আসব না, কিন্তু সেটা একটা অভিমানের কথা। আমার নির্জন গিরিবাস থেকে আমি প্রতি দু'মাস অন্তর একবার করে সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করে এসেছি বাবাকে দেখব বলেই।

ধমকের দৌড় যে কতদূর পর্যন্ত পৌঁছয় তা এ যুগের লোক বিশ্বাস করবে না। বেশ কিছুদিন পর্যন্ত মা খবর নিতেন আমাদের স্বামী-স্ত্রীর ভাব কতদূর এগিয়েছে, যখন টের পেতেন বিশেষ কিছু এগোচ্ছে না, তখন খুব রাগ করতেন।

কিন্তু উদ্বেগের কারণ ছিল না, ভাব আমাদের হয়ে গেল।

আমি যখন সেই নির্জন গিরিবাসে এলাম তখন বর্ষাকাল---গভীর আদিম অরণ্য পার হয়ে যখন বাড়িতে, এসে পৌঁছলাম তখন সেই বাগানঘেরা বাড়িটা যেন আমার দিকে চেয়ে হেসে উঠল। শান্ত নির্জন বনভূমি—দূরে নীলাভ দিগন্তে বরফের সাদা রেখা। গৃহ সুসজ্জিত, ভৃত্যকুল পরিমার্জিত। আমাকে 'ব্যাচিলারের' এলোমেলো বাড়িতে আসতে হয় নি। আমরা যদিও এঁদের চেয়ে সঙ্গতিসম্পন্ন তবু সত্যি বলতে কি, এত আরামে পূর্বে থাকি নি। কিন্তু আমাদের আত্মীয়-স্বজনেরা নিন্দা করতেই লাগল—তারা বললে যথোপযুক্ত বিয়ে হয় নি, ইত্যাদি ইত্যাদি—বিশেষত আমার সমবয়সীরা আমার দুঃখে গলে যেতে লাগল—শেষ পর্যন্ত এই! আমার ভারি রাগ হত। গোপালের সঙ্গে তো আমার জন্মের মতো ঝগড়া হয়ে গেল। এক বান্ধবী মুখ টিপে বললেন,"পতিনিন্দা শুনি সতী হৈল অতি রোষবতী"—আর একজন বললেন, "তোর যখন পছন্দ হয়েছে আমাদের আর বলার কি আছে, তবে বলিহারি যাই তোর পছন্দে—"।

আমি যখন ওদের সঙ্গে তর্ক করতাম সেটা লোক দেখাবার জন্য নয় বা মান বাঁচানর জন্যও নয়, এবাড়ির পুরুষদের দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তারা কর্তৃত্ব করে না, সমস্ত মেয়েদের উপর ছেড়ে দিয়েছে—এ বাড়ির মেয়েরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। অন্য বাড়িতে যেমন দেখি বাড়ির কর্তার জন্য ভালো জিনিসটা তোলা রইল এখানে তা হতেই পারবে না—কর্তারা হুলস্থূল বাঁধিয়ে দেবেন। স্ত্রী রাঁধতে বসলে কর্তা হয়তো পাখা নিয়ে তাকে বাতাস করতে গেলেন! সত্যি বলতে কি এক বাড়িতে এতগুলি কর্তব্যপরায়ণ, উদার ও সৎ লোক আমি পূর্বে দেখি নি।

আমি আমার সংসারযাত্রার পূর্ণ চিত্র এখানে আঁকতে বসি নি। এটা আমার জীবনী নয়—এটা আমার জীবনের একটা অংশ মাত্র, সেখানে নায়ক মির্চা কিন্তু এই গল্পটা সম্পূর্ণ করতে গেলেও আমার স্বামীর কথা কিছুটা বলতে হবে, কারণ তাঁকে বাদ দিয়ে তো আমি নয়। আমরা আটত্রিশ বছর ধরে একসঙ্গে যে সংসার রচনা করেছি তাতে কোনো খুঁত ছিল না, বলতে গেলে কখনো আমাদের বিরোধ হয় নি। আমরা প্রত্যেকটি ফার্নিচার তৈরী থেকে সন্তানপালন একসঙ্গে একমত হয়ে করেছি এবং এসব কাজ মোটামুটি সুসম্পন্ন হয়েছে। আমাদের সন্তানেরা বিরাট প্রতিভাধর না হলেও মানুষ হিসাবে তারা শ্রেষ্ঠ মানুষের শ্রেণীতে যেতে পেরেছে। যে শূন্যতা নিয়ে আমি জীবন শুরু করেছিলাম আমার সংসারের মধ্যে তা ফাঁকির বাঁশি বাজায় নি। বিবাহের পূর্বে আমার প্রধান আকাঙ্ক্ষা যা ছিল, স্বাধীনতা, তাও আমি পূর্ণমাত্রায় পেয়েছি। আমার ঘরে পা দিয়েই আমি বুঝতে পেরেছি, আমার শৃঙ্খল খুলে গ্েেছে, আমি যা উচিত মনে করব তা করতে পারব। স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়, আমার অফুরন্ত স্বাধীনতা আমি এমন কোনো কাজে লাগাই নি যা আমার যোগ্য নয়।

বিয়ের অল্প কিছুদিন পরে আমার মনে হল মির্চার ব্যাপারটা আমার স্বামীকে বলা প্রয়োজন—আমি একদিন শুরু করলাম—"আমাদের বাড়িতে একজন বিদেশী ছাত্র ছিল, সে আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, বাবা দিলেন না, তখন সে হিমালয়ে চলে গেল!" একটি বাক্যে আমি সংক্ষেপে কাহিনীটা শুরু করলাম। আমার স্বামী বললেন, "ও তাই নাকি?"

ব্যস্ ফুরিয়ে গেল। ওঁর কোনো কৌতূহল নেই। কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো, কোনো দায়ে পড়ে দু-চারটে বেশি কথা বলতে হলে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে। খুব সংক্ষেপে একটা হাসির কথা বলে উনি বাক্যালাপ চুকিয়ে ফেলতে পারলে বাঁচেন। হিমালয়ে চলে গেল তো গেল, আমার কথাটি ফুরলো নটেগাছটি মুড়লো। তারপর আর কি? কাজেই সেদিন আর আমার কিছু বলা হল না। বেশ কিছুদিন পরে আমি আবার একদিন মনস্থির করে তোড়জোড় করে

শুরু করলাম—আজ বলতেই হবে। না বলাটা খুব অন্যায় হচ্ছে, "আচ্ছা বাসরঘরে যখন আমি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম তোমার কি মনে হয়েছিল?" নীরবতা, নিশ্ছিদ্র নীরবতা।

"বল না—বলতেই হবে তোমার খারাপ লেগেছিল কি না।" নীরবতা দুর্ভেদ্য। আমিও স্থিরসংকল্প আজকে বলবই "কিছু নিশ্চয় মনে হয়েছিল, আমার ভাবভঙ্গী তো ঠিক সহজ ছিল না,"...বহু প্রশ্নের পর উত্তর এই, "তা সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন লোকের সঙ্গে হঠাৎ রাত্রে একঘরে থাকতে অসুবিধা তো লাগতেই পারে। খারাপও লাগতে পারে।"

"তোমার অসুবিধা বা খারাপ লাগে নি?"

"একটুও না।"

"ভালো লেগেছিল?"

"খুবই। অবাক হয়ে গিয়েছিলাম তোমাকে দেখে।"

"তবে আমারই বা খারাপ লাগছে কেন তো তোমার মনে হয় নি?"

এই প্রকারে অশেষ প্রশ্নবাণে নির্যাতিত হবার পর বললেন—"আমার বন্ধু ভূপেশের কথা মনে হয়েছিল, তার মতো হল না তো!"

গল্পটা এই—ভূপেশের বিয়ে হল যেমন কথা-বার্তা হয়ে বিয়ে হয়ে থাকে, ভূপেশও মেয়েটিকে আগে দেখে নি। বাসরঘরে মেয়েটি ভূপেশকে বললে, "দেখুন, আমি আপনার স্ত্রী নই, হতে পারি না, আমি একজনকে পতিত্বে বরণ করেছি, সেও আমাকে ভালোবাসে কিন্তু আমার বাবা কিছুতেই রাজি হলেন না। তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছেন। এখন আমি কি করি? আপনারও আমাকে বিয়ে করা উচিত নয়।"

ভূপেশ স্তম্ভিত। মেয়েটির কথা ঠিকই, যুক্তিযুক্ত। ভূপেশ সেই ছেলেটির নাম ঠিকানা নিল, তারপর বরবেশী ভূপেশ বাসরঘর থেকে, বিবাহ বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেই পলাতক প্রেমিকের সন্ধানে রাত্রির অন্ধকারে যাত্রা করল। ওদের তখনও কুশণ্ডিকা হয় নি—শুধু সম্প্রদান হয়েছে অর্থাৎ বিবাহের আসল অংশ হয়

নি। ঐ কন্যা ভূপেশের ধর্মপত্নী নয়, ওরা একসঙ্গে ধর্মানুষ্ঠান করে নি, সপ্তপদী করে নি, শুধু কন্যার পিতা অন্যান্য তৈজসপত্রের সঙ্গে সালঙ্কারা কন্যাটিকে ভূপেশকে সম্প্রদান করেছেন—তুভ্যম্‌অহং সম্প্রদদে—সম্পত্তি হাত বদল হয়েছে মাত্র! এই কন্যা এখন ভূপেশের সম্পত্তি। ঠিকানা নিয়ে ভূপেশ সেই ভদ্রলোকের বাড়িতে উপস্থিত, "বেশ মানুষ তো আপনি, পড়ে পড়ে শোক করছেন, আপনার কর্তব্য কিছু নেই?"

ছেলেটিকে নিয়ে ভূপেশ বিবাহ বাড়িতে ফিরে এল। সে কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে। মেয়ের বাপকে ঘুম ভাঙিয়ে বললে, "আপনি গর্হিত অন্যায় কাজ করেছেন। যাহোক আপনি তো আপনার কন্যাকে আমার হাতে সম্প্রদান করে দিয়েছেন, তার উপর আপনার আর কোনো অধিকার নেই...এখন আমি তাকে তার মনোনীত পাত্রের হাতে সম্প্রদান করে দিচ্ছি। ওদের বিবাহ হবে, আপনার বাধা দেবার কোনো অধিকার নেই।"

"তারপর?"

"তারপর ওদের বিয়ে হয়ে গেল।"

আমি মনে মনে ভাবছি, বাপ্‌ রে, এই মেয়ের মনে জোর আছে। "তারও পর আছে নাকি?"

"আছে। সেই ছেলেটি সেই রাত্রেই ঐ মেয়েটিকে ভালোবেসে ফেলেছিল, সে যেন কেমন হয়ে গেল—উদ্‌ভ্রান্ত—মাঝে মাঝে ওদের বাড়ি যেত।" তারপর একদিন সে মরে গেল। তার ঘরে স্টোভে আগুন জ্বলছিল, খাট থেকে গড়িয়ে পড়ে আগুন লেগে গেল। পুড়ে মরল বেচারা। কেউ কেউ বলে আত্মহত্যা করেছিল। "নিশ্চয়ই আত্মহত্যা।"

কী ভীষণ ব্যাপার, বঞ্চিত প্রেমের এই পরিণামে সৌন্দর্য তো নেই... সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্‌—শিবও নেই সুন্দরও নেই—সৌন্দর্য ছাড়া সত্যের রূপ ভয়ঙ্কর—প্রেমের মধ্যে যদি সৌন্দর্য ফুরিয়ে যায় তাহলে রইল কি? আমি মানসচক্ষে একটা

দগ্ধ লোককে দেখতে পেলাম—তার গায়ের মাংস দগদগে, তার চুল পুড়ে গেছে, তার মুখ ঝলসে গেছে—সে গোঙাচ্ছে! কী ভয়ানক! আমাকে ভালোবেসে যদি কারু এই পরিণাম হয় তাহলে আমিও বাঁচতে পারব না। আমার ভয় করতে লাগল, এঁর বন্ধু যদি এই রকম তবে ইনিও এই। আর কোনো কথা বলে কাজ নেই, ওঁর মনে এতটুকু দুঃখ দিতে পারব না। মির্চা যদি এই মুহূর্তে এসে বলে 'চল' আমি কি যেতে পারি? কখনো না, আর হয় না। এই ভদ্র মানুষের মনে কষ্ট দিয়ে কোনো স্বর্গ থেকে আমি সুখ পেড়ে আনতে পারব না। আমার এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে, আমি জানি সুখ বাহিরের কোনো অবস্থায় বা বস্তুতে নেই—অন্তরে তার আয়োজন সুসম্পূর্ণ থাকলে তবেই বাহিরের স্পর্শে তা, উচ্ছ্বসিত হতে পারে- । বিবেকের দহনে অন্তর যদি ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে, নিন্দায় কুবাক্যে ইতর জনের রসনায় যদি তা লেহ্যমান হয় তাহলে মির্চাকে জড়িয়ে ধরলেই কি আমি সুখ পাব? শরীর সুখ দিতে পারে না, সুখ দেয় মন, আমার মন অন্যকে দুঃখ দিয়ে সুখী হতে পারবে না, এটুকু আমি জানি।

অন্যকে দুঃখ দিয়ে সুখী হওয়া যায় না, অন্যকে বঞ্চিত করে সুখী হওয়া যায় না—এগুলো সোজা কথা, বার বার শুনেছি। আমি তো আবিষ্কার করি নি, সবাই জানে। জানে কি? তাহলে রমা এই মুহূর্তে আমার মাকে কেন তুষানলে দগ্ধ করছে। যাক, যার যা ইচ্ছে করুক। আমি এই নির্বিরোধী ভালোমানুষকে কখনো দুঃখ দেব না। এটা কি শুধু কর্‌তব্য? কখনই নয়, আমি তো এঁকে ভালোবাসছি, খুবই ভালোবাসছি। সেদিন সেটা বুঝতে পারলাম যেদিন রাত আটটা নাগাদ বেহারা বলল, "সাহেব যেখানে গেছেন সেখান থেকে আসতে পথ হারিয়ে ফেলতেও পারেন। সাহেব যদি ঘোড়ায় যেতেন পথ হারাতেন না, ঘোড়া ঠিক বাড়ি এনে হাজির করত। কিন্তু..." অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে—নিশ্ছিদ্র অন্ধকার রাত্রি, কোনোখানে জনমানবের চিহ্ন নেই—ওরা বলাবলি করছিল ঐ রাস্তায় ভাল্লুক বেরোয়। আমি এত অস্থির হয়ে পড়েছিলাম যে ওরা যদি না যেত

আমি নিজেই ম্যাকিণ্টস চাপিয়ে, গামবুট পরে লণ্ঠন নিয়ে বেরুতাম– তা বাঘই থাক আর ভাল্লুকই থাক, এটা কি ভালোবাসা নয়? তবে, তবে আবার কি? কিছু তবে আছে নাকি? আছে আছে আছে–এই সাজানো সংসারের মধ্যে বসে আমার স্বামীর সস্নেহ ভালোবাসার আশ্রয়ে থেকেও আমার মন কেন এত শূন্যতায় ভরে থাকে কে বলবে? 'শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ–পথে পথে...।'

আমাদের বিবাহিত জীবন মসৃণ পথে চলেছে, আত্মীয়স্বজন যাই বলুক, বন্ধুবান্ধবরা যা-ই ইঙ্গিত করুক, আমরা বেশ আছি। আমার স্বামীর সঙ্গে সবচেয়ে যে বিষয়ে আমার সঙ্গে মিলেছে তা হচ্ছে তারও কোনো সংস্কার নেই। তিনি কোনো আচারে বদ্ধ নন, তিনিও জাতিভেদ মানেন না, সামাজিক ব্যবস্থাগুলি যুক্তি দিয়ে বোঝেন। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যেদিন শুনলাম যে তিনি প্রথম যে দিন মাংস খেলেন সেটা ছিল গোমাংস। আমিও চমকে উঠেছি। ইনি মাংস খেতেন না, প্রথম যে দিন পাহাড়ে এসে পৌঁছেছেন এক সাহেবের বাড়ি সেদিন খাবার ব্যবস্থা হয়েছে, তার মেম আবার দারুণ কৃপণ। অতিথি নিমন্ত্রণ করে একখানাই মাছভাজা রেখে বলে, একখানা মাছ খেতেই হবে। সেদিন সে মাছভাজা রাখে নি রেখেছিল বীফস্টেক।

"তুমি খেলে কেন?"

"আর তো কিছু ছিল না, ওরা অপ্রস্তুত হবে, মাংস যদি খেতেই হয় তো ছাগলই বা কি গরুই বা কি, বরং গরুই ভালো, একটা প্রাণী হত্যা করে অনেকটা মাংস পাওয়া যায়, হাতি আরো ভালো।"

অকাট্য যুক্তি। সেযুগে মধ্যবিত্ত ঘরের হিন্দু সন্তানের পক্ষে এটা কঠিন কাজ। কিন্তু এটা কোনো কঠিন কাজ করার মত করে করা নয়–উনি কোনো বিপ্লবী নন, আমি যে রকম জাতিভেদ ভাঙবার জন্য উদ্যত সে রকমও নয়–খুব সহজ স্বাভাবিকভাবে সত্যকে পাওয়া। পরে যখন রবীন্দ্রনাথ এঁকে ভালোমতো

চিনলেন তখন বলেছিলেন, "গল্পস্বল্পের ভালোমানুষ কবিতাটিতে এঁরই পরিচয় রেখে দিয়েছি—"

মনিরাম সত্যই স্যায়না
হিরের ধাক্কা সে নেয় না।
বেশি করে আপনারে দেখাতে
চায় যেন কোনোমতে ঠেকাতে-
যোগ্যতা থাকে যদি থাক না
ঢাকে তার চাপা দিয়ে ঢাকনা
আপনারে ঠেলে রেখে কোণেতে
তবে সে আরাম পায় মনেতে।
যেথা তারে নিতে চায় আগিয়ে
দূরে থাকে সে সভায় না গিয়ে
বলে না সে আরো দে বা খুবই দে,
ঠেলা নাহি মারে পেলে সুবিধে।
যদি দেখে টানাটানি খাবারে
বলে কি যে পেট ভার বাবারে।
ব্যঞ্জনে নুন নেই খাবে তা
মুখ দেখে বোঝা নাহি যাবে তা।
যদি শোনে যা তা বলে লোকেরা
বলে, আহা ওরা ছেলে ছোকরা।
পাঁচু বই নিয়ে গেল না বলে
বলে খোঁটা দিও নাকো তা বলে।
বন্ধু ঠকায় যদি সইবে
বলে হিসাবের ভুল দৈবে

ধার নিয়ে যার কোনো সাড়া নেই—
বলে তারে বিশেষ তো তাড়া নেই—
যত কেন যায় তারে ঘা মারি
বলে দোষ ছিল বুঝি আমারই!

এই কবিতার তত্ত্ববাণী গীতারই কথা—দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগত স্পৃহঃ —সুখেদুঃখে অবিচলিত অনাসক্ত এবং নিরহঙ্কার এ সবগুলি গুণই আমার স্বামীর পূর্ণমাত্রায় আছে—এগুলো তাঁকে সাধনা করে উপার্জন করতে হয় নি। এ তাঁর স্বাভাবিক বিধিদত্ত গুণ। আমি তো উপার্জন করতে চেষ্টা করি, কিছুই পারি না। আমি উদ্বিগ্ন অসহিষ্ণু ও নানাবিধ দোষের আকর— জল যেমন মাছের আকর আমিও তেমনি দোষের আকর, আমার মধ্যে দোষগুলো কিলবিল করছে। সম্ভবত সেই জন্যই প্রায় সর্বদাই আমার মনের মধ্যে হু হু করে— এই যেমন একদিন সন্ধ্যেবেলা আমি বসে বসে ভাবছিলাম অর্থাৎ গুনছিলাম আমি সারা দিনে ক'টা কথা বলেছি— গুনে দেখলাম সাত-আটটার বেশি হবে না—সেগুলো এই রকম— আজ আধঘণ্টা দেরী কেন? বিকালে কি টেনিস আছে? পরশু কি অসবোর্নরা খেতে আসবে? সামশের বেয়ারা কি একা পারবে? আর কি কথা হবে? আমরা যে দুই জগতের মানুষ—উনি যা পড়েছেন আমি তা পড়ি নি—তা নাই বা হল—আমি না হয় কেমিস্ট্রিই পড়তুম—যদি উনি পড়াতেন, আমার তাতে আপত্তি নেই—যে কোনো জ্ঞানের বিষয় থেকে আমি আনন্দ পেতে পারি কিন্তু উনি তা পারবেন না। অত কথা বলা ওঁর কর্ম নয়। আর আমি যা পড়েছি তা উনি পড়েন নি, পাঠ্যপুস্তক ছাড়া কোনো ভাষায় এক লাইন কবিতা উনি পড়েন নি। তা আমি তো ওঁকে শোনাতে পারি? তা কি হয়? কবিতা যে বোঝে না তাকে শোনান যায় না। যদিও আমি শোনালে উনি খুব সহিষ্ণুভাবে শুনবেন; কখনই সেই ভদ্রলোকের মতো করবেন না যার কথা আমি আমার এক আত্মীয়ার কাছে শুনেছিলাম। আমার কবিতারসিকা আত্মীয়া নববিবাহের পর স্বামীকে একটি 'মহুয়া'র কবিতা শোনাবেন বলে বেশ গুছিয়ে বসেছেন। স্বামীও

খুব উৎসাহ দেখিয়েছেন, কবিতাটি পড়তে শুরু করবার আগে তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন—'একটু দেখি', বইটা হাতে নিয়ে একটু দেখে ফেরৎ দিলেন। মেয়েটি অবাক হয়ে গেছে—"কি `দেখলে ?"

"দেখলুম কবিতাটি কত বড়।" আমার স্বামী এরকম কখনো করবেন না। আমি যদি টালি এডিশনের সমগ্র রচনাবলী তাঁকে শোনাই তিনি পরম ধৈর্যে শুনে যাবেন, বলবেন, "খুবই তো ভালো।"

এক একদিন—তা নয়, প্রায় প্রত্যেকদিনই নির্জনতা আমাকে চেপে ধরে। দুপুরবেলা আমি ঘুমোই না, পড়ব কি? এ তল্লাটে বই নেই। যে ক'খানা বই আছে বহুবার করে পড়া হয়ে গেছে। বই এত কিনবই বা কি করে? কেই বা বই পাঠাচ্ছে আমায়? তবু যখনই কলকাতায় যাই কিছু বই সংগ্রহ করে আনি। আমার স্বামী যে কথা বলতে একেবারেই ভালোবাসেন না তবুও তাঁরও এই নির্জনতা কষ্টকর বোধ হয়। একবার আমায় লিখেছিলেন, "দিন পনের আয়নায় ছাড়া আর কোন শিক্ষিত মানুষ দেখি নি।"

সন্ধ্যেবেলাটা যেন আরো নির্জন। বারান্দায় আমি আর আমার স্বামী বসে থাকি—আমি দু'চারটে কথা বলবার চেষ্টা করি। কিন্তু কোন্ ভাষায় কথা বলব ? আমাদের ভাষাই যে পৃথক। তাই একটু পরেই দু'জনেই চুপ। এই মানবহীন দেশে শব্দগুলি যেন নির্জনতাকে আরো বাড়িয়ে তোলে – অন্ধকার বন থেকে একটা 'রাত-কো-চরা' ডেকে ওঠে, একটা বাদুড় ঝুপ করে পড়ে যায়। ঝিঝি পোকা ডাকতে থাকে অবিশ্রান্ত ঝি ঝি ঝি—পাশের ঝরনাটাও তো থামে না, ঝর ঝর ঝর ঝর চলেইছে চলেইছে—এ শব্দগুলো মানুষের সঙ্গী নয়—এরা কেবল বলতে থাকে, তুমি একলা, তুমি একলা—আমি বুঝতে পারি, প্রত্যেকদিন বুঝতে পারি আমার জগৎটা হারিয়ে গেল। আমার লিখতেও আর ভালো লাগে না—কি লিখব? লেখা আমার এই জনহীন জগতে দিকভ্রান্ত হয়েছে। অনেকে মনে করে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বোধ হয় লেখকের প্রেরণা জোগায়—ফুলের বাগানে বসে কবিতা লিখলে কবিতার গুণ বেড়ে ওঠে। যে জন্য শুনি শান্তিনিকেতনে আজকাল গাইডরা দেখায়, "ঐ গাছের নীচে বসে কবি 'রক্তকরবী' লিখেছিলেন, ঐ কুঞ্জের পাশে বসে 'মহুয়া' ইত্যাদি....... মূঢ়তার যেন শেষ নেই। শান্তিনিকেতনের এই নির্জন প্রান্তরে বিশ্বের লোককে ডাক দিয়ে আনলেন কবি লেখারই প্রয়োজনে।

মানুষের সঙ্গে সংস্পর্শে সুখদুঃখের ঘাতপ্রতিঘাতে ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে নিত্য মথিত হওয়াই লেখকের প্রেরণার উৎস। নিস্তরঙ্গ শান্ত অবস্থা, জনবিরল অরণ্য সাধুসন্ন্যাসীদের দরকার থাকতে পারে, আমার নয়। এই প্রকৃতি আমায় জীবন দিচ্ছে না বরং হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষের মানুষকে দরকার। অন্তত আমার দরকার। মির্চার বদলে একটা পুষ্পিত তরু হলে কি ভালো হত? হাঃ হাঃ হাঃ একটা কথা মনে পড়ে গেল—"প্রথম কাকে ভালোবেসেছিলে, বল বল"—"একটা গাছকে গো একটা গাছকে"—এখন থাক গাছে ঝুলে !

আমার বাইশ বছর অরণ্যবাসের তিনটি বছর স্মরণীয়—ঐ তিন বছরই আমরা বেঁচেছিলাম। বাকি দিনগুলি খালি পুনরাবৃত্তি। যখন আমার জীবনের সেই সুন্দরতম পর্ব শুরু হতে চলেছে যতদূর মনে পড়ে সেই সময়ে অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে অল্পদিনের জন্য কলকাতায় এসেছি। বাবা আমাকে বললেন, "ইউক্লিড তোমাকে একটা বই উৎসর্গ করেছে, উৎসর্গপত্রে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে।" কথাটা শোনবার জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না—হৃৎপিণ্ড লাফাতে লাগল, বাধাই মানে না— আমি প্রস্তরীভূত দাঁড়িয়েই রইলাম, কিছু বললাম না। কয়েক মিনিট পর তিনি আবার বললেন, "পর্নগ্রাফি লেখার জন্য তার জেল হয়েছে।" পর্নগ্রাফি কথাটার অর্থ আমি জানতাম না। বাবাকে জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা ছিল না। যা লিখলে জেল হয় তা নিশ্চয় কোনো সৎসাহিত্য নয়। আমি কোনো উত্তর না দিয়ে প্রশ্নও না করে চলে গেলাম। ডিক্‌শনারিতে ঐ শব্দটা দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। একি বিশ্রী ব্যাপার! আমাকে যে বইটা উৎসর্গ করেছে সেটাই ওরকম না তো! আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না আমাকে বই উৎসর্গ করবারই বা দরকার কি, ক্ষমা চাওয়ারই বা প্রয়োজন কি! বইটা সম্বন্ধে আমার কোনো কৌতূহল হল না। শুধু ঘৃণায় আমার মন সঙ্কুচিত হয়ে গেল, অপবিত্র বোধ হতে লাগল এবং এই রকম একজন লোকের সঙ্গে আমার এক দিন ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল এবং এর জন্য আমি এত আগ্রহী ছিলাম ভাবতেই আমি শিউরে উঠলাম। আমার এতই খারাপ লেগেছিল যে আমি ঐ বইটার কথা ভুলে গেলাম, অর্থাৎ মনেই আনতে চাইলাম না, তারপর থেকে প্রায় পনের বছর ওর নামটাও আমার মনে পড়ে নি। ঘৃণার একটা প্রকাণ্ড পাথর দিয়ে স্মৃতির সেই আলোকিত গুহাটার মুখ আমি নিশ্ছিদ্র বন্ধ করে দিলাম...'করে দিলাম' বলা ভুল হবে—এটা হয়ে গেল।

দিনগুলি গড়িয়ে চলে সকাল থেকে সন্ধ্যা একই নিয়মে—এক এক দিন ভাবি হঠাৎ যেভাবে আমার বিয়ে হল এটা উভয়ের প্রতিই অন্যায় করা হয়েছে। এ কথা যখন আমার মনে হয়, তখন আমি লজ্জা পাই—প্রশ্ন করি এটা আমার

স্বামীর সম্বন্ধে বিরুদ্ধভাব নয় তো? কিন্তু তা নয়, ওঁর মহত্ব সত্ত্বেও এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আমরা সম্পূর্ণ দুই জাতের মানুষ। এই জাতিভেদটা আমার স্বামীকে কোনো পীড়া দেয় কিনা আমি জানি না, কারণ ওঁর তো কোনো ভাবেরই অভিব্যক্তি নেই, তা যদি থাকত তবে জাতিভেদের প্রশ্নই উঠত না। উনি আমাকে যে কতটা ভালোবাসেন তার পরিচয় আমি পাই, শুধু আমি কেন যে যেখানে আছে সকলেই জানে—আমি যদি পনের দিন কলকাতায় থাকি ওঁর জ্বর হয়ে যায়। আমিও বেশিদিন থাকি না, আমার মন কেমন করে, ওঁর জন্য চিন্তা হয়। 'তবু'—তবু ঐ পাহাড়ের দিনগুলোর শূন্যতা আমায় চেপে ধরে। আমি যে কথা বলতে পারি না। আমার কথা বলার বড় প্রয়োজন। আমি মাঝে ম:াঝে নিজেক প্রশ্ন করি আমি যে জাতিভেদের কথা ভাবছি এর কি অন্য রকম কোনো উপায় ছিল? আমার যদি ফট করে চারদিনের মধ্যে এঁর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে ঐ বাঙালী জাতির উন্নতিপ্রয়াসী ডাক্তারটির সঙ্গে বিয়ে হত, তাহলে কি হত? তার সঙ্গে কি জাত মিলত? সে তো সাংঘাতিক—যে মানুষ চেনে না, মানুষের মুখ দেখে না, মন, দেখে না, খালি শরীরের উচ্চতা দেখে! কাজেই ঠিকমতো জোড় কখনই মেলে না। তা নিয়ে আক্ষেপ করে কোন লাভ নেই। 'তবু'। 'তবু' আমাকে ছাড়তে চায় না! যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে কি তুমি পাও নি, স্বামীর ভালোবাসা, শ্বশুরবাড়িতে সম্মান, স্বাধীনতা? কোনটা পাওনি? আমায় মানতে হবে যে অভিযোগ করবার মত কিছু নেই। যদি আমি বলি, আর কিছুই নয়, গত মাসের প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের যে কবিতাটা বের হয়েছে সেটা এক মাসের মধ্যে কারুর সঙ্গে পড়তে বা আলোচনা করতে পারলাম না, তাহলে কি কেউ আমার জন্য শোক করতে বসবে? তা কি হয়? হ:াসবে লোকে কিন্তু অনেক লোকেরই যা প্রয়োজন নেই আমার তা আছে। কোনো কোনো মানুষ আছে যাদের অঞ্জলি পূর্ণ হয় না কোনো পার্থিব বস্তুতে। যাদের আকাঙ্ক্ষা ফুরাতে চায় না। যারা এই জগতে কোনো সূক্ষ্ম অনির্দিষ্ট জিনিস খুঁজে বেড়াচ্ছে যার কোনো বাস্তব মূল্য নেই।

আমাদের মনটাকে এমন করে তৈরী করল কে? কোনো কোনো লোকের যে অনেকের সঙ্গে জাতিভেদ হয়ে গেল এর জন্য দায়ী কে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আবার কে? আমরা যারা তাঁর গানের ভিতর দিয়ে জগৎটাকে দেখছি আর যারা তা দেখে নি এদের জগৎ পৃথক হয়ে গেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই দুই জগতের চলার ছন্দ মেলে না।

আমি যদিও পাহাড়ে বাস করছি আমার জীবনের স্রোত পাহাড়ী নদীর মতো বেগবতী নয়—উপলে লেগে তা উচ্ছ্বিত হচ্ছে না, তা একেবারে নিস্তরঙ্গ পুকুরের জল হয়ে যাচ্ছে। বর্হিজগতের সঙ্গে যোগ নেই, সংসারের তরীটা ভাসিয়ে দিয়ে বসে আছি—একলা, ঘোর একলা। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তিনি যে কথা দিয়েছিলেন আসবেন—সে কথা রাখবেন তো?

সংসারটাকে আমি খুব ভালোবেসেছি। আমি ঘরবাড়ি সাজাতে ভালোবাসি—আমার মায়ের বাড়ির এলোমেলো কখনো ঠিক করে উঠতে পারতাম না—এই নিয়ে অষ্টপ্রহর খিটিমিটি লেগে থাকত—কেউ পর্দায় হাত মুছে ফেলল, দেওয়ালে আঁক কেটে বসল—কাগজ ছড়িয়ে ফেলল উপর থেকে উঠোনে। সোফার কাপড় পরিষ্কার করেছি, বাবার কোনো টুলো পণ্ডিত ভক্ত এসে তার উপর উবু হয়ে বসে পায়ের দাগ লাগিয়ে গেল, আবার কালই হয়ত ইয়োরোপের কোনো নামী ব্যক্তি আসবেন। এই নিয়ে আমি খেটে খেটে হয়রান হতাম। এখানে আমি অবাধ সুযোগ পাচ্ছি। আমার বাড়ি ঝকঝকে একটা গয়নার মতো। কাঠের মেঝে সপ্তাহে একদিন ঘষে ঘষে সুগন্ধি মোম দিয়ে পালিশ করা হয়। এত পালিশ হয় যে মেঝেতে মুখ দেখা যায়। কাঁচের জানালার কাঁচ মেথিলেটেড স্পিরিট দিয়ে চকচকে করে মোছা হয়। ফুলদানী ও কিউরিও তো বটেই, দরজার কব্জা ও হাতল ব্রাসো দিয়ে ঝকঝকে করা হয়। মাসে একবার বারান্দায় ফুলের টবগুলো রং করি। আমার রান্নাঘরে বাসনগুলো সোজা করে রাখা, কলঙ্কশূন্য। সবগুলি

আলমারীর ভিতরে প্রত্যেকটি তাকে জিনিস স্বস্থানে থাকে। আমার কুড়ি বিঘা বাগানের গাছপালা ছিমছাম যত্নে ছাঁটা। খাবার টেবিলে কাঁটাচামচ ঝকঝক করে, ন্যাপকিন একেক দিন এক এক রকম করে ভাঁজ করা থাকে—মাখনদানিতে মাখনের ফুল কাটা। দুপুরে আমরা পাথরের থালায় খাই, রাত্রে ডিনারসেট ব্যবহার হয়।

ভোরবেলা বেয়ারা এসে দরজায় টোকা দেয়—তার মাথায় পাগড়ি বাঁধা, পরনে চাপকান সাদা ধপ্‌ধপ্ করছে, ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এসেছে—বেড়টি। কফি পারকুলেটারে সকাল বেলাতেই কফি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার সুগন্ধ সারা বাড়িতে ছড়িয়ে আছে—মালি ফুলের স্তূপ নিয়ে এসেছে, কোনোদিন বা আমিই মালির সঙ্গে কাঁচি নিয়ে বেরিয়েছি, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ও ফুল কাটছে। জাপানী ফুল সাজান আজকাল খুব দেখছি। আমার তত ভাল লাগে না, ওটা কৃত্রিম একটা খেলনার মতো। আর বাঙালীরা তো ফুল সাজাতে জানেই না। বৌবাজারে যে তোড়াগুলো বিক্রি হয় তা দেখেলই বোঝা যায়। দেবদারুপাতা দিয়ে আষ্ঠেপৃষ্ঠে চেপে ধরে তার দিয়ে বাঁধা। ফুলের প্রাণ কতক্ষণ এ অত্যাচারে বাঁচে? তা না হলে একটা টিকটিকে ফুলদানিতে দুটো চারটে করে গুঁজে দেওয়া। আমি এখানে ইংরেজ এক মহিলার ফুল সাজান দেখে চমৎকৃত। ঘরের কোণে একটা ফুলসুদ্ধ ডালই বসিয়ে দেওয়া হয়েছে—। 'ফুল রাখবার পাত্রগুলোও এমন হওয়া চাই যাতে ফুল পাতা ছড়িয়ে পড়ে। আমি দেখে দেখে শিখি, যা দেখেছি ঠাকুরবাড়িতে। ঠাকুরবাড়ির আসবাবেই দেখেছি স্বদেশী নক্‌শা। এখানে নানারঙের কাঠ পাওয়া যায়, আমরা তাই দিয়ে নানা স্বদেশী নক্‌শার আসবাব বানাই, আমাদের পর্দা ও কুশন কিছুই বিলাতী ছিটের নয়—উড়িষ্যার গ্রাম থেকে উড়িয়া পুরোহিতেরা যে ধুতি পরে তার আঁচলটাই পুরো থান বুনিয়েছি। এ সময়ে দেশী নক্‌শার কোনো জিনিসই বাজারে সুলভ ছিল না। নানা প্রদেশের গ্রামের লোকদের কাছে লোকশিল্পের নমুনা পাওয়া যেত। তাঁতিকে যখন বললাম, এই আঁচলটাই দুটো থান বুনে দাও—তার চক্ষুস্থির। কিছুতে রাজি নয়।

"তোমার ক্ষতি কি হবে? টাকা তো পাবে?"

"এ রকম তো কখনো করি নি মা।" এ দেশের মানুষের বিপদ ঐ, যা কখনো করে নি তা করবে না—তা সে তাঁতিই হোক কি পণ্ডিতই হোক। ছোট ছোট অচলায়তন বসে আছে পদে পদে মন জুড়ে।

আমাদের বাড়িতে আমাদের ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে, লোকে বুঝতে পারে এটা আমাদেরই বাড়ি। কাজ শিখছি ইংরেজ মহিলাদের কাছেও—'দের' নয়, এখানে চার ঘর ইংরেজ আছেন তাঁদের মধ্যে একজন মহিলাই ঠিকমতো সংসার করেন। অন্যেরা? তাঁদের কথা আর বলে কাজ নেই। টেনিস খেলা, ব্রীজ, মদ্যপান ও বলনৃত্য, মাঝে মাঝে ফ্লার্টেশন—এছাড়া অন্য কিছু তারা জানে না। পুরুষগুলো মূর্খ এবং বেহেড মাতাল। ওদের ভিতরেও হয়ত লুকিয়ে কোথাও মনুষ্যত্ব থাকতে পারে কিন্তু সে দেখবার আমার চোখ নেই, মন নেই। মন বেশি সূক্ষ্ম হয়ে গেছে—এদের সংস্পর্শে সংকুচিত হয়ে যায়। আমি জানি এটা একটা ত্রুটি।

এই ত্রুটিটি অবশ্য ওদের চোখে পড়ে অন্যভাবে—ওরা ইংরেজ, আমরা তুচ্ছ নেটিভ, ওরা যে দয়া করে আমাদের সঙ্গে মিশতে চায়, আমাদের বলড্যান্স করতে ডাকে, আমাদের বাড়িতে আসে তাতেই তো কৃতার্থ হওয়া উচিত—তা নয় সব কিছুতে আপত্তি! তাস খেললে কি চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে? তাস খেললে চরিত্র নষ্ট হয় না ঠিকই কিন্তু সময় নষ্ট হয়। একে তো মনের মত কাউকে পাই না, কারু সঙ্গে চিন্তার আদানপ্রদান হয় না। মনের যে-স্তরে আমার সঙ্গী দরকার সেখানটা দিগন্তহীন সাহারা হয়ে আছে, তার উপর যদি এদের সঙ্গে বেশি মিশি তাহলে আমার ব্যক্তিত্ব বদলে যাবে—সেই অল্পবয়সেই আমার একথা মনে হত। কারণ ওদের প্রাণোচ্ছ্বলতা দেখলে লোভ হয়, একেবারেই যে তা মনকে টানে না তা নয়। কিন্তু এ লোভ সংবরণ করতে হবে। আমি জানি সব দিক থেকে এক অসীম শূন্যতা আমায় ছেয়ে আছে, তাই আমি যদি খুব শক্ত হাতে নিজের হাল ধরে না থাকি আমিও বিভ্রান্ত হতে পারি। আমি জানি আমার

স্বামী এমন মানুষ ওঁর কেউ ক্ষতি করতে পারবে না কিন্তু আমার হতে পারে, আমার মধ্যে নানারকম দুর্বলতা। আমি তাই নিজের মধ্যে পুলিশ বসিয়ে রেখেছি এতটুকু যেন নড়চড় না হয়, সেই রাধার গানটার মতো, 'পাহারা রেখেছে, আমি পাছে পা হারাই বলে পাহারা রেখেছে!'

মদ্যপান নিয়ে একটা বিরোধ ঘনিয়ে উঠেছে—কিন্তু এটাতে হার মানব না–কারণ ঐ যা বললাম, 'সংসর্গজা দোষগুণাঃ ভবন্তি'–এদের সঙ্গে থাকলে মনটাও শেষ পর্যন্ত ঐ পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। আমার জীবনের তার যে সুরে বেঁধেছি তা নেমে যাবে।

আজকাল হয়ত লোকে এটাকে গোঁড়ামী মনে করবে, তখনও করত কিন্তু সত্যি বলতে কি মদ্যপানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আমাদের বেশ শক্তিক্ষয় হতে লাগল– আমি যদি এত জোর না করতাম তাহলে আমার স্বামী হয়ত নিজে না খেলেও ওদের জন্য ব্যবস্থা করতেন–বস্তুত করেও ছিলেন অর্থাৎ দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, আমি তা হতে দিলাম না। একে আমরা বিলিতি জিনিস ছুঁই না। আমার বিয়েতে একটিও বিলিতি' জিনিস কেনা হয় নি, কলম পর্যন্ত গুপ্তর ফাউনণ্টেন পেন–"আর এদের বিলাতি মদ্য খাওয়াতে হবে?"

"ওরা তা না হলে আমাদের কৃপণ ভাববে।"

"কেন, সন্দেশ খাওয়াব?"

"সন্দেশ ওরা সন্ধ্যেবেলা খাবেই না" উনি হাসছেন, "তোমার যা ইচ্ছা কর, এটা তোমার সংসার তোমার দিতে ইচ্ছা দেবে না হয় দেবে না।"

আমার ইচ্ছা এবং মত দৃঢ় কিন্তু সেদিন আমি জানতাম না যে আমি ছোটখাট একটি যুদ্ধে নামলাম কারণ আমি ইংরেজদের বিরূপ করে দিলাম। আমি জানতাম না সময়মতো ওরা এর প্রতিশোধ নেবে। এ যুগে কি অবস্থা জানি না, তখন দেখতাম যারা মদ্যপান করে তারা যারা করে না তাদের উপর খুব রেগে যায়–কারণ তাদের মনে হয় এটা বুঝি তাদের চরিত্রের উপর

কটাক্ষপাত করা! এ মনোভাব অবশ্য অস্বাভাবিক নয়। যে যাই করুক অন্যের সমর্থনের লোভ ছাড়তে পারে না!

আমি বেয়ারাকে বললাম, "সবগুলো বোতল নিয়ে ঝরনার জলে ফেলে দাও —"

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে—ঝরনার জলে উৎক্ষিপ্ত হবে এই ঝকঝকে বোতলের বিলাতি মদ্য! গুর্খাদের স্ত্রীপুরুষের এই বস্তুটির তৃষ্ণা তৃপ্ত করবার সাধ্য কারু নেই। পরের দিন সকালবেলা কুলীকামিনরা ঘাস কাটতে এসে বোতলগুলো পেল—সব ভাঙ্গে নি কিছু কিছু মাটিতে বসে গেছে—তখনকার দিনে গুর্খাদের সততা এতখানি ছিল যে ফেলে দেওয়া জিনিসও কেউ না বলে নেবে না। মাসের পর মাস ঘর খুলে রেখে যাও, ভেজান দরজা ঠেলে ঢুকে কেউ তোমার ঘড়িটা নিয়ে যাবে না। আমার দুঃখ এই যে এই মানুষদের দেখবার চোখ তৈরী হতে আমার দেরি হল। আমার চোখ অন্তর্মুখী ছিল। সেই গানের উল্টোটা 'বাহির পানে চোখ মেলেছি আমার হৃদয় পানে চাই নি আমি চাই নি।' এক্ষেত্রে বাইরেই দ্রষ্টব্য ছিল। বেয়ারা বলল, "ওগুলো তো আপনি ফেলেই দিয়েছেন, ওরা নেবে?" ওরা নিল। তারপর সেই বিশুদ্ধ স্কচ হুইস্কি উদকমিশ্রিত না হয়ে বোতলের পর বোতল উদরে পড়ার ফল যা হল তা বোঝা শক্ত নয়—স্ট্রেচারে করে তাদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হল—এবং আমার কীর্তিও রটে গেল সাহেবকুলে। আজকের দিনে এই মনোভাব দুর্বোধ্য ঠেকবে যখন মদ্যের চেয়ে বহু বেশিগুণে প্রমত্তকারী বস্তুর আমদানী হয়েছে এবং গুণী সমাজে সমাদৃত হয়েছে।

এদের ডিনার পার্টিতে দূর দূর পাহাড় থেকে প্ল্যানটার সাহেবরা আসত—দেখতুম আস্তে আস্তে যত রাত গভীর হচ্ছে গেলাসের পর গেলাস মদ্যপান করে এরা তৃরীয় হয়ে যাচ্ছে—যে গাইতে পারে না সে হঠাৎ হেঁড়ে গলায় গান জুড়ে দিল, কেউ বা ঢুলতে লাগল—কেউ যেখানে কোনো স্ত্রীলোক বসেছে তার ঘাড়ে গিয়ে পড়ল, কেউ বা ফট্ করে আমার পায়ের কাছে বসে কাঁদ কাঁদ গলায় বলল,

“I shall be your dear” —deer শব্দটার উপর pun হচ্ছে কারণ আমি একটা হরিণ পুষেছিলাম। আমি কিছুতেই বুঝতে পারতাম না মানুষ কি করে স্বেচ্ছায় বুদ্ধি হারায়। সুসজ্জিত ঘরে বসে চর্বচোষ্যলেহ্যপেয়ে আকণ্ঠ ভরে বয়স্ক লোকেরা ইচ্ছে করে পাগল হয়ে যাচ্ছে এই দেখে দেখে আমার মনের অবস্থা দুষ্মন্তের রাজপুরীতে সুখী লোকদের দেখে শারদ্বতের মতো হত, ‘স্নাত ব্যক্তির যেমন তৈলাক্তকে, শুচির যেমন অশুচিকে, জাগরিত ব্যক্তির যেমন প্রসুপ্তকে, মুক্ত ব্যক্তির যেমন বদ্ধকে দেখলে’ মনে হয় – তেমনি হয়েছিল শারদ্বতের অবস্থা।

গভীর রাত্রে আমরা স্বামী স্ত্রী নির্জন বনের ভিতর দিয়ে বাড়ি ফিরি। সামনে বেহারা লণ্ঠন ও লাঠি নিয়ে চলেছে। আমাদের পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই— নিঃশব্দ বনস্থলীতে দুধারে পাহাড়ে ধাক্কা লেগে সেই শব্দ মস্ মস্ করে নৈঃশব্দকেই প্রকাশ করছে—উপরে গাছের চন্দ্রাতপের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না গলে গলে পথের উপর আলোছায়ার চিত্রবিচিত্র করেছে। আমি জানি ঠিক কোন মোড়ে কি আছে—কোথায় জোনাকীদের রাজত্ব, কোথায় ফুলের গন্ধ পাব। একটা ফুল আছে ঠিক আতপ চালের গন্ধ। কেউ কেউ বলে কোনো সাপের গায়ে সুগন্ধি আতপের গন্ধ পাওয়া যায়। এখানে এত সাপ যে আমাদের আর সাপের ভয় নেই। ওরা মানুষ 'দেখলে বা শুনলে পালিয়ে যায়। কোবরাও পালিয়ে যায় কিন্তু অজগর পালায় না, পালাবে কি করে তার তো নড়তে চড়তে বছর কেটে যাবে। অবশ্য অজগরের ঘাড়ে না পড়লে কারু ভয় নেই—সে হাত বাড়িয়ে কাউকে ধরবে না। অথচ অজগর দেখেই সে লোকটা মরে গেল—গাছের তলায় কুণ্ডলীকৃত অজগরটা যেই মুখ তুলে চেয়েছে এই লোকটা তার চোখ দেখেই ছুটতে শুরু করেছে, অবশ্য বিপরীত দিকে, নৈলে সম্মোহিত হয়ে ওর আওতায় গিয়েই পড়বার কথা! অজগর হাত বাড়ায় না ঠিকই কিন্তু চোখ বাড়ায়, চোখ দিয়েই টেনে নেয়। লোকটা উপরের দিকে ছুটতে ছুটতে একেবারে

দু মাইল দৌড়ে আমাদের বাড়ির কাছে এসে পড়ে গেল, পড়েই মরে গেল, শুধু ভয়েই মরে গেল। আমরা সচরাচর যে পথে চলাফেরা করি সেখানে ভাল্লুক বেরোয় না, ওদেরও তো প্রাণের ভয় আছে, কিন্তু বনের পথে পায়ে হেঁটে আঠার মাইল দূর থেকে যে লোকেরা শহর থেকে বাজার আনতে যায় তাদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। এক একদিন এক একটা কৌশল করে সবাই বাঁচে—একদিন তো খাবার ভর্তি পিঠের ঝুড়িটাকে ফেলে দিল, ঝুড়িটা ছিটকে পড়ে পাহাড় দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, ভাল্লুক মানুষ ছেড়ে সেই চলমান বস্তুর পিছন পিছন দৌড়াল। রুটিওলা বেঁচে গেল। ওকে আমরা বলি রুটিওলা, কিন্তু শুধু রুটি নয়, যা কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস তা আঠার মাইল দূর থেকে আনে, মাছ, মাংস, ওষুধ, তরকারী কিছু এখানে পাওয়া যায় না। একটি জিনিস ভুলে গেলে তিন দিন অপেক্ষা করতে হবে। চিতা, ভাল্লুক আর অজগরের কাণ্ড মিলে এখানকার ঘটনাগুলো ছোটদের গল্পের বইয়ের গল্পের মতো। আমি যে জীবন থেকে এসেছি তার চেয়ে কতই না অন্য রকম। তবু ধীরে ধীরে আমি এদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছি। আদিম প্রকৃতি, আদিম মানব আমার অন্তরে প্রবেশ করছে ধীরে, খুব ধীরে। কারণ সাহেবরা যে রকম করে আনন্দ করতে পারে আমরা তো তা জানিই না। ওরা ছুটির দিনে পিঠে বন্দুক ঝুলিয়ে হাতে ছিপ নিয়ে, ভারবাহী ভৃত্যকুলের কাঁধে খাদ্য ও মদ্যের বোঝা চাপিয়ে শিকারে চলল—সেখানে মদ্যপান হবে, শিকার হবে এবং ইনি ওর স্ত্রীর সঙ্গে কিংবা কোনো অতিথি বালিকার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করবেন। ওদের কোনো অভাব বোধ নেই—জঙ্গলেও বেশ আছে ওরা। আমরা পড়ুয়া মানুষ আমরা এ সব পারি? আমাদের নিরীহ হরিণ মারা ভালো লাগে না। আহত হরিণের চিৎকার বা করুণ দৃষ্টি আমাদের কাঁদিয়ে ছাড়ে। তবুও ক্রমে ক্রমে ওদের কাছ থেকে আমরা শিখতে লাগলাম। ওদের কাছেও শেখবার আছে। যে অবস্থাতেই পড়ুক ওরা মানিয়ে নিতে পারে। অনেকটা মাড়োয়ারীদের মতো—তারাও বেশ পারে প্রতিকূল অবস্থায় মানিয়ে নিতে। হিমালয়ের গায়ে ছোট ছোট এমন গ্রাম আছে যেখানে

পঁচিশ ত্রিশ মাইল হয় পায় হেঁটে নয় ঘোড়ায় ছাড়া পৌঁছবার পথই নেই– সেখানেও মাড়োয়ারীরা দোকানপত্তর খুলে চাল, ডাল বিক্রী করে- -ওদের জন্যই এখানে আমরা চাল, ডাল, তেল, মশলা পাই ।

মদ্যপান ও হরিণ শিকার এই দুটি জিনিস বাদ দিয়ে আমিও চেষ্টা করলাম অরণ্যজীবনের আনন্দে প্রবেশ করতে। প্রত্যেক ছুটির দিনে আমি যাকে যাকে পারি যোগাড় করে সদলবলে বের হই বনভোজনে। বনের পথ দিয়ে চলে যাই অনেক দূরে, হয় কোনো নির্জনতর ঝরনার ধারে, নয়ত কোনো পার্বত্য নদীর তীরে—এ বনের গাছগুলো একেবারে সোজা সোজা, এরা আলোর প্রত্যাশী, তাই যেন দীর্ঘগ্রীবা উত্তোলন করে পাহাড় পার হয়ে আকাশে মুখ রাখতে চায়। ওই গাছের ছায়াচ্ছন্ন মৃত্তিকা শেওলার ভেজাগন্ধে চারিদিক ভরে রাখে—ঘোড়ার পায়ের নিচে ঘাসফুল আর বন্য ফার্ন দলিত হয়ে যায়, আমি অন্যমনস্ক হয়ে লাগাম ধরে থাকি, বনের মধ্যে চলতে চলতে মন হঠাৎ উদাস হয়ে যায়—সেই গৃহবিবাগী রাজার কথা মনে পড়ে—'একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনং—' কোথায় কাদের সঙ্গে চলেছি আমি। এরা সব ছায়ামূর্তি—এই জীবনটা কি চেয়েছিলাম? হা ঈশ্বর কীটপতঙ্গও সঙ্গী পায়, আমাকে একজন সঙ্গী দ িলে না? অবসাদ কেটে যায় যখন বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে হঠাৎ পার্বত্যনদীকে দেখতে পাই উপলশয়না কলনিনাদিনী জলধারা—স্রোতের মাঝে মাঝে পাথরে আটকে হ্রদ হয়ে থাকে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমরা স্নান করি। 'তিতাপতি' বলে এক রকম সুগন্ধ পাতা আছে—পাথরে থেঁতলে জলে ফেলে দিলে সে জল পান করে মাছগুলো মত্ত হয়ে ওঠে— তখন সেই মাছ ধরা হয়। পাথরের চুলো তৈরী করে কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বেলে মাছ ভাজা হয়। বড় বড় পাথর নদীর মাঝে মাঝেই আছে তার পাশ দিয়ে জল ঘুরে ঘুরে ফেনা তুলে তুলে সাদা হয়ে যায় সেই পাথরের উপর বসে আমার 'সাগরিকা' কবিতাটি পড়তে ইচ্ছে করে —'বসিয়াছিলে উপল উপকূলে'—

"ম্যাকডোনাল্ড, জাভা বলে একটা দ্বীপ আছে জানো?"

"জানি বৈকি, সেখানে চা-এর চাষ হয়

"ওঃ তাই জানো, সেখানে বহু আগে ভারতীয় সভ্যতা গিয়েছিল, গিয়েছিল শ্যামদেশেও তা জানো?"

"Never heard of such a thing"—ইংরেজ আসবার আগে ভারতীয় সভ্যতা বলতে কিছু ছিল কি?"

নাও ঠেলা! এদের সঙ্গে কি কথা বলবে? আমার স্বামী তো সহজে কোনো কথা বলতে চান না, বিতর্কে তো যাবেনই না তবু বাধ্য হয়ে তাঁকেও এক এক দিন দু একটা কথা বলতে হয়।

ম্যাকডোনাল্ড বলে, "তোমরা তো লেখাপড়া শিখেছ, তোমরা তো খুবই বুদ্ধিমান, তবে ক্রিশ্চান হচ্ছ না কেন? তোমরা saved হবে কি করে ?"

উনি বললেন, "আমরা সংখ্যালঘু দলে যেতে চাই না—"

"অর্থাৎ?"

"পৃথিবীর জনসংখ্যা কত জানো?"

"না। কত?"

"দুই হাজার মিলিয়ন—এর মধ্যে ক্রিশ্চান কত বল তো?"

"জানি না। কত?"

"হয়ত ছয় শ' মিলিয়ন হবে। তবেই বল মেজরিটির সঙ্গেই থাকা ভালো নয় কি?"

ক্রমে ক্রমে দু'চার জন করে লোক আসতে শুরু করেছে, আমি আত্মীয়স্বজনকে ক্রমাগত ডাকি—কেউ না কেউ ছুটি হলে আসেন। এ তল্লাটে কেউ এলে আমার অনুরোধে পড়ে আসতেই হয় আমাদের বাড়ি। কাজেও অনেকে আসেন। অতিথিরা আমার বাড়িতে এসে খুশী হয়। যদিও বাজার আসে আঠার মাইল দূর থেকে তবু খাদ্যবস্তুর অভাব রাখি না। সুসজ্জিত বাড়িতে অতিথিদের জন্য সুখাদ্য তৈরী করে আমি তৃপ্তি পাই। তাদের বিছানা চীনাংশুকে ঢাকা, বালিশে ল্যাভেণ্ডার দিই—চেষ্টা করি একবার যারা আমার বাড়িতে থেকে

গেছে তারা যেন কখনো না ভোলে। তারা ঘুম ভেঙে বিছানার পাশে শৌখীন পাত্রে চা পায়—দরজার কাছে পালিশ করা জুতো, স্নানের ঘরে ইস্ত্রি করা কাপড় পায়। প্রথম দু'তিন দিন সবাই খুব খুশি, “কি আনন্দেই আছ তোমরা!” একেবারে ফার্স্টক্লাস হোটেলে! তারপর এক সপ্তাহের মধ্যেই নির্জনতার অবসাদ বুঝতে পারে সবাই—তখনই পালাই পালাই।

একবার স্যার বি. এল. মিত্র এসেছেন কাজেই—আমাকে দেখে প্রৌঢ় ভদ্রলোক একেবারেই অবাক হয়ে গেছেন—”তুমি এখানে থাকো! এ যে দেখি অশোকবনে সীতা!” কিন্তু উপমাটা ঠিক নয়—আমায় কেউ বন্দী করে নি। এখানে কোনো রাবণ নেই।

সংসারের কাজে আমার কর্মশক্তি ফুরাতে চায় না, সাহেবদের কাছে শিখেছি মুরগী পালন—সেই সময়ে বিলাতী মুরগী পালার বিশেষ পদ্ধতি শুরু হয়েছে। শিখেছি মৌমাছি পুষতে। মৌমাছিদের জীবনবৃত্তান্ত পড়ে পড়ে মুখস্থ হয়ে গেল। কত রকম বিচিত্র পতঙ্গ আছে তারা মানুষের কাজে লাগে না, তবে তাদেরও নিজের জীবন মূল্যবান—আশ্চর্য এক একটার রূপ, বিচিত্র তাদের ব্যবহার — পাহাড়ের যেখানটা গভীর জঙ্গল সেখানটা সর্বদা ভিজে স্যাঁতস্যাতে কারণ সেখানে রোদ পড়ে না। সেখানে গাছের ডালে শ্যাওলা হয় যাকে বলে ‘মস’ (moss) —লম্বা লম্বা মস ঝুলতে থাকে ঠিক যেন গাছের শাখা তার এলোচুল ঝুলিয়ে দিয়েছে। এখানে কোনো কোনো গাছ আছে যাতে আলো জ্বলে —‘ফসফরাসেণ্ট’। আমার বাবা আমায় বলেছিলেন খুঁজে দেখতে পুরাণে যাকে দিব্যৌষধি বলা হয় তা আছে কিনা। দীপ্যমান এই দিব্যৌষধি দেখেছি। জোনাকির মতো কোনো কোনো পোকা আছে যার পিঠে ও দুপাশে মিলিয়ে তিরিশটা আলো—দশটা করে প্রত্যেক লাইনে—এক অভাবনীয় জীব। আর প্রজাপতি ? বড় ছোট বিচিত্র রঙে রঙীন—কোনটা বা মথ—রংশূন্য বড় বড় ভয়ঙ্কর চোখ, ধূসর দেহ।

ফুলের বাগানে প্রজাপতিরা ওড়ে, তাদের সঙ্গে ঠিক তাদের মত রঙীন আর একজন উড়ে উড়ে ছুটে চলে তাদের ধরবে বলে, ‘প্রজ্জাতি’ ‘প্রজ্জাতি’ সে আমার কন্যা–১৯৩৬ সালে সে আমাদের ঘরে এসেছে। সে যেন ঐ গানটাকে রূপ দিচ্ছে— ”কি সুখে ঐ ডানা দুটি মেলেছ জোনাকি ও জোনাকি-”

এখানে আমার সবচেয়ে বড় কাজ ক্ষেতে নেমে সব্জীর চাষ। ছ'সাত বছর তো আলুর চাষই করেছি সমনোযোগে—বীজের কুড়িগুণ ফসল হত আমার, কৃতিত্বের গৌরবে আমি আনন্দিত। আমার এই অধঃপতনে কেউ হয়ত হাসতে পারেন কিন্তু অবিশ্বাস্য ঠেকলেও বলি যে কোনো কবিও অবশ্যই আলুর চাষ থেকে আনন্দ পেতে পারেন। একটা ছোট বীজ পোঁতা হয়েছিল মাটির ভিতরে সে কি করে বর্ধিত হচ্ছে কে জানে? আমরা গোড়ায় মাটি তুলে দিচ্ছি, জল দিচ্ছি কিন্তু যখন ফসল তোলবার সময় মাটি সরিয়ে দেখা যায় সেই ক্ষুদ্রবীজটি শুষ্ক হয়ে রয়েছে আর তার থেকেই প্রাণ পেয়ে বড় রসাল ফল ফলে তাকে ঘিরে আছে তখন কম আশ্চর্য লাগে না—একটু একটু করে মাটি সরান হয়, একটা একটা করে আলু গড়িয়ে পড়ে। আমি সারা দুপুর ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলু সংগ্রহ করি মালীর সঙ্গে। ঝুড়িতে আলু স্তূপ হয়ে ওঠে, আমার মন এক অদ্ভুত আনন্দে ভরে যায়-‘বড় বিস্ময় মানি হেরি তোমারে—' মনে হয় আমি যেন ভ্যানগগ-এর মতো ছবি আঁকলাম পোটেটো-ইটার্স। কোথায় বিস্ময় নেই, কোথায় আনন্দ নেই! ঐ যে পোকাটা একেবারে ডালিয়া পাতার মত দেখতে, পাতার সঙ্গে মিশে আছে, যতক্ষণ না নড়ছে বুঝতেই পারবে না যে ওটা প্রাণী, পাতা নয়। একটু নাড়া লাগাতেই ও পাতার মতই নিশ্চল হয়ে যাবে আত্মরক্ষার চেষ্টায়, ওই কি কম বিস্ময়কর। দেখলে বিশ্বাস হয় না যে একটা পোকার শরীর একটা পাতার এমন নিখুঁত অনুকরণে তৈরী হতে পারে। যখন পোকাটা মরে যায় পাতার মত শুকিয়ে হলদেটে হয়ে যায়—nature's mimicry———একবার জ্যোতিপ্রকাশ সরকার ওমনি একটা পোকা কাগজের বাক্সে করে নিয়ে আসছিলেন বোস ইনস্টিট্যুটে দেখাবেন বলে, পোকাটা যখন

মরে গেল তখনও একটা পাতাই শুধু, শুকনো পাতা, আর যখন তাতে পিঁপড়ে লাগল তখনই বোঝা গেল ওটা একটা প্রাণী।

এই রাজ্যে আমার দিন কাটছে, এখানে দেখবার অনেক কিছু আছে—বর্ণ, গন্ধ, রূপের এক সমারোহ যা দেখবার চোখ আমার একটু একটু করে দিনে দিনে তৈরী হচ্ছে। 'তবু'— আমার সেই 'তবু' আমায় কোনোদিনও ছাড়ল না— কখনো অর্ধরাত্রে আমি উঠে আসি আমার স্বামীর শয্যা থেকে, বারান্দায় বসে থাকি, মনে মনে আমার পরিচিত লোকদের কথা ভাবি, ওরা নিশ্চয় ওদের অবস্থায় সন্তুষ্ট, আমি কেন নয়? আমি তো সবই পেয়েছি তবু আমার শূন্যতা কেন যায় না? আমি যা করতে এসেছি যেন তা করা হল না, আমি যা বলতে এসেছি তা যেন বলা হল না, আমি যা চেয়েছি তা যেন পাওয়া গেল না—এই অনির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষায়, এই চির অতৃপ্তির কোনো নাম নেই, কারণ এটা বোধ হয় খুব স্বাভাবিক জিনিস নয়- -এ যেন সুখে থাকতে অসুখ সৃষ্টি করা, তবু আমার ঐরকমই। মায়াকভিস্কর একটা কবিতা পড়েছিলাম তাতে যেন আমার এই সময়কার মনের ভাবটা আছে—-'শোনো এখন! যদি আকাশে তারা জ্বলে তাহলে নিশ্চয় কেউ আছে যে সেগুলো দেখতে চায়, এমন কেউ আছে সে যেন বলে ওগুলো জ্বলুক, কেউ বলে ঐ ছোট বিন্দুটা কি, ওটা কি একটা রত্ন? মধ্যদিনের ধুলোর ঝড়ে আক্রান্ত হয়ে ঈশ্বরের প্রসারিত হস্ত চুম্বন করে সে বলে, তারাহীন হয়ে আমি বাঁচতে পারব না।'

অন্ধকার একলা রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে আমি এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকি— একটি তারা দেখব বলে। 'আকাশভরা তারার মাঝে আমার তারা কই?'

কেউ যদি মনে করেন যে কাহিনী দিয়ে এই লেখা শুরু করেছিলাম এ বেদনায় তারই স্মৃতি অনুস্যূত তাহলে ভুল হবে, একেবারে ভুল। আমার এই শূন্যতাবোধ কোনো একজন ব্যক্তির জন্য নয়, একেবারে নয়। এ শূন্যতার অর্থ আমি জানি---আমি অন্য কাউকে নয় আমাকেই খুঁজছিলাম। আমার সত্তার

যে অংশ নিজেকে অভিব্যক্ত করতে পারে নি তারই বেদনা। আমার বুকের মধ্যে মোচড় দিত। আমার অন্য অংশ হৃষ্টচিত্তে সংসারে লিপ্ত ছিল। যখন সন্ধ্যা নামতেই বেয়ারা জানালা বন্ধ করে ফায়ারপ্লেসে মোটা মোটা কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে যেত—আমি আগুন পোয়াতে পোয়াতে বসে উল বুনতাম—আমার স্বামী একটা বইয়ের পাতা ওল্টাতেন, দুজনেই নীরব। তখন আমি কোনো সূক্ষ্ম জিনিস ভাবতাম না। কারুর জন্য আমার মন কেমনও করত না। স্বামীর চাকরীর উন্নতি, উপরওয়ালার অবিচার, কন্যার খাদ্যে অনীহা ইত্যাদি নিয়ে চিন্তিত হতাম—কিংবা নূতন কোনো ফার্নিচারের নক্শা ভাবতাম।

জীবনের কথা লিখতে গিয়ে ভাবছি এ জীবনটায় কোনো বৃত্তান্তই নেই—থাকবে কি করে? বৃত্তান্ত ঘটে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংস্পর্শে সংঘর্ষে বা কর্মবহুল জীবনের নানা ঘটনায়—প্রকৃতি আর কি বৃত্তান্ত ঘটাবে? এখানে যা সব ঘটনা ঘটে তা মারাত্মক হলেও তা নিয়ে জীবনের গল্প হয় না। যেমন দাবানল জ্বলে প্রতি বছর। 'দাবানল' কথাটা কাব্যে অনেকেই পড়েছে, দেখেছে ক'জন? গ্রীষ্মকালে গহন বনে পাতা শুকিয়ে শুকিয়ে ইন্ধন হয়ে থাকে তারপর হঠাৎ কোনো শুকনো ডালের ঘর্ষণে স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে কিংবা কোনো বনচারী অসাবধানে অগ্নিকণা ফেলে গেলে শুকনো পাতায় আগুন লাগে, ধীরে ধীরে ধুইয়ে ধুঁইয়ে সেই আগুন বাড়তে থাকে, তারপর যখন সমস্ত পাহাড়টা জ্বলে ওঠে বহুদূর থেকে দেখা যায়। গাছ থেকে গাছে, পাহাড় থেকে পাহাড়ে বুভুক্ষু অগ্নিদেব লাফিয়ে লাফিয়ে চলেন—পশুদের পালাবার পথ থাকে না, তাদের আর্তনাদ শোনা যায়। একবার দাবানল জ্বললে তা নেবান যায় না। একমাত্র উপায় একটি বৃত্ত করে গাছ কেটে দেওয়া যাতে আগুন ছড়িয়ে না যায়। এই বিপজ্জনক কাজে আমার স্বামীকেও এগিয়ে যেতে হয়, কারণ বুদ্ধিমান লোকের পরামর্শ প্রয়োজন। মানুষের বোকামী কতদূর পৌঁছতে পারে তা প্রায়ই এখানে দেখি। মাটি কাটা হচ্ছে রাস্তা চওড়া হবে, দুটো লোক কেটে যাচ্ছে কেটেই যাচ্ছে—উপরে বড় পাথর আছে নিচে মাটি কেটে কেটে পাথরটাকে আলগা করে ফেলেছে তারপর সেই বিরাট

প্রস্তরখণ্ড তাদের উপর গড়িয়ে পড়ল, দুটো মানুষের জ্যান্ত কবর হয়ে গেল। আমার স্বামী ছুটলেন। শুনলাম লোক দুটো সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেছে, শুধু একজনের একখানা হাত বেরিয়ে আছে। ইনি তে চোখে দেখে এসেছেন আমি শুনে শুনেও ঐ একখানা মৃত হাতের কথা ভুলতে পারলাম না অনেক দিন।

আদিম অরণ্যের কথা বলছি—আদিম অর্থাৎ এখানে প্রথম যে গাছ জন্মেছিল সেই আছে—এখনও এখানে সেই সব গাছ আছে যা যে যুগে কয়লা হয়েছিল সেই যুগের গাছ—ট্রী-ফার্ন—ফার্ন গাছই কিন্তু বড় বড় খেজুর গাছের মতো। কোনো মানুষ কখনো ঢোকে নি এরকম বন আছে, সেখানে এখন নূতন আবাদ হবে। হাতির পিঠে সেই খাড়াই পাহাড়ে উঠে আবাদের জন্য উপযুক্ত জমি বেছে নিলে সেইখানে গাছকাটা শুরু হবে, যন্ত্রপাতি কিছু নেই, বিরাট বিরাট বনস্পতি কুড়ুল দিয়ে কাটা হচ্ছে। প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে—গুর্খাদের সহ্যশক্তি তুলনাহীন—বিনা এ্যানেসথেশিয়ায় ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং করে যদি হাড় কাটে হাতুড়ে ডাক্তার—এরা চুপ করে থাকতে পারে। কলকাতার শৌখীন পরিবেশ থেকে আমি এইখানে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা কাটাতে এসেছি।

এই গণ্ডগ্রামে টেলিফোন তো নেই, টেলিগ্রাফ অফিসও নেই--- একটা খোড়ো ঘরের হাসপাতালে একটি হাতুড়ে ডাক্তার আছে—টেলিগ্রাফ অফিস পাহাড়তলিতে সাত আট মাইল দূরে। এই পাণ্ডববর্জিত দেশে আসতে হলে ছয় মাইল খাড়া পাহাড় খুব সরু পথ দিয়ে উঠতে হয়। গাড়িটা প্রায় সোজা হয়ে থাকে এবং খাদের দিকে দু'তিন ইঞ্চি জমি বাকি থাকে কোনো কোনো সরু বাঁকে।

কিন্তু আমার সাহস হচ্ছে, অনভিজ্ঞতার সাহস, আমি এই অগম্য স্থানে আসবার জন্য কবিকে ডাকছি, যদিও উনি অল্পদিন হয় দারুণ ইরিসিপ্লাস রোগে ভুগে উঠেছেন—আমার চিঠি পেয়ে তাঁর ধারণা জন্মাচ্ছে যে আমি আমার প্রতিজ্ঞা রেখেছি এবার তাঁরটি রাখতে হবে। মার একটা চিঠি পেয়ে আমার উৎসাহ আরো বেড়ে গেল। মা লিখেছেন, "আমরা চণ্ডালিকা দেখতে গিয়েছিলাম। নাচ শেষ হলে যখন কবিকে প্রণাম করতে গিয়েছি, তিনি বললেন,—অমৃতা আর এসব কিছু দেখতে পায় না— কোথায় যে তোমরা তাকে পাঠিয়ে দিলে সুধা।" মা আরো লিখেছেন, "আমার মনে হয় আমাদের দেখলে ওঁর তোর জন্য মন কেমন করে।"

চিঠিটা পেয়ে আমি আবার তাঁকে আসবার জন্য লিখলাম। আমি সাধারণত তাঁকে বেশি চিঠি লিখি না কারণ আমি জানি চিঠি দিলে উত্তর না দিয়ে তিনি পারেন না কিন্তু অত কাজের মধ্যে সহস্র জনের সহস্র আব্দারে উনি উদ্ব্যস্ত। আবার কেন আমি পরিশ্রম বাড়াব? কিন্তু এখন আমি লিখছি, এমন চিঠি লিখছি যাতে তিনি মনে করেন আমি একেবারে আনন্দের জোয়ারে ভাসছি।

আসবার কথা ঠিক হবার পর থেকে আসা পর্যন্ত দু'তিন মাসের সময়টা ঐ জোয়ারের তরঙ্গ উত্তাল হয়। এ পাহাড়ে দু'চার ঘর ও কাছাকাছি পাহাড়ে যে সব বাঙালী আছেন সকলেই চমৎকৃত। এখন আত্মীয়স্বজন অনেকেরই ইচ্ছা আমার বাড়িতেই এসে থাকে কিন্তু আমি এখন ভীড় চাই না।

আমরা সাজানো বাড়ি আবার সাজাচ্ছি—ঘষা মাজা চলছেই—ফুলের কেয়ারী ছাঁটা হচ্ছে, লনে ঘাস বাছা হচ্ছে, টবে রং হচ্ছে, পর্দা বদল হচ্ছে—আমি রেখেছি—'রেখেছি কনক মন্দিরে কমলাসন পাতি'—আমার নির্জনতার অবসাদ কোথায় পালিয়ে গেছে, যে ঝরনাটা ঝরঝর শব্দে আমাকে হয়রান করে দিত এখন তার শব্দটা বদলে গেছে সেটা কুলকুল ধ্বনি হয়ে গেছে, আর ঐ যে ঝিঁঝি পোকার দল দিবারাত্র ঝি ঝি ঝিঁ ঝিঁ করে আমার মাথার মধ্যে স্ক্রু-ড্রাইভার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঢোকাত হঠাৎ সেটা ঝিল্লীরব হয়ে গিয়েছে! সিলভার ফারের পাতার ভিতর দিয়ে ঝড়ের বাতাস সোঁ সোঁ করে অরণ্যের দীর্ঘশ্বাস নিয়ে আসত সেটাও স্বর্ণবীণার মত বাজতে লাগল—'তুমি এস, হৃদে এস, হৃদিবল্লভ হৃদয়েশ——

উনিশ শ' আটত্রিশ সাল থেকে চল্লিশ এই তিন বছর হচ্ছে আমার জীবনে আলোকবর্ষ বা অ-লোক বর্ষ—আমি এই সময়কার কথা এখানে লিখছি না—শুধু আমার অন্তর্জীবনপ্রবাহের গতিটা চিহ্নিত করছি। সময়ের আপেক্ষিকত্ব আমি নানাভাবে বুঝছি এই তিন বছরে যখন তিনি আসছেন বা ফিরে গিয়ে আবার আসবেন এই সময়ের মধ্যে কোনো ছেদ নেই—এটা একটা অখণ্ড সময় যা আমার সারাজীবনের চিরঅতৃপ্তির মাঝখানে অমৃতপাত্র হাতে অচঞ্চল আছে, আমার অকিঞ্চিৎকর জীবনকে মহৎ মূল্য দিয়েছে।

এই গৃার্হস্থ্য তাঁর ভালো লাগছে। আমি শেষ রাতে উঠে প্রস্তুত হই—যখন তিনি ভোরবেলায় পূর্বমুখী হয়ে ঘণ্টা দেড়েক বসে থাকেন তাঁর চেয়ারের পাশে এসে বসি—এই ভাবে আমার দিন শুরু হয়, শেষ হয় যখন তাঁকে বিছানায় শুইয়ে গায়ে চাদর দিয়ে মশারী গুঁজে দিয়ে আসি তখন। ইনি বাড়িতে থাকা মানেই সর্বদা একটা রাজসূয় যজ্ঞ চলেছে—এত যে নির্জন জায়গা তাও ঝুপ করে সকাল দশটা এগারটায় এক গাড়ি লোক এসে উপস্থিত হবে পথ খুঁজে খুঁজে – আগে খবর দিয়ে আসবে তার উপায় নেই কারণ এখানে তো

টেলিফোন নেই। তখন এই অতর্কিত আক্রমণে আমি পরাজিত হই না। তাঁদের মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করি ভালোমতোই। নির্জনতা পালিয়ে গেছে এই পাহাড়ে গ্রাম থেকে—বাড়িতে সর্বদা উৎসবের গান বাজছে শুধু আমার মনে নয় সকলেরই মনে। আমার স্বামীও আগের চেয়ে বেশি কথা বলছেন, তাঁর টিপ্পনীকাটা রসিকতাও সংখ্যায় বেড়েছে। চারিদিকে বাতাস যেন সুখে লঘু—আমরা উড়ছি, পৃথিবীর মাটি থেকে একটু উপরে উঠে আছি। আমি তাঁর সব কাজগুলি নিজের হাতে করি, লেখা কপি করা থেকে শুরু করে টেবিল ঝাড়া, বিছানা করা—রূপার থালা মাজা, পালিশ করা সব। ওঁদের বাড়ির ভৃত্যকুল এতে অবাক হয় কারণ তারা এমন কাণ্ড দেখে নি। যে ঘরটায় উনি বসে লেখেন সেই ঘরের পাশে ওঁর স্নানের ঘর, তারপরে শোবার ঘর। একদিন স্নানের ঘরে বসে ওঁর কাপড় কাচছি—বাগানের দিকের দরজাটা খোলা আছে, বাগানের পথ দিয়ে যেতে যেতে অ-বাবু হঠাৎ দেখতে পেয়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে এলেন —"একি ব্যাপার কি? আপনি কাপড় কাচছেন কেন? এতগুলো লোক রয়েছে কি করতে?"

আমি খুব বিপদগ্রস্ত মনে করছি, চুপচাপ তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নেবার চেষ্টা করছি। 'ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন—একি? এরা সব গেল কোথায় ?" "চলে যান অ-বাবু, আমি রোজ করি, আজও করব।"

`রোজ কাপড় কাচেন?"

"হ্যাঁ, তাতে আপনার কোনো ক্ষতি হয়?"

"উনি যদি জানতে পারেন খুব রাগ করবেন।"

"জানতে পারবেন কেন?"

"আমি বলে দেব তাই"—এই বলে অ-বাবু হঠাৎ লেখার ঘরের দিকের দরজাটা খুলে দিলেন। তারপর কবিকে লক্ষ্য করে বললেন, "দেখুন একবার অমৃতা দেবী আপনার কাপড় কাচছেন বসে বসে, কথা শুনছেন না—"

আমি তো অপ্রস্তুত। আমার কর্ণমূল ঝাঁ ঝাঁ করছে, আমি কাপড় ছেড়ে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে আছি। উনি চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা বই পড়ছিলেন। বইটা মুখের সামনে থেকে নামিয়ে এই দৃশ্য দেখে মৃদু মৃদু হাসছেন—"তুই থাম তো অ—তুই এ সবের কি বুঝিস ? দরজাটা বন্ধ করে দে। তুমি তোমার কাজ কর অমৃতা, আমি তো তাই ভাবি আমার কাপড় এত ফর্সা হয় কি করে আজকাল!"

আসলে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই এর উল্টো হয়েছিল, আমি যে ওদের থেকে ভালো কাচতে পেরেছি তা কখনই নয় কিন্তু এটা পুরস্কার।

তিন বছরে চারবার এসেছিলেন কবি এই গণ্ডগ্রামে—পঞ্চমবার এখানে আসবার পথে কালিম্পং-এ অসুস্থ হওয়ায় আর আসা হল না। এই তিন বছরের পরিপূর্ণ দানে আমার সব ক্ষয়ক্ষতি ধুয়ে মুছে গেল—এই তিন বছরেই আমার সেই সত্তা তৈরী হয়েছে যে নিজেকে সময়সীমা অতিক্রম করে দেখতে শিখেছে।

আমি অনির্বচনীয়কে অনুভব করেছি—'পেরিয়ে মরণ সে মোর সঙ্গে যাবে কেবল রসে কেবল সুরে কেবল অনুভাবে।' এ দানের মহিমা তখন ঠিকমত বুঝতে পারি নি। এই দুর্গম স্থানে ঐ বিপজ্জনক পথ পার হয়ে আসা কি সহজ কথা! আমার নিকটতম আত্মীয়ের মধ্যেও তাঁর চেয়ে অনেক কম বয়সেরও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সাহস করতেন না। কিন্তু চিরতরুণ কবি বাইরের বাধাবিঘ্ন গ্রাহ্য করলেন না। আরো আমার আনন্দের কথা এই যা অ-বাবু প্রায়ই মনে করিয়ে দিতেন তা হচ্ছে এক জায়গায় ইতিপূর্বে উনি দু'বার যান নি।

এ নির্জন অরণ্যে বিশ্বকবির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বও এল, আমি পৃথিবীর মানুষের সঙ্গ পেলাম। দেশবিদেশের গল্প শুনতাম। বার্গস, যাঁর দর্শন পড়েছি যিনি একজন জীবিত মানুষ তা ভাবি নি কখনো— তাঁর কথা শুনলাম। বানার্ড শ', রোমা রোলা, বার্ট্রাণ্ড রাসেল সব বইয়ের মলাটের নামগুলো নানা কথা বলতে লাগল। অজ্ঞাত বিশ্বের দৃশ্য দেখলাম। সবচেয়ে বেশি শুনতাম রাশিয়ার কথা। সেখানে যে নূতন পরীক্ষা চলেছে তার প্রতি তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না।

বৃহদাকার মস্কো নিউজ আমি সেই প্রথম দেখলাম—তিনটে প্রবন্ধ আমাকে দিয়ে অনুবাদ করালেন তিনি— সেগুলো বিভিন্ন পত্রিকায় গেল। সব দিক থেকে পূর্ণ হয়ে উঠছি আমি—— আমাকে মানুষ করলেন তিনি—বললেন, মানুষের ইতিহাসটা পড়ো—ছয় বছর ধরে মহাভারত পড়লাম, দু'বছর ঋগ্‌বেদ আর পাঁচ বছর 'হিস্ট্রোরিয়াস হিস্ট্রি অফ দি ওয়ার্লড' — তাঁরই নির্দেশে।

আমাদের এই সংসারটা সবসুদ্ধ তাঁর ভালো লেগেছে—আমার স্বামীকে উনি বলেন পারফেক্ট জেন্টলম্যান। বাহিরে সুন্দর প্রকৃতি আর তার সহযোগী মানুষের সখ্য দুটো নিয়ে একটা সম্পূর্ণতা।

আমার স্বামীও এখন আগের চেয়ে অনেক কথা বলেন। আমি একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—"আমি যে সর্বদা এঁকে নিয়ে এত মেতে আছি তাতে তোমার হিংসা হয় না? হাসচ কেন? বল না, বল না।"

"হিংসে হতে যাবে কেন? তুমি যা তুমি তা, অন্যরকম করতে চাইব কি আমি?"

"তবু হিংসে হওয়ার কথা কিন্তু।"

"কার সঙ্গে কথা? তুমি যদি মীরাবাঈ হতে আমি কি হিংসা করতুম!"

একদিন লেখার ঘরে কবি বসে আছেন লেখার টেবিলের পাশের চেয়ারে—আমি স্নান সেরে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছি—চারদিকে সেদিন রোদ ঝলমল করছে—দূরে মাছের জন্য একটা জলাশয় করেছি তারই পাড় ঘেঁষে ফুটেছে টাইগার লিলি— শ্রেণীবদ্ধ দীর্ঘ রঙীন রেখার দিকে উনি তাকিয়ে আছেন, বলছেন, "কি সুন্দর এই ফুলের সারি সাজিয়েছ—কে এই বিদেশিনী ?"

"ওতো জংলি লিলি। এখন তো ফুল নেই,—শীতের সময়েই ফুলের সমারোহ।

"জানো অমৃতা, তোমরা খুব সুন্দর করে সংসার করছ— আমি জানতুম তুমি পারবে। যখন প্রথম এখানে আসার কথা হয় সকলে বললে, কি জানি কি রকম ব্যবস্থা হবে, আপনার কষ্ট হবে। আমি ভাবছি সে তো জানে আমার

কি দরকার, নিশ্চয় অসুবিধা হবে না নৈলে ডাকবে কেন? সুন্দর তোমার সংসারটা ঐ ঝরনার মতো ঝর ঝর করে গান গেয়ে বয়ে চলেছে— সবচেয়ে আমার কি ভালো লাগে জানো, তোমরা দুজনে ঝগড়া কর না—দেখি তো ‘প’ আর ‘র’-কে কি ঝগড়াই করতে পারে, থামতেই চাই না, থামতেই চায় না, ‘প’ শেষ পর্যন্ত চুপ করে যায় কিন্তু ‘র’ আর থামে না, সাপের মতন ফিরে ফিরে আসে।”

“তা আপনি কিছু বলেন না?”

“কত বলি কিচ্ছু হয় না। সুন্দর সংসার সৃষ্টি করাও একটা সৃষ্টিকর্ম, একটা কাব্য। এই ফুলের রাজ্যে ফুলের মত শিশুটিকে নিয়ে তোমরা সুখে আছ—এতে আমি খুব খুশী হয়েছি অমৃতা, তাই তো বার বার আসছি—”

চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে আমার শরীর মন নিস্পন্দ – সত্য কথা বলতে হবে আমায়, এখুনি বলতে হবে—আমার সারা জীবনটা কি মিথ্যা দিয়ে গড়ব?

“আপনি যতটা বলছেন তা ঠিক নয়, আপনাকে ঠকাচ্ছি আমি।”

“কি বলছ?” উনি পিছন দিকে হাতটা বাড়িয়ে টেনে আনলেন আমায় সামনের দিকে— ”কও কি কন্যা? ঠকাচ্ছ কাকে?”

“সকলকে। কিছু করতে পারি নি আমি, সব বাইরের। অর্ধেক ভুয়া—আমার একলা রাতের কোনো সঙ্গী নেই।” আমি এখন প্রস্তুত, সম্পূর্ণ প্রস্তুত—উনি যদি কোনো ভৎসনা করেন ভালো হয়।

“কেনো নিরর্থক আত্মপীড়ন করছ? আমি তোমাকে আগেও বলেছি আবারও বলছি মানুষ আপনাকে যা দিতে পারে তা দেশ, কাল, পাত্রে সীমাবদ্ধ—সবটা দেওয়া যায় না, পাওয়াও যায় না, তাই যা পাওয়া গেল না তার জন্য হা-হুতাশ করে লাভ কি? যা হয়েছে তাই কি যথেষ্ট নয়? ফুলের সারির দিকে হাত দেখিয়ে বললেন—”এই যা হয়েছে, এই যা করেছ এর জন্যই আমি grateful madam grateful to you”

এসব কথা সত্ত্বেও আমি বুঝতাম এই গভীর নির্জনতার কতখানি ভার আছে তা তিনি বুঝতেন—প্রত্যেকবারই যাবার সময় তাই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে নামতে হত। আমরা শূন্য ঘরে বসে থাকব আর ওরা সদলবলে চলে যাবেন তাঁর করুণাদ্রব মন তা কিছুতেই সহ্য করতে পারত না। যাবার কয়েকদিন আগে থেকেই তাই বলতে শুরু করতেন 'এর চেয়ে না এলেই ভালো হত—তোমাদের কষ্ট বাড়ানো— আমি আর আসব না!'

একবার যাবার আগে গোছগাছ চলেছে, আমি বইগুলো স্যুটকেসে ভরছি হঠাৎ আমার ভীষণ মন কেমন করতে লাগল, উনি চেয়ারে হেলান দিয়ে বই পড়ছিলেন, আমি এসে ওর পায়ের কাছে বসে পড়ে ওর কোলের উপর মাথা রেখে কাঁদতে লাগলাম, ওর ডান হাতে বই ধরা ছিল সেটা বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাতটা আমার মাথার উপর রেখে বললেন, "কোনো ভয় নেই, কোনো ভয় নেই"—ঠিক তখুনি 'সু'বাবু ঘরে ঢুকলেন—ঢুকে আমায় ঐরকম ক্রন্দনরতা দেখে অপ্রস্তুত, আমি বুঝতে পারছি কবিও অপ্রস্তুত—আমার চুলের মধ্যে ওঁর চলমান আঙ্গুল গুলো থেমে গেছে। প্রকাশ্যে আবেগ দেখান ওঁর পছন্দ নয়। একটি মুহূর্ত মাত্র, তারপর উনি খুব সহজভাবে বললেন, "সু তুই আর এর সাক্ষী থেকে কি করবি বরং মীলুকে ডেকে দে"—মীলু এসেই আমার চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলল, "কি পাগলামি শুরু করেছ? ওঁকে এরকম করে জ্বালাতন করলে উনি আর কোনো দিনই আসবেন না"—কবি বলছেন, "তুমি যে দেখছি উল্টা বুঝলি রাম, আমি কি অমৃতার হাত থেকে রক্ষা করতে ডেকেছি তোমায় ? আমি ডেকেছিলাম 'সু'র হাত থেকে রক্ষা করতে !"

সেদিন সন্ধ্যেবেলা আমায় তিনি একটা কথা বলেছিলেন বহুমূল্য রত্নের মত সে কথাটা আমি হৃদয়ে ধারণ করে আছি। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, লম্বা লম্বা গাছগুলো অন্ধকার শুষে নিয়ে কালো কালো দীর্ঘদেহ প্রেতের মত দাঁড়িয়ে আছে। পরের দিন এঁরা চলে যাবেন—আমি চুপ করে ওঁর পায়ের কাছে বসে আছি। তখনো

সবাই বেড়িয়ে ফেরেন নি, তাই চারদিক আরো নিঃশব্দ। হঠাৎ কবি বললেন, "আমি তোমায় একটা কথা বলছি অমৃতা, এতে যদি তোমার কোনো সান্ত্বনা হয়—জীবনে আমি অনেক পেয়েছি, তবু শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসার মিলিত যে অর্ঘ্য তুমি আমাকে দিয়েছ এরকম জিনিস আমিও বেশি পাই নি। বিদায়ের আগে এ আমারও দরকার ছিল নইলে বার বার আসতুম না।"

তিনি জানতেন আমার কর্মশক্তি যে পাহাড়ের কন্দরে আটকে আছে এটাই আমার সবচেয়ে ক্ষতি। এমনিতেই আমাদের দেশে তখন মেয়েদের কর্মক্ষেত্র ছিল সঙ্কীর্ণ—ওরকম একটা স্থানে তো কথাই নেই—আমার কর্মের পথও তিনি খুঁজছিলেন—

লেখার ঘর থেকে দেখা যায় একটা পার্বত্য পথ, সেখান দিয়ে চলাচল করে মালবাহী ঘোড়া নিয়ে মজুরের দল। সেই দিকে তাকিয়ে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে পাহাড়ীদের সংখ্যা কত ?"

"চার পাঁচ হাজার হতে পারে!"

"তবে তোমরা একলা কেন? ওরা কি মানুষ নয়? ওদের তোমার ঘরে ডাক, ওদের কাছে যাও, মানুষের কত সমস্যা আছে, তাদের বন্ধু প্রয়োজন, ওদের বন্ধু হও না কেন?"

সেই জন্যই তাঁর জন্মদিনে আমরা পাহাড়ীদের নিয়ে উৎসবের আয়োজন করলাম— এখানকার অর্থাৎ এ জেলার ইতিহাসে শুধু নয়, বোধ হয় সরকারী প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বাড়িতে এই প্রথম মজুরেরা নিমন্ত্রিত হয়ে এল। চা-বাগানের মতো এখানেও নিয়ম ছিল কোনো অফিসারের বাড়ির হাতায় কোনো মজুর জুতো পরে ঢুকবে না। কোনো মজুর ঘোড়া চড়ে চলেছে, অফিসারের সঙ্গে দেখা হলে তৎক্ষণাৎ নেমে পড়তে হবে। একজন নামে নি বলে রিচার্ডস তাকে বেত মেরেছিল। এই সমাজে আমি একটা নূতন কাজ পেলাম, নূতন পথের নিশানা। ক্রমে ক্রমে আমাদের ঘরের দরজা ওদের দিকে খুলে গেল।

উনিশ শ' বেয়াল্লিশের দুর্ভিক্ষের সময় ইংরেজদের আসল মূর্তিটি দেখলাম—আমাদের উপর তো বিরুদ্ধতা ছিলই, চক্রান্ত করে গুর্খাদের রাগিয়ে তুলল এখানে যে কয় ঘর বাঙ্গালী আছে তাদের বিরুদ্ধে ও এ জেলার সমস্ত বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে। ইংরেজরা এই কাজে কত দড় তা সে সময় বুঝলাম। ওরা তো তখন হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গায় উস্কানী দিয়ে দিয়ে বিভেদের গহ্বর খুঁড়ে খুঁড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে এই বিশাল দেশের চিত্তভূমি, এখন ওদের নূতন করে রাগের কারণ এই যে বাঙ্গালী মন্ত্রিসভা হয়েছে—ভারতীয়করণ চলেছে এবং বাঙ্গালীরা বিদ্যায় ওদের চেয়ে বড় হওয়ায় ওদের মাথার উপর চলে গেছে, যাচ্ছে—উচ্চপদ পাচ্ছে। অতএব আবার সেই একই অস্ত্রে শাণ দাও। ওরা মজুরদের ক্ষেপিয়ে তুলছে, বলছে, আগেও তো যুদ্ধ হয়েছিল তখন কি চালের দাম এতো হয়েছিল? এখন বাঙ্গালীর রাজত্ব হচ্ছে বলেই এই দশা, এরপরে যখন আমরা অর্থাৎ ইংরেজরা চলে যাব তখন তোমাদের গ;ুর্খাদের কি হবে অবস্থা বুঝতে পারছ? কেউ আর চাকরী পাবে না, এরা বাঙ্গালী এনে এনে পাহাড়টা ভরিয়ে ফেলবে। অতএব ঠেঙ্গাও বাঙ্গালীদের, এরাই তো ইংরেজ তাড়াচ্ছে, অতএব শেষ কর এইবেলা এদের।

অথচ আমরা এ সব কিছু টের পাচ্ছি না! আমরা সরল ভালোমানুষ পড়ুয়া, রাজনীতির কিছু জানি না।

ভোরবেলা উঠে আমার স্বামী মিটিং-এ চলে গেছেন— চাল কেন পাওয়া যাচ্ছে না তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে! দুপুরবেলা যখন ওঁকে নিয়ে এল তখন সারা শরীর রক্তে ভাসছে—উনি কিন্তু হাসছেন—"ভয় পাবার কিছু নেই—বিশেষ কিছু নয়—"।

সেই সময়ে ভালো করে দেখলাম পুলিশের সঙ্গে যোগ রেখেই চক্রান্তটা হয়—নৈলে ব্যাপক দাঙ্গা হতেই পারে না। রটেছিল রাত্রে সমস্ত বাঙ্গালীদের পুড়িয়ে মারা হবে, দুটি শিশু নিয়ে আমি তো তারি অপেক্ষায় ছিলাম, তবুও সাহেব

এস্. পি এসে সাহেবদের সঙ্গেই কথা বলে চলে গেল। কিছুতেই থাকল না—তার স্ত্রী নাকি ডিনারে অপেক্ষা করছে। সে আবার স্বামী পাশে না থাকলে খেতেই পারে না। সেই সময়ে বুঝতে পেরেছিলাম, দাঙ্গাকারী যারা হাতে অস্ত্র নিয়ে মানুষ মারে তাদের দোষ নেই বললেই হয়—কারণ তারা একটা কিছু করা উচিত মনে করে, তার জন্য নিজেরাও বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে—অপরপক্ষে যারা চক্রান্ত করছে তারা নিজে কোনো দায়িত্ব না নিয়ে অন্যকে বিভ্রান্ত করে নিজে ফলটা ভোগ করতে চাইছে। তারপর থেকে সর্বদাই এই দেখলাম মানুষকে হিংস্র করে তোলবার কাজে যারা হাত পাকাচ্ছে তারাই মুখে বড় বড় কথা বলে সেজেগুজে সভায় এসে বসে...আসলে এটা ইংরেজদের একচেটিয়া নয়। যে সুবিধা পাবে সেই করবে।

দাঙ্গার পরে উনি সুস্থ হয়ে ওঠার পর আমি কবির কথা ভাবতে লাগলাম—'মানুষের দিকে চেয়ে দেখ'। আমি ভাবছি এতবড় যে দুর্যোগ ঘটল এ দোষ আমাদের ছাড়া আর তো কারুর নয়। আমাদের পাশে থেকে যদি এতটা অসন্তোষ পঞ্জীভূত হয়ে থাকে আর আমরা টেরই না পাই তাহলে মূঢ়তা তো আমাদেরই। আমি তখন ভালো করে ওদের দিকে তাকালাম আর তখনই বুঝতে পারলাম যে, যে নির্জনতার দুঃখ আমায় এতদিন পীড়িত করেছে তার থেকে উদ্ধারের পথ ছিল, শুধু সে পথটা আমি চিনতে পারি নি।

আমি অন্তর্মুখী হয়ে বই নিয়ে বসে আছি—আমার শূন্যতা ভরবে কি করে? সেখানে এ সময়ে পাহাড়িদের ঘরে দুর্ভিক্ষের বছরটা ছাড়া খাদ্যের অভাব ছিল না

কিন্তু খাদ্য ছাড়াও মানুষের অন্য প্রয়োজন আছে, আমি তারই আয়োজন করলাম—আমাদের ঘরের দরজা প্রসারিত হতে লাগল। উৎসবে অনুষ্ঠানে 'কুলি মজুরদের' নিয়ে আমার পরের চৌদ্দ বছর পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

ওপরওলা একজন আমার স্বামীকে বললেন, “আপনি কি লক্ষ্য করেছেন আপনার স্ত্রী মজুরদের সঙ্গে বেশি মিশছেন।”

“হ্যাঁ”

“এরকম হলে ডিসিপ্লিন থাকবে কি করে?”

“ডিসিপ্লিনের অভাব আগে কিছু লক্ষ্য করেছি—এখন তো করছি না।” “আপনি কি আপনার স্ত্রীকে নিষেধ করবেন?”

“না।”

“তাহলে আমি বলব?”

“না না, তাহলেই ডিসিপ্লিন ভঙ্গ হতে পারে।”

দেখলাম, সম্পূর্ণ অজ্ঞ অশিক্ষিত মানুষের মধ্যেও এমন লোক আছে যারা সূক্ষ্মভাবে বুঝতে পারে, যাদের মন গভীরের দিকে উন্মুখ, যাদের গলায় গান আছে, মনে কবিতা আছে, ছাই-ঢাকা আগুনের স্ফুলিঙ্গ যখন জ্বলতে দেখতাম, আনন্দে মন ভরে যেত। তাদের একজনের হাতে তৈরী একটি শিল্পনিদর্শন আজও আমার ঘরে বহুজনকে আনন্দ দেয়। সঙ্গী সর্বত্র পাওয়া যায়, মানুষই মানুষের সঙ্গী। পৃথিবীতে নানাজাতির, নানাশ্রেণীর সভ্য অসভ্য মানুষ দেখেছি কিন্তু সেই সময়কার গুর্খা জাতির মধ্যে যে সততা, সরলতা ও বিশ্বস্ততা দেখেছি তা পরে অন্য কোথাও দেখি নি। যখন ঐ দুর্গম নির্জন অরণ্যে বাস করতে যাই তখন যে শূন্যতা নিয়ে গিয়েছিলাম যখন ফিরে আসি তখন তার চিহ্নমাত্র ছিল না, একটি পরিপূর্ণ জীবন নিয়ে আমি ফিরেছি। স্নেহে, সখ্যে, মাধুর্যে তা পূর্ণ। বিনা এনেসথেশিয়ায় হাত কাটতে যাদের চোখে জল আসে না, আমাদের আসার সময় তাদের চোখে জলের অভিষেক আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টার সমাপ্তিকে গৌরবে ভরে দিয়েছিল।

উনিশ শ' তিপ্পান্ন সালে আমার কন্যার বিবাহ হয়ে গিয়েছে। এদিকে তার দশ বছর আগে আমার মার সংসার উনিশ শ’ বেয়াল্লিশেই সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গিয়েছে—উনিশ শ' একত্রিশ সালেই যে ভাঙ্গনের সূত্রপাত হয়েছিল দশ বছর ধরে একটু একটু করে তার কাজ এগিয়েছে এখন একটা পরিবার সম্পূর্ণ ধ্বংস। মা চারটি শিশু নিয়ে কপর্দকহীন অবস্থায় পৌঁছেছেন—আছে শুধু একখানি বাড়ি। এটিও যখন যায় যায় তখন আমি সিংহবাহিনী মূর্তি ধরলাম বাড়িটা রক্ষা করবার জন্য। আবার নিন্দার ঢেউ উত্তাল হল, এবার অন্যভাবে আগে বাবার নিন্দা করে করে যারা আমাদের সংসারটা উত্তপ্ত করে তুলেছিল এবার তারাই অন্যমুখে বলতে লাগত এত বিদ্বান লোকের স্ত্রী-কন্যারা টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। অতএব যোগ্য সঙ্গিনী তো দরকার ছিলই—নির্দোষ শিশুগুলিকে যে পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হল, এমন কি তাদের বাঁচার ব্যবস্থাও করা হল না সেদিকে নিন্দাকারীদের লক্ষ্য নেই। যারা জীবনে নানা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে তারাই শুধু জানে, কোনো কোনো ঘটনা বাইরে থেকে যা দেখায় তাই তার যথার্থ রূপ নয়। একই ভালোবাসা যা মানুষকে স্বর্গের ছবি দেখায়, তার চারপাশ সৌরভে ভরে দেয়, তারই আবার এমন রূপ আছে যা মানুষকে চূর্ণবিচূর্ণ করে, সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারে। বাইরে থেকে দেখতে উভয়ের রূপ একই যেন দুই যমজ ভাই কিন্তু একজন প্রাণ দেয়, অন্যজন হরণ করে।

পতিপ্রাণা মা ছোট শিশুদের নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন—মানসিক কষ্ট তো আছেই কিন্তু আর্থিকটাও কম নয়। একটি বাড়ি ছাড়া আর কিছু নেই, তা বাড়ির ইঁট তো আর ভেঙ্গে ভেঙ্গে খাওয়া যায় না। কলকাতার বিখ্যাত আইনজ্ঞ আমাদের পরম সুহৃদ শ্রীযুক্ত গুপ্ত আমাকে ডেকে পাঠালেন, “তোমার মা ইনশিওরেন্সের এসাইনি ছিলেন, তিনি নিজে না লিখে দিলে কেউ তা ফেরৎ নিতে পারত না—দিলেন কেন?” মার উপরে রাগে আমার অস্থির লাগছে।

“মা ঐরকমই। আমি জানতাম না, তাহলে কিছুতে হতে পারত না।”

“দেখো অমৃতা, বাড়ি সম্বন্ধে কোনো কাগজে কিংবা সাদা কাগজেও যেন আর সই না করেন, মোটের উপর তোমার মা আর কিছু সই-ই করবেন না।”
“আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।”

“তাহলে আরো একটা কথা তোমায় বলি, বিষয়-সম্পত্তি এক পয়সা ছেড়ো না, যা পার ধরে রাখ, কিন্তু মানুষকে তোমরা ছেড়ে দাও।”

“মানুষকে ছেড়ে দাও, মানুষকে ছেড়ে দাও”, ক্রমে-ক্রমে কথাটা বড় হতে লাগল যেন একটা কালো জমাট মেঘ আকাশ ঢেকেছিল সেটা ফুটো হয়ে গেল, ছোট-ছোট টুকরো-টুকরো হয়ে সাদা তুলোর মত ছড়িয়ে পড়ল, তার ফাঁক দিয়ে দিয়ে নীল রঙ দেখা গেল । আমি যেন একটা বন্ধ ঘরে আটকে ছিলাম, এখন খোলা বাতাসে নিঃশ্বাস নিলাম। ঠিকই তো, মানুষকে কে ধরে রাখবে? ‘জীবনেরে কে রাখিতে পারে?’ এতদিন আত্মীয়স্বজনের উপদেষ্টামণ্ডলী আমাদের কি উদ্ভ্রান্তই করেছে। এই ছিন্নপাল সংসারের তরণীটা একবার এর কথায় আবার ওর কথায় যেন একটা পাথরে লেগে লেগে ফুটো ফুটো হয়ে গেল। এ বিপদে কি যে-সে লোক পথ দেখাতে পারে। একটা জ্ঞানী লোকের কথা শুনলাম।

মাকে এসে বললাম—”মা এতদিনে পথ পেয়েছি” মা অবাক হয়ে গেছেন—শ্রীগুপ্তের কথা শুনে তাঁর চক্ষুস্থির—”এই একটা উপদেশ হল? তুমি আবার তাই শতখান করে বলতে এসেছ? ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, আমি স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে তাঁর টাকাপয়সা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকব? এঁরা লেখাপড়া শিখেছেন? আমার স্বামী আগুনে ঝাঁপ দেবেন, আমি তাঁকে ধরব না, না সিন্দুক গোছাব?” মা কাঁদছেন, আমার একটু মায়া হচ্ছে না—‘আগুনে ঝাঁপ দেবেন’ এখনও future tense—”তা তুমি কি করবে, রুখতে পারবে?”

“দ্যাখ রু, আমার বিরাট প্রতিভাধর স্বামীর দুর্বলতা আমি জানি, এই তো প্রথম নয়, বহুবার তাঁকে রক্ষা করেছি আমি, নৈলে এত বড় হতে পারতেন

না, এবারও করব। তোর যদি আমার কথা ভালো না লাগে তবে চলে যা আমার সামনে থেকে।”

অতুল যশ ও মানের অধিকারী যিনি হতে পারতেন তাঁর নিজের ও সমস্ত পরিবারবর্গের মাথা হেঁট করে, সম্মান সম্ভ্রম ও সুখ নষ্ট করে দশ বছর পর যখন তিনি সম্পূর্ণ নির্বান্ধব অবস্থায় মারা গেলেন তখন তিনি মার কাছে ফেরবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন, শুনেছি বার বার বলেছেন, 'আমার কলকাতায় যেতে হবে আমার ক্ষমা চাইবার আছে— সে খবর মার কাছে পৌঁছতে দেরী হয়ে গেল। এটাই আমার অশেষ পুণ্যবতী মাতা ও অসাধারণ ক্ষমতাশালী পুরুষ পিতার জীবনের চূড়ান্ত ট্র্যাজেডি।

এইসব নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে আমার ক্ষুদ্র জীবনতরী কখনো স্রোতে ভাসছে, কখনো চড়ায় লাগছে—। আমি আর এখন ছোট বালিকাটি নেই—বাস্তব সংসারকে ভালোমতো চিনেছি। মনে কড়া পড়ে গেছে। সূক্ষ্ম অনুভূতির কোমল ত্বক ঘষে ঘষে শক্ত হয়ে গেছে। আমি কাজের মানুষ। নিতান্ত সংসারী। অবশ্য এটা ঠিক, সংসারের কাজে আমার শক্তি ফুরাতে চায় না। কলকাতায় ফিরে এসেও আমি তাই বিষণ্ন বোধ করি। পুরানো অতৃপ্তি আমার তাই ফিরে ফিরে আসছে—সাহিত্যের জগৎ থেকে আমি দূরে চলে গেছি, এখন এখানে ভীড় ঠেলাঠেলি খুব। লেখার সুযোগ পাচ্ছি না আমি। আমার লেখক জীবনটা পথ হারিয়েছে, তাই যে কাজ সামনে পাই হাতে তুলে নিই। নিন্দা অপমান যেমন সইতে হয়েছে, সম্মান শ্রদ্ধাও পেলাম অনেক। সমস্ত মিলিয়ে জীবনটা এখন অসঙ্গত কোনো বেসুরো গান বাজাচ্ছে না।

উনিশ শ' তিপ্পান্ন সালে আমার ছেলেমেয়েকে কলকাতায় রেখে আমার স্বামীর সঙ্গে ইউরোপ বেড়াতে গেলাম। মির্চার কথা এর আগে দীর্ঘ পনের বছরে একটিবারও আমার মনে পড়ে নি। অর্থাৎ মনে পড়বার মতো করে নয়। হয়তো কখনো মনে হয়েছে এমন একটা বিশ্রী ব্যাপার না ঘটলে আমার জীবনটা পবিত্র থাকত। মনকে সান্ত্বনা দিয়েছি সেই ছোটবেলার সামান্য একটা ঘটনার অপরাধ

কি আর আজ আমাকে স্পর্শ করতে পারে? ইয়োরোপে দেখা হল হিরণ্ময়ের সঙ্গে। বাবার ছাত্র, বিদেশে বিয়ে করে বসবাস করছে একটা সভায় তাকে দেখে প্রথম চিনতেই পারি নি। একেবারে সাহেব হয়ে গেছে। সে হঠাৎ আমায় জিজ্ঞাসা করলে "আপনার ইউক্লিডকে মনে আছে?" আমি ভাবছি এ উদ্ভট প্রশ্নটি করবার অর্থ কি হতে পারে। আমায় নিরুত্তর দেখে সে নিজেই বলছে, "সে আপনাকে একটা বই উৎসর্গ করেছে।"

"শুনে সুখী হলাম। আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি?"

এ কথার এখানে শেষ হয়ে গেল। আমার মনে তা বিন্দুমাত্র দাগ কাটল না।

সারা ইয়োরোপে চরকীর মত পাক দিচ্ছি আমরা। প্যারিসে এক অধ্যাপক ও তার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হল তাঁর নাম নিকোলাই স্তানেস্কু। কোথায় কি করে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সেকথা এখন আর কিছুতেই মনে করতে পারছি না—আমি শুধু দেখতে পাচ্ছি একটা বড় বৈঠকখানা ঘর। স্বল্প আসবাবে সজ্জিত। অধ্যাপক দম্পতি আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ করেছেন, এঁরা স্বদেশ থেকে বিতাড়িত। এঁরা মির্চার দেশের লোক। ওদের দেশের রেফিউজিতে প্যারিস ভরা— ওরা নিজেদের লাঞ্ছনার কথা বলছিলেন—। নির্বাসিতের দুঃখ অনেক। শুনছিলাম যুদ্ধমত্ত ইয়োরোপে মানুষের দুর্দশার কাহিনী। শুনছি আর ভাবছি মির্চার কি হল কে জানে! জিজ্ঞাসা করব কি? আবার ভাবছি যাই হোক আমার তাতে কি, মরুক আর বাঁচুক। তবে মরাটা আমি চাই না, আমার মনে আশা আছে এই বিপুল পৃথিবীতে একদিন না একদিন ওর সঙ্গে আমার দেখা হবে— এবং আমি সেদিন ওকে জিজ্ঞাসা করতে পারব আমার সঙ্গে এমন ছলনা করল কেন?

আমার মনের এক অংশে এ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, সে দিকে প্রশ্ন ওঠে ছলনা কি? বাবা তাড়িয়ে দিলেন ও কি করবে? যাবার সময় তার যন্ত্রণাকাতর মুখটা কি ছলনা হতে পারে? মনের অন্য অংশটা যেখানে অবিশ্বাসের অন্ধকার কালো হয়ে জমে আছে, সেখান থেকে উত্তর আসে ওরা ইয়োরোপের মৃগয়াপটু নাগরিক ওদের কাজই এই। কোনোমতে একটা চিঠি আমার কাছে পৌঁছতে পারত না? তাহলে আমি যা হয় করতাম। প্রত্যুত্তর আসে অন্য দিক থেকে, যদি ছলনাই হবে তবে পাহাড় জঙ্গলে ঘুরে বেড়াল কেন? অত কষ্ট করার দরকার কি ছিল ? সারাজীবন ধরেই আমার মন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে মাঝে মাঝেই এই প্রশ্নোত্তর করে চলেছে। মানুষকে বিশ্বাস করতে পারলে শান্তি, অবিশ্বাসে যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণার হাতে আর পড়তে ইচ্ছা নেই এই মুহূর্তে। একটা স্যাণ্ডুইচ মুখে পুরে খুব নির্বিকারভাবে আমি শ্রীমতী স্তানেস্কুকে জিজ্ঞাসা করলাম —"ইউক্লিড নামে একজন লেখককে কি চেনেন ?"

"চিনি বৈকি। তিনি ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে অনেক বই লিখেছেন। ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে তিনি অভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ।"

"তাই নাকি? তাঁর কোনো বই আপনার কাছে আছে?"

"নিশ্চয়ই" ভদ্রমহিলা উঠে গিয়ে 'যোগ' সম্বন্ধে একটি বৃহদাকার গ্রন্থ এনে আমার হাতে দিলেন—বইটা হাতে নিয়ে আমি দেখছি—পাতাটা খুলে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। বইটা আমার পিতাকে উৎসর্গ করা। লেখা আছে—'আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন গুরু—কে'। তাহলে? এত কাণ্ডের পরও কি তার বাবার সঙ্গে যোগ ছিল? এ ত দেখছি কচই একেবারে, ক্যারিয়ারিস্ট। এতদিনে বুঝলাম কেন আমায় চিঠি লেখে নি, ওই বইটা লেখা যে আরো দরকার ছিল, দরকার ছিল ভারত সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হবার। যশ, খ্যাতি, বিদ্যার গরিমা! ঘৃণ্য এই পাণ্ডিত্য, ওই কীর্তিলোভ, যশোলোভ। আমার ভিতরটা বহুকাল পরে জ্বলতে শুরু করেছে। আমার ঠোঁট কাঁপছে আমি দাঁত দিয়ে চেপে আছি রক্ত বেরিয়ে আমার মুখ নোনতা হয়ে গেল। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি শ্রীমতী স্তানেস্কু আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন—তাঁর চোখে কৌতূহল—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার নাম কি অমৃতা?"

"হ্যাঁ। কেন?"

"ও আপনাকে তো চিনি। আপনিই ইউক্লিডের ফার্স্ট ফ্লেইম"

ভদ্রমহিলা হাসছেন। রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। মনে মনে বলছি ফ্লেইম না অ্যাশ। আড়চোখে চেয়ে দেখি আমার স্বামী অধ্যাপকের গল্প শুনছেন, এদিকের কথাবার্তা তাঁর কানে গেছে কিনা কে জানে! আমি আর ওর সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম না, যথেষ্ট হয়েছে, ঐ লোকের সম্বন্ধে আর কোনো খবরে দরকার নেই, ওর নামও মনে আনবার যোগ্য নয়। কুড়ি বছর পর ওর খবর পেলাম আর সেই খবরই আমার বুকটা গুঁড়িয়ে দিল।

আমরা ইটালিতে বেড়াচ্ছি, রোম, ফ্লোরেন্স, ভেনিস ঘুরে দক্ষিণ ফ্রান্স অর্থাৎ রিভিয়েরাতে এসেছি। অপূর্ব দেশ, আমরা স্বামীস্ত্রী খুব সুখে দেশ দেখে

বেড়াচ্ছি। সংসারের ভাবনাচিন্তা নেই, চাকুরীস্থলের নানা উদ্বেগ নেই—শুধু মাঝে মাঝে ছোট ছেলেটার জন্য বড় মন কেমন করে এছাড়া এত আরামে বেড়িয়ে বেড়ান জীবনে কমই হয়েছে।

আবার প্যারিসে এসে একটা হোটেলে উঠলাম আমরা। সাঁ সে লিজের কাছেই— দুদিন পরে বিল দিতে গিয়ে চক্ষুস্থির! এত খরচ তো চালাতে পারব না আমরা। সত্যেনবাবুর কাছে খবর পেয়ে ল্যাটিন কোয়ার্টারে একটা হোটেলে এলাম —এদিকে অধ্যাপক ছাত্ররা থাকেন, খরচ অনেক কম। এই হোটেলে দশ দিন ছিলাম আমরা। আমাদের পাশের ঘরে একটি লোক থাকে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে মাথা নেড়ে সম্ভাষণ জানায়, একটু একটু ইংরেজি বলে, আমি ভাবি ও জাতিতে ফরাসী। ওর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় ছাড়া এই দশদিনে অন্য কোনো কথা হয় নি। যদি হত তাহলে কে জানে এ কাহিনী হয়ত অন্যরকম লেখা হত।

যেদিন আমরা প্যারিস থেকে ইংল্যাণ্ড চলে যাব সেদিন 'রিসেপশনে' অর্থাৎ আপিসের সামনের সিঁড়ির তলে বসে আছি। টেবিল-কৌচ দিয়ে বসবার জায়গা, যারা যাতায়াতের পথে অপেক্ষা করবে তাদের জন্য সাজানো। আমাদের জিনিসপত্র এক জায়গায় জমা হয়েছে। আমার স্বামী সেগুলি একে একে নামিয়ে এনে রেখে হিসাবপত্র মিটাবার জন্য কর্মচারীর টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময় সেই লোকটি নেমে এসে এদিক ওদিক করে গিয়ে আমাদের বাক্সগুলির কাছে দাঁড়াল — আমার বাক্সতে আমার নাম লেখা—আমি দেখছি লোকটা বাক্সর উপর নামটা পড়ছে আর আমার দিকে দেখছে। একটু ইতস্তত করে আমার কাছে এগিয়ে এল – সে বলল, "আমার নাম আইয়ন পোপেস্কু। আপনার নাম কি অমৃতা?" আমি চমকে উঠেছি আমার বুকের ভিতর হাতুড়ির ঘা পড়তে শুরু করেছে—

"কেন বলুন তো?" - !

"আই পে ইউ মাই হোমেজ" সে বাঁকাচোরা উচ্চারণে বলে আমার করপল্লব চুম্বন করল, এবার আর সন্দেহ রইল না সে কোন দেশের লোক।

"ওঃ বুঝেছি"—এক মুহূর্তে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—"আচ্ছা বলতে পারেন ঐ লেখক কোথায় থাকে?"

"এই প্যারিসেই, এখান থেকে দুটো ব্লক পরে।"

"দুটো ব্লক মাত্র ওদিকে?"

"হ্যাঁ" সে মুখ টিপে হাসছে। হা ঈশ্বর! এখুনি তো আমি এর সঙ্গে গিয়ে ধরতে পারি ওকে। বলতে পারি প্রবঞ্চক, অসত্যের মূল্যে বিদ্যা কিনেছ তুমি, তুমি পণ্ডিত হতে পার, জ্ঞানী হবে না। দর্ব্বী সুপরসান্ ইব—কাঠের হাতা যেমন সুপরসে ডুবে থাকলেও তার আস্বাদ পায় না তেমনি যার জীবনে সত্য নেই সে অনেক জানতে পারে, জ্ঞানী হবে না, মির্চা তোমার জীবনে সত্য নেই তুমি বেঁচে গেছ, তোমাকে কষ্ট পেতে হল না কিন্তু আমার সত্য কেন মরতে চায় না!

লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে আছে—"যাবে তুমি আমার সঙ্গে?"

"না। আমি যদি একটা চিঠি দিই পৌঁছে দেবে?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই", সে দৌড়ে কাগজ আর খাম নিয়ে এল।

আমি সংক্ষেপে যা লিখলাম তা মোটামুটি এই—'মির্চা, বহুদিন পর তোমার খবর পেলাম। কেমন আছ তুমি? বিয়ে করেছ তো? আমি আমার স্বামীর সঙ্গে ইয়োরোপে বেড়াতে এসেছি আমার একটি মেয়ে একটি ছেলে। তোমার সঙ্গে একবার দেখা হলে খুব খুশী হতাম। এক্ষুণি আমরা চলে যাচ্ছি, ডোভার চ্যানেল পার হব একটু বাদেই। লণ্ডনে আমার ঠিকান দিলাম। চিঠি পেয়েই যদি একবার এসো তো খুবই খুশী হব। আসবে তো?'

আমার স্বামী এগিয়ে এসেছেন কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে আমি তাঁর হাতে চিঠিটা দিলাম, "আমি তোমাকে সেই যে বিদেশী ছেলেটির কথা

বলেছিলাম না—সেই ভদ্রলোক এখানে আছেন-—তাঁকে লণ্ডনে নিমন্ত্রণ করলাম।" চিঠিটা উনি চোখ বুলিয়ে আমার হাতে ফেরত দিলেন।

"ঠিক আছে তো?"

"নিশ্চয়। এলে তো খুব ভালো হয়।"

উনি আবার চলে গেলেন। সে লোকটি আমার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল আমার কাঁধের উপর সস্নেহ হাত রাখল, "Write a good letter madam, you are trembling all over".

"I am not trembling, I am shivering. It is a cold day to-day"... আমি চিঠিটা খামে ভরছি সে আবার বললে, একটা ভালো করে চিঠি লিখলে না কেন? আমি তো বুঝি না তোমার চিঠি সেনসরড্ হবার দরকার কি?"

"না না সেজন্য নয়— আমার স্বামীকে ইংরেজীটা দেখতে দিলাম। আমার এপ্রপ্রিয়েট প্রিপজিশন ঠিকই হয় না।"

"ওঃ তাই নাকি!" সে চোখ মটকাচ্ছে, "এমন একটা কিছু করই না যেটা এপ্রপ্রিয়েট নয়!" আমরা লণ্ডনে চলে গেলাম। ও চিঠির উত্তর দিল না। সাত আট দিন আমি অপেক্ষা করলাম। সাত আট দিন আমার চোখ দিয়ে জল পড়ল। আমার স্বামী ভাবলেন, ছেলের জন্য মন কেমন করছে। তারপর আমি ভুলে গেলাম।

উনিশ শ' পঞ্চান্ন সালের মার্চ মাস থেকে আমরা কলকাতায় চলে এলাম। কুড়ি বাইশ বছর আগে যখন কলকাতা থেকে চলে যাই তখন এখানকার বিদ্বৎ সমাজের চেহারা অন্য রকম ছিল। এত ভীড় ছিল না। গুণী ব্যক্তির গুণ প্রকাশের সুযোগ ছিল, লেখকদের পত্রিকার আপিসে চাকরী নিতে হত না লেখা ছাপাবার জন্য। মহিলা লেখিকাদেরও সম্পাদকের সঙ্গে গল্প করবার জন্য পত্রিকার আপিসে ছুটতে হত না। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত সর্বত্রই ভীড় কম তাই পথ সোজা। এই কুড়ি বছরে সব বদলে গেছে। এখন সাম্যবাদের প্রকোপে মুড়ি মিছরির সমান দর। বন্যার জলের মতো শিক্ষাক্ষেত্রে, সাহিত্যক্ষেত্রে,

রাজনীতিতে মানুষ ঢুকছে যারা শিক্ষাকে শিক্ষার জন্যই, শিল্পকে শিল্পের জন্যই শ্রদ্ধা করতে শেখে নি, যাদের অন্তরে কবিতার ঝঙ্কার নেই তবু কবিতা লেখে, এই জগতে আমি বিচ্ছিন্ন বোধ করি কারণ আমি আগন্তুক। তবু আমায় লোকে চেনে জানে, আমি কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত, আমার কর্মজীবন প্রসারিত হচ্ছে বিঘ্ন সত্ত্বেও।

উনিশ শ' ছাপ্পান্ন সালে আবার ইয়োরোপ গেলাম— এইবার আমি শেষ বারের মত ইয়োরোপে ওর কথা শুনলাম। একটা বিরাট সভাগৃহে আমি রোস্ট্রাম থেকে নেমে আসছি একটি অল্প বয়সী মেয়ে, কোঁকড়া চুলে ঘেরা সুন্দর মুখ, আমার দিকে এগিয়ে এল,

"তুমিই অমৃতা?"

"আমার নামটা তো বেশ ভালোই উচ্চারণ করেছ!"

"হ্যা তোমাকে তো জানি।"

"ও বুঝেছি। তুমি মির্চা ইউক্লিড নামে কোনো লেখককে চেন? বলতে পার সে কোথায় ?"

"না তো। ও নামে কাউকে চিনি না।" তারপর একটু থেমে বলল, "ও হ্যাঁ সে মরে গেছে।"

অনেক সময় মৃত মানুষ জীবিতের চেয়ে সুখ দেয় কিন্তু আমার বুকের ভিতরটা ধ্বক ধ্বক করছে। মরেই গেল! একেবারে শেষ ? মরার পর তো আর কিছু থাকে না, আমার তো একবার জিজ্ঞাসা করা হল না, আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কেন করল? আমি যে ভেবেছিলাম একদিন না একদিন তাকে আমি ধরবই।

যখনই আমি ওর কথা ভাবি আমার পার্থিব মনটা, যে মনে বুদ্ধিবৃত্তি কাজ করছে, যে মন সংসারে সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলা করছে, সেই সজাগ স্বার্থপীড়িত মন বলে, বিশ্বাসঘাতকতা নয় তো কি? ঢিলটি পড়লে সারমেয়

যেমন দুই পায়ের মধ্যে লাঙ্গুল ঢুকিয়ে চলে যায় তেমনি বাবার একটি ধমক খেয়েই যে পালিয়েছে তার মনুষ্যত্ব আছে? ধিক্ তার বিদ্যাচর্চায়, পুঁথির উপর আমার শ্রদ্ধা নেই, মানুষ পুঁথির চেয়ে বড়। তারপরে আর একটু নিচে যে মন আছে সে বলে, রাগ করছ কেন, হয়ত তোমায় চিঠি লিখেছে তুমি পাও নি, আর হয়ত তোমার চিঠিও তার হাতে পৌঁছয় নি। আর তারও নিচে গভীরে গুহায়িত আর একটা মন আছে যাকে যুক্তি স্পর্শ করে না—সে বলে ঘটনা দিয়েই কি সবকিছু বোঝা যায়, তর্ক করে কি সত্যকে পাওয়া যায়, তুমি নির্বিচারে এই হৃদয়রাজ্যে কান পেতে শোনো সত্যের প্রতিধ্বনি বাজছে—সে কখনো ছলনা করে নি। ভেরা আমার দিকে তাকিয়ে আছে—

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি করে মরে গেল? ওর তো মরবার বয়স হয় নি।"

ভেরা বলল, "না ঠিক মরে নি, অর্থাৎ আমাদের কাছে মরে গেছে, ফ্যাশিস্ট হয়ে গেছে।"

ফ্যাশিস্ট হয়ে গেছে! হাসি পাচ্ছে আমার, ওকে দেখতে পাচ্ছি হিটলারের মতো গোঁফ রেখেছে। গ্যাস চেম্বারের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। খুব মানিয়েছে চিঠির উত্তর না দিয়ে দিয়ে ঐখানেই তো বার বার পাঠাচ্ছে আমায়। ফ্যাশিস্ট বৈকি!

ওর নাম আর শুনি নি অনেক দিন! উনিশ শ' আটান্ন সালে কলকাতার বাইরে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে কাজ করছি। আমি একটা বই লিখবার জন্য পড়াশুনো করছি। আমি ভালো একটা কাজ পেয়েছি, আনন্দে 'আছি। কাজ না থাকলেই আমার মন ভেঙে যায়—কোথা থেকে যেন আকাশজোড়া হাহাকার নেমে আসে। তাই যা কাজ হাতের কাছে পাই হাত লাগাই। লেখার কাজ তো সর্বোৎকৃষ্ট। মাইল দুই দূরে আমার মা ও ভাই থাকেন, আমি সেখানে আছি কিছুদিনের জন্য।

একদিন আমি নিবিষ্ট মনে লিখছি, সত্যেনবাবু ঘরে ঢুকে একটা তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বসলেন। প্যারিসে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল সে কথা হল, তারপর হঠাৎ বললেন, "ইউক্লিডের লেখা বইটা আমি পড়েছি।" আমি চুপ করে আছি। ওর নামটা শুনলেই আমার যা হয় তা যারা কাঠিফড়িং দেখেছে তারা বুঝতে পারবে। পোকাটা বেশ ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, হঠাৎ একটু যদি ছোঁয়া লাগে বা পাতাটা নড়ে যায় অর্থাৎ ও যেখানে আছে সেখানে যদি সামান্য স্পন্দন হয় তাহলে ওর হাত পা তৎক্ষণাৎ শক্ত হয়ে একটা শুকনো ডাল হয়ে ঠক্ করে পড়ে যাবে। আমার অবস্থা তাই হয়। ওর প্রসঙ্গ উঠলেই আমার রক্তমাংসের শরীর বদলে সহসা ঠিক সেই রকম হয়ে যায়। আমি একখণ্ড কাষ্ঠপুত্তলী হয়ে গেলাম। সত্যেনবাবু বলতে লাগলেন, "বইটা পড়ে বুঝতে পারলাম, আপনি রবিঠাকুরকে ভালোবাসতেন।" আমি নিরুত্তরে শুনে যাচ্ছি, ওটা ছিল মন্তব্য, এবারে তিনি একটা প্রশ্ন করলেন, "তাহলে বাবার উপরে রাগ করেছিলেন কেন?" আমি বইটা ভাঁজ করে উঠে পড়লাম। এই ব্যক্তিকে আমি অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করতাম কিন্তু আজ আমি অবাক হয়ে গেছি—। "

"দেখুন সত্যেনবাবু, আপনি খুব পণ্ডিত ব্যক্তি, বোধ হয় সেই কারণেই মানুষকে অপ্রস্তুত করতে আনন্দ পান।"

আর একটুও সেখানে না দাঁড়িয়ে আমি বাড়ি ফিরলাম। সাইকেল-রিক্সতে দু'মাইল পথ ফিরছি, সন্ধ্যে হয়ে আসছে, ফিকে অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হচ্ছে, অতীত ভাববার চেষ্টা করছি, কিছু মনে আসছে না, মনে হয় সমস্ত অতীত জীবনের উপর সন্ধ্যা নেমে আসছে। আমি ভাবি পথের প্রান্তে তো পৌঁছে গেলাম আর কেন পিছন দিকে তাকান, এ সংসারের জন্য, ভাইবোনদের জন্য আমার সাধ্যমতো, বুদ্ধিমতো যা করার ছিল করেছি, এখন যে যা বলে বলুক— সামনের পথ প্রশস্ত হোক আমার, অনেক কাজ করব আমি, অন্যায়ের সঙ্গে, অবিচারের সঙ্গে লড়ব— কিন্তু কাজের সুযোগ কৈ? সর্বত্র বাধা, .এত কাজ আছে কিন্তু কর্মক্ষেত্র কণ্টকময়। তবু অতীতের অসম্পূর্ণতা যেন ক্ষুণ্ন না করে আমায়। বাড়ি ফিরে দেখি দরজার কাছে মা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। মাকে দেখেই আমার মাথার ভিতর রাগ দপ্ দপ্ করে উঠল, এই মহিলাটির জন্যই যত দুর্ভোগ। আমার জীবনটি নষ্ট করেছিলেন, কারণ 'উনি' কষ্ট পাবেন! 'উনি' যা চাইবেন তাই করতে হবে, খোকার হাতে মোয়া দিতে হবে। অন্য লোকের দুঃখ সুখ কিছুই না। তারপর তাও সামলাতে পারলেন না। দশ বছর ধরে একটু একটু করে ঘর ভাঙলো, ইনি আগুনে আঁচল চাপা দিয়ে ভাবছেন সব ঠিক হয়ে যাবে। নিজের জীবন নষ্ট করলেন, বাবারও, সকলেরই, অকর্মণ্য! সংসারে বুদ্ধি করে যারা চলতে পারে না, যারা প্র্যাকটিক্যাল নয়— তাদের ভালোত্ব শ্রদ্ধনীয় নয়— ।

এখন আবার ইনি গর্ব করেন আমার ভালো বিয়ে দিয়েছেন। কি ভালোই বিয়ে দিয়েছিলেন! যদি এই বিয়ের ভালো পরিণাম হয়ে থাকে তবে তার কৃতিত্ব আর যেই করুক মা দাবী করতে পারেন না। অথচ মা ক্রমাগত তাই করেন। সমস্ত জেনেশুনে কেবল স্বামীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য আমাকে একটি বয়সে চৌদ্দ বছরের বড় নির্বাক লোকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে নির্বাসনে পাঠিয়ে আমার সমস্ত সত্তার উপর পাথর চাপা দিয়েছিলেন এই ইনিই। আবার বলেন, 'আমার

জামাই মহাদেব যোগীপুরুষ, তোর কত জন্মের ভাগ্য এমন স্বামী পেয়েছিস— আবার ট্যাক্ ট্যাক্ কথা !' হতে পারে যোগীপুরুষ। হতে পারে কেন নিশ্চয়ই, অন্য লোককে যে সব গুণ সাধনা করে পেতে হয় তা ওঁর অমনি পাওয়া, কিন্তু আমি তো গীতার সাধক চাই নি, রক্তমাংসের একটা মানুষ চেয়েছিলাম, একটা মানুষ। ,

এই সব ভাবছি আর ভিতরটা টগবগ্ করছে। মা বলেন, "এত দেরী যে।" আমি রেগে উঠলাম। বেচারা কাঁদ কাঁদ হয়ে বলতে লাগলেন, "কথায় কথায় এত রাগিস কেন ? তোদের যত রাগ আমার উপর।"

রাত্রে শুয়ে আছি এক ঘরে আমরা, শীতকাল, কম্বল মুড়ি দিয়ে মশারির মধ্যে। রাত্রি অনেক হয়েছে, আমরা দুজনেই জেগে আছি। আমার কাছে বকুনি খেয়ে মার মনটা নিশ্চয় খারাপ হয়ে আছে। হঠাৎ মা বললেন, "রু কাঁদছিস নাকি?" আমি নিরুত্তর। মা মশারি তুলে বেরিয়ে এলেন, "রু কি হয়েছে মা, কাঁদছিস কেন, আমি কি এমন বললাম যে তুই কাঁদছিস?"

"সত্যেনবাবু আমায় অপমান করেছেন।"

"ও মা, সে কি, ভীমরতি নাকি, তোকে আবার কি অপমান করল বুড়ো?"

"না না, সে রকম নয়, আমাকে বললেন কি ইউক্লিডের বই পড়ে উনি বুঝতে পেরেছেন আমি রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসতাম।"

"শোন কথা একবার! যত পড়ে তত কি বোকা হয় এরা! এ খবর জানবার জন্য তাঁর ইউক্লিডের বই পড়বার দরকার হল।"

আমায় সান্ত্বনা দিলেন মা গায়ে হাত বুলিয়ে। উনি আরো কি বললেন জানো, "তাহলে বাবার উপর রাগ করেছিলেন কেন?" মা চমকে উঠলেন। "বলিস কি ? সত্যিই কি তাহলে বেশি পড়লে কেউ কেউ মূর্খ হয়ে যায়! তোর ঠাকুমা

তোর বাবাকে বলতেন 'পড়ুয়া পাঠা' এও দেখছি তাই। এ দুটো কি এক জিনিস হল? ভালোবাসামাত্রই কি এক? তুই কি কারুর সংসার নষ্ট করেছিস, কারুর সম্পত্তি দখল করেছিস পরিবারকে বঞ্চিত করে, কারু মাথা হেঁট করেছিস সংসারের কাছে? যে ভালোবাসা এ সংসারের বস্তু নয়, তা মানুষকে উন্নত ও পবিত্রই করে! তা যদি না হত তোমার নিজের সংসারে কি তুমি রানী হয়ে থাকতে পারতে! হায় ভগবান এদের কি কিছু বুদ্ধি নেই।"

মা আমার গায়ে হাত বুলাচ্ছেন, "যাক এসব বাজে কথায় তুই কাঁদিসই বা কেন, তুই নিজে তো জানিস কোনটা কি!"

"মা আমি সে জন্য কাঁদছি না—কবির সম্বন্ধে যে যাই বলুক আমার তাতে একটুও লজ্জা হয় না। তাঁর কথা বলে কি আমাকে কেউ অপমান করতে পারে? সে তো নিন্দা লজ্জার অতীত বস্তু। আমি তোমাকে শুধু বললাম।"

"তবে কাঁদছিস কেন?"

আমি তখন দীর্ঘ আঠাশ বছর পরে মার সামনে এই প্রথম ওর নাম উচ্চারণ করলাম। বালিশের থেকে মুখ তুলে উপরের দিকে চেয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম—'মির্চা, মির্চা, মির্চা'—তারপর আমি কাঁদতেই লাগলাম। মা স্তম্ভিত হয়ে গেছেন, "কি বললি, কি বললি?" সম্ভবত ওর ডাক নামটা মার মনে পড়তেই দেরী হল। এ বাড়িতে সবাই ওকে ইউক্লিড বলেই উল্লেখ করত। মা আমার পিঠের উপর হাত রেখেছেন, "রু, তোর সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে নাকি? এতবার যে বিদেশে গেলি, দেখা হয় নিশ্চয়।"

"না, মা, না, সেই যে ও চলে গেল, তুমি আমায় বারান্দায় দাঁড় করিয়ে দিলে, তারপর আর ওকে আমি দেখি নি।"

"তাহলে চিঠি পত্র লিখিস নিশ্চয়ই, যোগাযোগ আছে, সত্যি কথা বল?"

"না, না, না। আমি চিঠি লিখেছিলাম, ও উত্তর দেয় নি।"

মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন, "সব তোর বাবার জন্য হল। ফ্রেঞ্চম্যান একটা বাড়ির মধ্যে এনে রাখবেন, তারপর আবার–"

আমার হাসি পাচ্ছে–মা কিছুতেই ফ্রেঞ্চম্যানের ধারণাটা ভুলতে পারছেন না। "কবে চিঠি লিখেছিলি রু?"

"উনিশ শ' তিপান্ন সালে, প্যারিসে।"

"তা উত্তরই বা দিল না কেন?"

"মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন–"এখন আর কিছুতেই দোষ নেই রু- -তবে চিঠি না লিখে হয়ত মঙ্গল হয়েছে। ফ্রেঞ্চ হলেও খুবই সুবুদ্ধি ছেলে। পাছে তোর সংসারের ক্ষতি হয় তাই হয়ত লেখে নি। ইস্ তোর বাবার জন্য শুধু শুধু এই কষ্টটা পেলি। আর...আর কে জানে কিসে কি হয়, ঐ ছেলেটাকে তাড়িয়ে দিলাম আর ঠিক তার পরের বছর থেকেই কি আমার সংসারটা ভাঙতে শুরু হল!"

"উত্তর দিলে ভালো হতো? তোমার তাতে আপত্তি নেই মা ? তাতে দোষ হত না"

এর সাত বছর পরে অর্থাৎ ১৯৬৫ সালে রোগে জীর্ণ ও মনে ভগ্ন হয়ে সম্পূর্ণ চূর্ণবিচূর্ণসত্তা মা মারা গেলেন।

ন হন্যতে ।। তৃতীয় পর্ব

আরো এগার বছর কেটে গেছে। ইয়োরোপে দু'বার ঘুরেছি, নানা দেশে। আর কখনো ওর নাম শুনি নি। ওর কথাও আর মনে পড়ে নি। এই এগার বছর আমি বিশেষ কতগুলি দায়িত্ব নিয়েছি। আমার সময় নিরন্ধ্র, আমার বয়স এখন বার্ধক্যের সীমায় পৌঁছেছে, শরীরও জীর্ণ হচ্ছে। ছেলেমেয়ে নাতিনাতনী নিয়ে আমার সুখের সংসার, কিন্তু এ ছাড়াও আর একটা বড় সংসার তৈরী হয়েছে বন্ধুবান্ধব সহকর্মীদের নিয়ে। তাদের সকলের কাছে আমার একটা ভাবমূর্তিও আমি খাড়া করতে সমর্থ হয়েছি। সেটা আমার যতদূর বিশ্বাস এই রকম—আমি খুব কড়া মানুষ, বিশেষত অসামাজিক প্রেম সম্বন্ধে আমি নির্দয় মনোভাব পোষণ করি। কাজেই বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে সেরকম কোনো ঘটনা ঘটলে আমার কাছ থেকে সযত্নে গোপন করা হয়। ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে আমার মনোভাব অনমনীয়, সমবেদনাশূন্য। একটু এদিক ওদিক হলেই আমি কড়া কড়া কথা বলি। আর অতিরিক্ত প্র্যাকটিক্যাল। আমার নিজের কাছেও নিজের একটা ভাবমূর্তি তৈরী করেছি নিশ্চয়—সেটা হচ্ছে, আমি অন্যায়ের সঙ্গে আপস করি না। কোনো বিষয়ে অসংযম, মদ্যপান থেকে অন্যান্য সব কিছুই আমার দুচক্ষের বিষ। প্রত্যেক মানুষের সমাজের প্রতি দায়িত্ব আছে, ব্যক্তিগত অসংযম বা সাহিত্যের খাতিরে সে দায়িত্বচ্যুত হওয়া যায় না। যদি কেউ হয় আমি তার নিন্দা করি। অর্থাৎ ছোটখাট একটি নেত্রীর যা যা দোষগুণ সবই আমার মধ্যে দেখা যাচ্ছে। আমার পরোপকারস্পৃহাটা কেউ কউ 'নেই কাজ খৈ ভাজে'র দলে ফেললেও প্রশংসা ও সাহায্যও যথেষ্ট পেয়েছি। মোটের উপর ছোট এবং বড় দুই সংসারের বৃত্তই আমার সম্পূর্ণ হয়েছে। আমার অপূর্ণতা কিছু নেই।

এমন সময় উনিশ শ' একাত্তর সালে আমি আবার ওর নাম শুনলাম। একটি বসবার ঘরে সহকর্মী ও বন্ধুদের হালকা আলোচনার পরিবেশে পার্বতী হঠাৎ বললেন, "অমুক শহরে অমৃতাদির একজন অ্যাড্‌মায়ারার আছেন।"

সবাই উৎসাহিত, "তাই নাকি, তাই নাকি।" আমি বিস্মিত নই। এই দীর্ঘ জীবনে নিন্দা এবং প্রশংসা দুইই যথেষ্ট পেয়েছি। কাজেই অ্যাড্‌মায়ার করেন এরকম কেউ থাকা তো অসম্ভব নয়। "নামটি কি তাঁর ?"

"মির্চা ইউক্লিড—"

ভিতরে ভিতরে চমকে উঠেছি। মনে মনে ভাবছি এই মেয়েটা আমাকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে বলেই জানি। এখন কি রকম অপমান করছে দেখ! আমাকে যতদূর সম্ভব নির্বিকার থাকতে হবে। শ্রীমতী পার্বতী বলেই চলেছেন, বছর দুই আগে 'জ'-র সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। সেদিন তিনি ক্লান্ত ছিলেন, অসুস্থও। একজন বাঙালীকে দেখে কলকাতার কথা বলতে লাগলেন— এখন কলকাতার সবাই নিন্দা করে কিন্তু তিনি যে কলকাতা দেখেছিলেন তার তূল্য শহর আর কোথাও দেখেন নি। বিশেষত সেখানকার মেয়েরা যাদের মাধুর্যের তুলনা নেই অথচ যারা সম্ভ্রম রক্ষা করে চলতে জানে, তাদের মুখে সর্বদা রবীন্দ্রনাথের কবিতা ইত্যাদি, শুনতে শুনতে চতুর 'জ'র মনে হয়েছে এটা গৌরবে বহুবচন এবং কোনো স্থানের কথা নয় কোনো ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে। তখন সে জিজ্ঞাসা করল, 'মহাশয়, কলকাতার কথা বলতে আপনি কি কোনো স্থানের কথা বলছেন, না কোনো মানুষের কথা ?'

অধ্যাপক বললেন, 'চল, ওধারে একটু বসা যাক।' একটি নির্জন কোণে বসে তিনি 'জ'-কে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কি অমৃতাকে চেন? সে কেমন?' তারপর তিনি একটা বই ওকে দিয়েছেন তার উপর বাংলায় লেখা আছে—'তোমার কি মনে আছে অমৃতা, যদি থাকে তাহলে কি ক্ষমা করতে পার ?

তা 'জ' তো ওদের ভাষা জানে না, ও বই পড়বে কি করে, তাই বইটা আনে নি। আর একজন মন্তব্য করলে—তা আনতেই পারত, আমরা একটু দেখতাম। ঘরে অনেক লোক, সবাই মিলে খুব হাসাহাসি হচ্ছে। হা ভগবান, মানুষকে নির্যাতন করতে সবাই আনন্দ পায়—শত্রু মিত্র নেই! যাদের বন্ধু

ভাবতাম তাদের নিষ্ঠুরতা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি! আমার মাথা ঘুরছে—দীর্ঘ চল্লিশ বছর পরে এই আমি প্রথম একজনের কথা শুনলাম যে ওকে দেখেছে, যার সঙ্গে সে আমার কথা বলেছে। আমি শুনতে পাচ্ছি ঘরে কেউ একজন বলছে—"অমৃতাদি আপনি একটা চিঠি লিখুন না তাঁকে। ঠিকানাটা আনিয়ে দেব 'জ'র কাছ থেকে। লিখুন লিখুন খুব মজা হবে।"

আমার মনে হচ্ছে আমার আঁচলে আগুন ধরে গেল, এখনি সারা গায়ে আগুন ছড়িয়ে পড়বে। এখান থেকে পালাই আমি।

কথাটা কিন্তু মনের ভিতরে ঘুরতে লাগল—এবার একটা ঠিক ঠিকানা পাওয়া গেছে, লিখিই না কেন একটা চিঠি। আমায় তো ভুলে যায় নি তাহলে। একটু যোগাযোগ করলে দোষ কি ? আমরা দুজনেই বৃদ্ধ মানুষ। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, কেমন আছ ? তবে ক্ষতি কি ?

এই সময়ে আমাদের অনেক কাজ। বাংলাদেশের যুদ্ধ চলছে—সারা পশ্চিমবঙ্গ উত্তাল, সকলেই কর্মব্যস্ত, আমরাও। এর মধ্যে এই হালকা কথা কোথায় ভেসে গেল কে জানে। মানুষের চূড়ান্ত দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে শৌখীন সুখদুঃখগুলি কি অর্থহীন বোধ হয়! হাজারে হাজারে, লক্ষে লক্ষে গৃহহীন, অন্নহীন, বস্ত্রহীন মানুষ ছুটে আসছে আশ্রয়ের সন্ধানে, তাদের যন্ত্রণার উত্তাপ আমাদের গায়ে লাগছে। সীমান্তে আমরা রোজ যাই, সেখানে কলেরা লেগেছে। আশ্রয়শিবিরের আশেপাশে মৃতদেহ পড়ে থাকে রোজই। একদিন একটি শিবিরের সামনে পথের উপরে আমার বয়সী একটি নারীর মৃত্যুশয্যা দেখলাম। গাছের তলায় ছিন্ন কাঁথার উপর পড়ে আছে—প্রায় স্পন্দনহীন দেহ। মাঝে মাঝে খিঁচুনি উঠছে। কর্মীরা ঐ পথের মাঝখানেই তাকে স্যালাইন দিচ্ছে—একটু পরেই সব শেষ হয়ে যাবে। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে—পশ্চিমের আকাশে রঙীন রক্তরেখা—উদাসীন এই বিশ্বসৌন্দর্যের মাঝখানে একটা মানুষের জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে, দীপটা নিবে যাবে। কাল এসময় কোনো চিহ্ন থাকবে না, এ যে একদিন পৃথিবীতে এসেছিল, এর যে কেউ ছিল, এ যে কাউকে ভালোবেসেছিল, ভালোবাসা

পেয়েছিল, তার কি কোনো অর্থ আছে তাহলে? ঐ মৃত্যুপথযাত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে আমি যেন আমার নিজের মৃত্যুশয্যা দেখতে পেলাম। যত দূর মনে হয় আমি পথের মধ্যে শুয়ে থাকব না, পালঙ্কে আত্মীয়-স্বজনবেষ্টিত হয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করব। কিন্তু তার পরে? ঐ দেহও যা আমার দেহও তাই, কোনো চিহ্নই থাকবে না। শ্মশানবৈরাগ্য আমার মনকে অভিভূত করেছে। আমার চোখ জ্বালা করে জল আসছে—সবাই ভাবছে আমি করুণায় কাতর। রশিদ বললে, "মাসীমাকে এখান থেকে নিয়ে যা—আপনি বনগাঁয় চলে যান।"

এদিকে আমি কাঁদছি আমার নিজের মৃত্যুশোকে, এই তো ফুরিয়ে যাব। যা পেয়েছি, যা পাই নি সবই এক হয়ে যাবে—সোনা আর ধুলো এক। এই ক'দিনের জন্য পৃথিবীতে এসে মানুষ মানুষকে কত কষ্টই দিচ্ছে, সুখ কতটুকু দিতে পারে—যন্ত্রণা দেয় সীমাহীন। হঠাৎ যেন আমার মৃত্যুশয্যার পাশে ওকে দেখতে পেলাম। গাড়িতে ফিরতে ফিরতে সেই অদ্ভুত পরিবেশে আমাকে ওর চিন্তা পেয়ে বসল। এই তো ঠিকানা পাওয়া গেছে, লিখিই না একটা চিঠি, এতদিন হয়ে গেল এখন তো আর অন্য কিছু নয়, পুরানো বন্ধুকে একটা চিঠি লেখা যায় না? কিন্তু পার্বতীর কাছে ঠিকানা কি করে চাইব? সে কি ভাববে? যা খুশি ভাবুক, কি এসে যায়! মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে সব লজ্জাসঙ্কোচ আঁকড়ে ধরে এতদিন পড়ে আছি, সব অলীক বোধ হল। কেউ নিন্দা করলে বা মন্দ ভাবলেও আমি দুঃখিত হব না। পরদিন চিঠি লিখলাম, 'ভাই পার্বতী, তোমার কাছে অধ্যাপক ইউক্লিডের ঠিকানাটা থাকলে দিও।' ঠিকানা এল, সঙ্গে 'জ'র চিঠি। সে লিখেছে, 'ইনি অত্যন্ত ভালো লোক এবং ভারতেই ওঁর জীবন পড়ে আছে, কলকাতা ওঁর স্বপ্ন এবং এঁর বিদ্যার খ্যাতি ভুবনজোড়া।' বিদ্যার খ্যাতি শুনে আমার মনটা বিকল হয়ে গেল। নিছক পাণ্ডিত্যে আমার শ্রদ্ধা নেই—এই সব লোভেই তো...যাক গে সেসব কথা, পরে কি হয়েছে তা দিয়ে আমার দরকার কি, আমি যাকে চিনি তাকে চিঠি লিখি না কেন, একটা চিঠি লিখে দেখি উত্তর দেয় কি না। আমি লিখলাম—

মির্চা ইউক্লিড, তুমি 'জ'র কাছে আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছ শুনলাম— আমি জানতে চাই তুমিই সেই ব্যক্তি কিনা, যাকে আমি চল্লিশ বছর আগে চিনতাম—যদি তাই হও তাহলে চিঠির উত্তর দিও। ইতি—অমৃতা

চিঠির উত্তর এল না। আমি অপেক্ষা করলাম, সন্দেহ হল ঠিকমত পোস্ট হয়েছে কিনা—ঐ সঙ্গে লেখা বিদেশ থেকে অন্য চিঠির উত্তর এল, ও চিঠিটার উত্তর এল না। যাকগে। অনেক কাজ আছে। অনেক চিন্তা আছে। অনেক সমস্যা আছে, যা আমাকে ভাবতে হচ্ছে, এই একটা বাজে কথা ভেবে লাভ নেই।

এই উনিশ শ' একাত্তর সালেই আবার একবার ওর বইয়ের কথা শুনলাম। ইয়োরোপ থেকে সে সময়ে অনেকেই আসছেন বাংলাদেশের যুদ্ধ দেখতে, সমবেদনা জানাতে, সাহায্য করতে ও কৌতূহল মেটাতে। আমাদের প্রতিষ্ঠানের কাজও দেখছেন অনেকে। একটি বাঙালী দম্পতি ঘুরছেন আমাদের সঙ্গে, এঁরা ইয়োরোপে থাকেন। আমি এদের তেমন চিনি না, মেয়েটির নাম রিণা, অল্পবয়সী মেয়ে অনেক ভাষা জানে, ওদের ভাষাও জানে। মাঠের মধ্যে বসে আছি আমরা, সঙ্গীরা এদিক ওদিক—হঠাৎ রিণা আমায় বললে, "একটা বই পড়েছি তাতে আপনার নাম আছে, সে কি আপনারই নাম?" আমি চকিতে চারদিকে দেখে নিলাম—বাঁচা গেল কেউ নেই— কিন্তু রিণার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলাম না—সেও আর কথা বাড়াল না।

আমাদের কর্মস্রোত উত্তাল হয়েছে। বিবিধ বিচিত্র সমস্যার সামনে পড়েছি। প্রতিদিন নূতন নূতন লোকের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে। ঘর এবং বাহির এক হয়ে গেছে, ঘরেও প্রতিদিন শত লোকের যাতায়াত। 'কর্ম যখন বিপুল আকার, গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার' সেই কর্মের গর্জন আমরা শুনছি। এমন বাঁচার মত বাঁচা যেন আর কোনোদিনও হয় নি। এই কর্মবিমুখ আলস্যজড়িত দেশে

আমরা অনেকেই এমন কাজের মত কাজ পেয়েছি যাতে নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দিয়েও আশ মিটছে না, এখন তুচ্ছ ব্যক্তিগত কথা কতক্ষণ মনে থাকবে ?

এই সময় থেকে অর্থাৎ উনিশ শ' একাত্তরের শেষ দিক থেকে অকারণ আমার মনে কেবলই একটা আকাঙ্ক্ষা ফিরে আসে, ভাবি দূরে কোথাও যাব। কত লোককে যে বলেছি আমি বাইরে কোথাও যাব। কর্মসূত্রে বিদেশীদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হচ্ছে, তাদের বলি তোমার দেশে তো শীঘ্রই যাব। আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাই কেন এই আকাঙ্ক্ষা, এর কারণই বা কি আর এর এত জোরই বা আসছে কোথা থেকে। আমার অবস্থা সেই রকম, 'মোর ডানা নাই আছি এক ঠাঁই সে কথা যে যাই পাসরি।'

উনিশ শ' বাহাত্তর সালের আগস্ট মাসে সেরগেই সেবাস্টিয়ান কলকাতায় এসেছিল, এই কাহিনীর আরম্ভে যার কথা বলেছি। ১লা সেপ্টেম্বর সকালে যখন তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, মনে একটা কৌতূহল মাত্র, দেখি ওর কথা কি বলে—এইটুকু, কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলে আমি অবাক হয়ে গেছি। মির্চা সম্বন্ধে আমার সংশয় অনেক আছে—কিন্তু ও যে এমন ভয়ানক মিথ্যাবাদী তা তো আগে বুঝতে পারি নি।

"কি জঘন্য মিথ্যা—ছি ছি, এত নীচ তোমার বন্ধু আর তারই গুণগান করছ?"

"আমি তার শিষ্য, সে আমার গুরু, আমি তার চেয়ে অনেক ছোট।"

"ভালো গুরু তোমার, নিজে অপরাধ করে পালিয়ে গিয়ে আবার আমার উপর প্রতিশোধ নিয়েছে, আমায় কলঙ্কিত করেছে।"

সেরগেই বলছে, "তুমি তো জানো না সে কি কষ্ট পেয়েছে, যদি তুমি ওর লেখা পড়তে তবে বুঝতে ওর যন্ত্রণা। কল্পনায় সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি খুঁজেছে। বইটা ছুঁলে রক্ত পড়ে।"

“এ সমস্ত কোনো ব্যাখ্যাতেই তার দুষ্কীর্তির ক্ষমা হয় না, জীবনে যে আমাকে কিছুই দেয় নি, সে শুধু কলঙ্ক দিয়েছে! নাম করে কেউ লেখে সেরগেই? —সেটা তো libel হয়ে যায়!”

“ওটা তো গল্প—গল্পের জন্য কিছুটা তো বানাতে হয়—অবশ্য ঠিকই যে ভারত এখনও এসব বিষয়ে একই আছে!”

“নাম করে লিখল কেন, আমাকে অপমান করবার জন্য?”

সেরগেই দুঃখ পাচ্ছে—-”তুমি ওঁকে ভুল বুঝছ—ওঁর ভালোবাসাটা ভুলে গেলে? উনি এখনও তোমায় ভালোবাসেন, ওঁর অধিকাংশ লেখাতেই কোথাও না কোথাও তোমার ছোঁয়া আছে—উনি যে ভারতীয় হয়ে গেলেন সে কি তোমার জন্য নয়? তিনি কি তোমার নামের বন্ধন কাটাতে পারেন?”

“এতই যদি ভালোবাসত তবে চিঠির উত্তর দেয় না কেন?”

সেরগেই চমকে উঠেছে—”দেয় না? তুমি চিঠি লিখেছ—উত্তর পাও নি? ক'টা লিখেছ?”

“আমি তিনটে চিঠি লিখেছি। প্রতি কুড়ি বছর অন্তর একবার করে আমার অস্তিত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছি। উত্তর পাই নি।”

সেরগেই মাথা নীচু করে ভাবছে—”সে আত্মপীড়ন করে, he works against his heart—যা তাঁর ইচ্ছা করে তার বিপরীত কাজ করেন, এই তাঁর স্বভাব। নিশ্চয় ওঁর খুব ইচ্ছে হয়েছে তাই লেখেন নি।”

আমি চুপ করে আছি। আমার ওর চরিত্রের এই দিকটার কথা মনে পড়ছে—কি জানি ওর মনে কি আছে, রহস্যময় মানুষ— যে তার দেশের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়েছে সে আমার এই মিথ্যা পরিচয় দিল কেন—একদিকে অসহ্য রাগ হচ্ছে, অন্যদিকে মনে পড়ছে তার অস্তিত্ব, তার স্মৃতি। আমি বলছি, “সেরগেই তার সঙ্গে আর কোনোরকমে দেখা হয় না?”

"হবে না কেন? এই পৃথিবীতে তোমরা দুজনেই বেঁচে আছ—কোনো না কোনো দিন দেখা হবেই হবে।"

আমি ভাবছি হা ঈশ্বর ওকে যে আবার দেখতে ইচ্ছে করছে।

"আচ্ছা সেরগেই আমি যদি ওর সঙ্গে দেখা করতে যাই ও দেখা করবে?"

"নিশ্চয়, তোমার সঙ্গে দেখা করবে না, ওর মন তো এদেশেই পড়ে আছে।"

সেরগেইর সঙ্গে কথা বলছি আর এবার বুঝতে পারছি সূক্ষ্ম শরীর আমার স্থূল দেহ থেকে বেরিয়ে গেছে—আমি আর এখানে নেই—অর্থাৎ আমি আমাকে পরিষ্কার দ্বিধাবিভক্ত দেখতে পাচ্ছি।

আমি বাড়িতে ফিরে সেই উৎসবের দিনটি কোনো রকমে পার করে দিলাম, সে কথা আগেই বলেছি কিন্তু ক্ষণে ক্ষণেই আমি বর্তমান থেকে অতীতে প্রবেশ করছি। একটি একটি দিন আবার পার হচ্ছি, প্রত্যেকটি ঘটনা যেন বার ঘটছে। আমি এতক্ষণ লিখলাম তার প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়েছে আমার। এটা সহজে হয় নি। একই সময়ে দুই অবস্থায় বাস করার মানসিক যন্ত্রণাকে বাক্যে রূপ দেবার ভাষাই আমার নেই! একদিকে আমার বর্তমান জীবন তার পরিপূর্ণ দাবী নিয়ে উপস্থিত—অন্যদিকে আমার আর একটা অস্তিত্ব যেন এক ছায়ামূর্তিতে আমার সত্তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, আমার প্রত্যেক মুহূর্তকে স্পর্শ করছে। আমার মনটা যেন একটা তারের বাজনার মতো হয়ে গেছে একটু ছোঁয়া লাগলে ঝন ঝন করে বেজে উঠছে। ক্রমে ক্রমে এমন হচ্ছে যে পিছনটাই সামনে আসছে—আমি নিজেকে নিয়ে কি করব ভেবে পাচ্ছি না।

একেক দিন এমন অবস্থা হয় যে সকলের কাছে অপ্রস্তুত হয়ে যাই। ছেলে এসে একটা কিছু জিজ্ঞাসা করছে শুনতেই পেলাম না। একদিন আমার স্বামীর সঙ্গে একটা কর্মস্থলে যাচ্ছি, কুড়ি মাইল পথ গাড়িতে চলেছি—সচরাচর আমিই কথা বলি উনি উত্তর দেন, সেদিন উনি হয়ত দু'একটা কথা বলবার চেষ্টা করেছেন, উত্তর না পেয়ে চুপ করে গেছেন! যখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছেছি,

বুঝলাম আমি কোনো কথাই বলি নি—আমার স্বামীকে বললাম, “এতদিন তুমি চুপ করে থাকতে, এবার আমি চুপ করলাম।” কম্পিটিশনে হারিয়ে দিলে!”

তিনি বললেন, “তাই তো দেখছি,”

একেক দিন সকাল হচ্ছে আবার কখন রাত্রে পৌঁছে যাচ্ছি বুঝতেই পারি না। রাত্রিটা ভয়ঙ্কর, অতি ভয়ঙ্কর—ভয়ঙ্কর এই অগ্নিদাহ—আগুন জ্বলছে, ক্রোধের আগুন, একটা কিছু প্রতিকার আমায় করতেই হবে। আমি যখন জেনেছি তখন মুখ বুজে অন্যায়কে সহ্য করে নেব না। ওদের দেশে আমার এক বন্ধু থাকে তাকে আমি লিখেছি—চিঠিটা এই রকম—

'সুমিতা, তুমি নিশ্চয় ইউক্লিডের লেখা পড়েছ, এতদিন আমায় জানাও নি —সেরগেইর কাছে সব শুনলাম। ঐ ব্যক্তি আমার বাবার ছাত্র হয়ে আমাদের বাড়িতে ছিলেন, আমাদের কাছে উপকৃতও হয়েছিলেন, তারই শোধ নিয়েছেন— তুমি এর একটা প্রতিবাদ লিখবে। ভারতীয় নারীর মর্যাদা যাতে নষ্ট না হয় সেটা দেখা তোমারও কর্তব্য।'

এই চিঠিটা আমি লিখেছি কিন্তু আমি জানি অভিযোগটা বাহ্যিক, আমার মনের গভীরে যে পরিবর্তনটা চলেছে তার রূপ তার প্রকৃতি অন্য। সুমিতা লিখল...'আমি সেরগেইকে বার বার অনুরোধ করেছিলাম আপনার কাছে বইটির নাম উল্লেখ না করতে। তিনি অত্যন্ত fixed idea-র লোক তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারি নি এখনো, অর্থাৎ আপনার সঙ্গে দেখা হবার পরেও না যে, এ আলোচনা আপনার কাছে প্রীতিপদ হবে না। আপনার রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মধারায় জগতে নানারকম চরিত্র দেখা অভ্যাস আছে—নিজগুণে মার্জনা করে নেবেন। আপনি খুব বিচলিত অবস্থায় চিঠিটা লিখেছিলেন বুঝতে পারছি—স্বাভাবিক।... সেরগেই যাই বলুন এখানকার দু একজন সাহিত্যিক বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করেছি, তাঁরা আমার সঙ্গে একমত যে আপনার identity disclose করাটা অসঙ্গত হয়েছে। চল্লিশ বছর হয়ে গেছে, ও বই আর কারু মনে নেই। আপনার পরিবারের কারুর পক্ষেই ঐ বইয়ের বিষয়বস্তু জানার সম্ভাবনা নেই।'

সুমিতার চিঠিটা হাতে করে আমি ভাবছি এই মেয়ে আমায় সান্ত্বনা দিয়েছে— কারণ এ বই জীবন্ত—চল্লিশ বছর আগে লেখা হলেও এখনও জীবন্ত। সুমিতা

আরো লিখেছে, এখন নূতন করে এ বিষয়ে কিছু লিখতে গেলে কাদা ঘোলানো হবে। কোনটা কাদা এর মধ্যে? কাদা তো ছিল না সেই নির্মল বালিকাহৃদয়ে, কোনো কাদা ছিল না—কাদা যা তা ঐ ব্যক্তি তার কল্পনায় সৃষ্টি করেছে।

দিনের পর দিন রাতের পর রাত আমি ভাবছি কি করে আমি এই অসত্যের গ্লানি থেকে আমার নামকে মুক্ত করব। সত্যের দায় আমি বইতে প্রস্তুত কিন্তু মিথ্যার দায় কেন নেব? আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করছি— তাদের না বলে আর উপায় নেই। তারা চমৎকৃত হয়ে গেছে, আমার জীবনে এ ঘটনা অপ্রত্যাশিত। আমি ওদের বলছি, অদৃষ্টের পরিহাসটা দেখো, এতদিন ধরে যে সংসার আমি গড়ে তুলেছি আমার স্বামী সন্তান আত্মীয় পরিজন নিয়ে, যারা আমার জীবনের সঙ্গে এক হয়ে গেছে তারা তো কোথায় চলে যাবে, আমার এই সত্যকার জীবনটা ছায়া হয়ে মিলিয়ে যাবে। সমস্ত সামাজিক বন্ধন এমন কি রক্তসম্পর্কও তো মৃত্যুর সঙ্গে শেষ হয়ে যায়, শূন্যে মিলিয়ে যায়, কিন্তু ও যে বন্ধন সৃষ্টি করেছে তা অচ্ছেদ্য। কি হবে পার্বতী, যে আমার কেউ নয় কিছু নয়, দীর্ঘ জীবনের যাত্রাপথে দু দণ্ডের দেখা হয়েছিল যে-আগন্তুকের সঙ্গে, তার পরিচয়টাই সবচেয়ে সত্য হয়ে থাকবে। জীবনে যে কোথাও নেই, মরণে তার সঙ্গে বাঁধা পড়ে থাকব—'পরপুরুষের সনে বাঁধা পড়ে রবে নাম মৃত্যুর মিলনে।'

অল্পবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমি টের পেলাম এ জগৎটা কত বদলে গেছে। এরা সত্যকে দেখতে শিখেছে। আমি যে ভেবেছিলাম আমার এই অসামাজিক এবং অসময়ের মনোবিকারে এরা আমায় দূষিত বস্তুর মত পরিত্যাগ করবে তা তো হলোই না, এরা আমায় ধারণ করে রইল, আমার জীবনের সত্যের আলোকে এদের কাছে আমি প্রিয়তম হলাম। আমাদের সময় এমন হত না। আজকের এই পরিবর্তন ভালো না মন্দ, আগে সমাজ বেশি পরিচ্ছন্ন, নারী বেশি সতী, প্রেম আরো পবিত্র ছিল কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে— আমারও সন্দেহ ছিল, মনে হত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে কঠিন সংযমের নিবর্তনে নিয়মিত করা মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য, তা না হলে পশুত্বের

আক্রমণ থেকে তার উত্তরণ হবে না। একথার সবটা হয়ত ভুল নয়, কিন্তু প্রথা সংস্কার ও কঠিন নিয়মের নির্দেশেও যে মনুষ্যত্ব বিভ্রান্ত হতে পারে এদেশের সামাজিক জীবনে তার তো দৃষ্টান্তের অন্ত নেই, যে দেশে সতীত্বের প্রমাণ সহমরণে দিতে হয়েছে।

মানুষের সবচেয়ে বড় দিক তার সত্যানুসন্ধানী মন। তার অন্যান্য অনেক মনোবৃত্তি পশুরও আছে কিন্তু সত্যকে খুঁজছে কেবল মানুষই। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সত্যানুসন্ধান তাকে আজ দুশো বছর বিচিত্র পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, তার আলো কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের অরণ্যের মধ্যে পথের নিশানা দিচ্ছে। আজ আমার একটা চরম উপলব্ধির মুহূর্তে দেখছি সমাজের মধ্যেও এক অভাবনীয় পরিবর্তন। শাস্ত্রবাক্য, গুরুর বিধান, বহু পুরাতন ধারণা ও বিশ্বাসের আবর্জনা সরিয়ে এরা সত্যকে দেখতে চাইছে। এজন্য আমি বন্দনা করি এই যুগকে। এক অর্থে এ সত্য যুগ।

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, আমি জানি না কার কাছে এ বিপদে সাহায্য চাই—আর সেই দুর্ভেদ্য লোকটি বেশ চুপ করে কচ্ছপের ঢাকনায় হাত-পা গুটিয়ে বসে আছেন চিরটা কাল। তা থাক, কিন্তু কি করে ঠিক এই সময়ে অর্থাৎ তাঁর অন্তর্ধানের চল্লিশ বছর পরে এত যোগাযোগ হচ্ছে কে জানে—আমার এক নিকট আত্মীয় ওদের দেশে গেল। খবরটা শুনেই আমি ভয় পেয়েছি—ভয়টা অকারণ নয়, ওখানে গিয়েই সে শুনেছে এবং খুব রেগেছে, ‘কোনো ভদ্রলোক একাজ করে না দিদি, কোন্ জন্মে কি একটু ঘটনা ঘটেছিল তাই নিয়ে এরকম বই লেখা।'

আমি শুনছি আর বুঝছি এ বই মৃত নয়, চল্লিশ বছর জীবিত আছে—এই দীর্ঘায়ু গ্রন্থ ক্রমে আরো বলবীর্য লাভ করবে যখন পৃথিবী আরো ছোট হয়ে যাবে। হায় হায় কতদিন থেকে আমি শুনেছি, কেন আমি এতদিন একবারও খোঁজ করলাম না কি আছে ঐ বইতে। নিজের নাম খ্যাতি ও অখ্যাতি সম্বন্ধে

আমি যথেষ্ট সজাগ, কেউ যদি আমাকে বলে অমুক কাগজে আপনাদের সম্বন্ধে বা আপনার সম্বন্ধে এই খবর বেরিয়েছে বা অমুক মিটিঙে আপনি ছিলেন কাগজে ছবি দেখলাম তাহলে আমি তখনই সে কাগজ আনিয়ে দেখি । না দেখে আমার স্বস্তি হয় না। আর যদি কোনো মন্দ কথা দেখি তাহলে রেগে অস্থির হয়ে যাই, প্রতিবাদ লেখাবার জন্য লোকজন ডাকি। সেই আমি বার বার শুনে আসছি এই বইয়ের কথা, একবার আমার জানবার ইচ্ছাই হল না ওতে কি আছে? বাবা বেঁচে থাকতে জানলে এর বিহিত করতাম। বাবা তো জানতেনই, কিছুই করলেন না। বাবার তো ঐ, বই লিখেছে, ভালোই। বহুদিন পরে আমি বাবাকে উনিশ শ' ত্রিশ সালের মতো ভালোবাসছি। তাঁকে ডেকে বলছি, দেখ বাবা তোমার শিষ্যর কাণ্ড দেখ, যে একলব্যর মত দূরে থেকে তোমায় গুরু বলে সাধনা করে গেল, সে আমার কি অবস্থা করেছে দেখ—তখন তুমি চেয়েছিলে এর হাত থেকে আমায় বাঁচাতে, পারলে কি?

সেরগেই বলেছে, জীবনে আপনাকে কিছুই দিতে পারলেন না বলেই সাহিত্যের মধ্যে তিনি তাঁর অবিনাশী প্রেমকে অমর করতে চেয়েছেন। হায় ভগবান, মিথ্যা কি কখনো অমর হয়, মিথ্যা দিয়ে কি অমরত্ব সৃষ্টি হয়? আমি ভাবছি ঐ ব্যক্তি, যার স্মৃতি আমি মনের গভীরে গোপনে গচ্ছিত ধনের মতো রক্ষা করেছিলাম, যার নাম কেউ কোনোদিন আমার মুখে উচ্চারিত হতে শোনে নি, সেই আমাকে লোকের চোখের সামনে উলঙ্গ করে ফেলেছে। এবং যদিও আমার চিঠির উত্তর দেবার তার সাহস নেই, গত চল্লিশ বছর ধরে আমার মাংস বিক্রি করে টাকা করেছে। এই হচ্ছে পাশ্চাত্য দেশ! কিন্তু আমি কি করে তোমাদের বোঝাই যে এই ভয়টা ভাবনাটা মনের একটা স্তরের, এটাই আমার প্রকাশ্য মন নাড়াচাড়া করছে—আর গুহায়িত গহ্বরেষ্ঠ আর একটা ভাব আছে সেটা একেবারে অন্য।

দিনের পর দিন কাটছে, রাতের পর রাত আমি বিনিদ্র। আমার এত দিনের সংস্কার সম্ভ্রমবোধ সমস্ত যেন পুড়তে শুরু করেছে। একটা ভয়ের শিখা অন্তস্থল থেকে উঠে চারদিক দগ্ধ করতে করতে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। আমি একটু একটু করে গলে যাচ্ছি, মোমবাতির মতো গলছি, আমার দেহমন জুড়ে আলো ছড়িয়ে পড়ছে আর বিন্দু বিন্দু করে গলে যাচ্ছে, পুড়ে যাচ্ছে, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আমার অহং, আমার দর্প, সাধুতার গর্ব, আমার সম্মানস্পৃহা—এতদিন যা কিছু মূল্যবান বলে ভেবেছি সবই ঐ শিখার মুখে জ্বলছে-এই অনির্বচনীয় অবস্থা শুধু গানেই বলা যায়—'সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে'। আমি বুঝতে পারছি যুগযুগান্তরের সংস্কার দিয়ে গড়া আমার এই অহংটা সত্যিই একটা মোমবাতির মতো ছিল, শক্ত ঋজু অনমনীয়, আজ ভয়ের ঐ তীব্র শিখাটা তাকে একটু একটু করে গলিয়ে ফেলেছে—কিন্তু ওটা কি ভয়ের শিখা? পাছে আমার অখ্যাতি হয় সেই ভয়? আমি কি লোকনিন্দার ভয়ে ক;াতর? গভীর রাত্রে ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি—আমি বুঝতে পারছি তা নয়; তা নয়, ভয়ের পিছনে যে নিশ্চল দাঁড়িয়েছিল সেই ভয়কেও গলিয়ে দিচ্ছে, সে প্রেম, অবিনাশী প্রেম, ও তারই জ্যোতির্ময় শিখা, সে আমার ভয়কেও গলিয়ে ধ্বংস করে দিয়ে দীপ্যমান হয়ে রইল। মাসের পর মাস আমি জ্বলতে লাগলাম, সব পুড়ছে আমার, এমন কি বয়সও। আমি যেন একেবারে উনিশ শ' ত্রিশ সালে ফিরে গেছি। তেমনি প্রত্যক্ষ, তেমনি সত্য হয়ে উঠেছে আমার অনুভূতি। প্রেমের আলো আমার অন্তরের গভীরে প্রবিষ্ট হচ্ছে, তার সমস্ত কোণায় কোণায় অন্ধকার গলিতে গলিতে আলো জ্বলে উঠেছে, আর ভয়ের গর্বের সংস্কারের অন্ধকার দূরে হয়ে যাচ্ছে। যা কিছু ভান করেছি, নিজেকে বড় করতে চেষ্টা করেছি, যা কিছু নিয়ে আমার অহংকার, সব মিলিয়ে যাচ্ছে, ক্ষয়ে যাচ্ছে, সত্যের পূর্ণ মূর্তি দেখতে পাচ্ছি আমি। আমার জীবন এক নূতন অর্থে অর্থবান হচ্ছে। আম;ার ওকে মনে পড়ছে, ওর অর্ধবিস্মৃত মুখ, ওর কথা, ওর অনেক দুর্বোধ্য ব্যবহার,

ওর রাগ, ঈর্ষা, সর্বোপরি ওর প্রেম। ক্রমে ক্রমে আমি যেন এক অন্য স্তরে চলে গেলাম, এ এক অন্য অস্তিত্ব, যেখান থেকে এ জগতের ভালোমন্দ সত্যমিথ্যা কল্পনা ও ঘটনা এই বর্হিজগতের সমস্তই এক হয়ে যায়। আমার মন বলছে এ সবে কি এসে যায়, নিন্দা প্রশংসা সবই সমান, তার চেয়ে সত্য কিছু আছে। আমি ভাবছি কেন সে এমন করে এই মৃত্যুহীন প্রেমকে বিফল করল? চলে যেতে হয়েছিল তাতে কি? শরীরে কাছে পাওয়াই কি একমাত্র পাওয়া? যদি দশ বছরেও আমরা একটা চিঠি আদানপ্রদান করতে পারতাম— তাহলে? তাহলেই যথেষ্ট হত, যথেষ্ট। সেই একটা চিঠি দিয়েই আমরা পার হয়ে যেতাম আমাদের মধ্যের মহাদেশের ব্যবধান, বিচ্ছেদের অতলান্ত মহাসাগর। সেই একটা চিঠি দিয়েই আমরা অর্ধনারীশ্বর হয়ে যেতাম, আমাদের যুগ্মসত্তা একটি মিলিত বৃত্তে পেত সম্পূর্ণতা। কিন্তু ওরা কি এসব বোঝে? বোঝে না, -বোঝে না, ওদের দেশে প্রেমকে পূর্ণ করবার জন্য এক বিছানায় শুতেই হবে ! হা ঈশ্বর !

কিন্তু ও তো জানত জানতই ঠিক, আমি আমাকে একটা দরজার মাঝখানে ছবির মতো ওর বক্ষলগ্ন দেখতে পাচ্ছি, ও বলছে, “তোমার শরীরকে নয় অমৃতা তোমার শরীরের ভিতরে তোমার আত্মাকেই আমি ধরতে চেয়েছি—”একথা সত্য, সত্য, শরীরের স্থায়িত্ব নেই, আত্মা অমর—'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'। কোথায় সেই শরীর আমার? সেই যৌবননিকুঞ্জ শুকিয়ে গেছে—জীর্ণ বৃদ্ধ এই মাথায় বরফ পড়েছে, মুখে বলিরেখা— অথচ আমি তো এই জীবনের পরম অনুভূতিকে তেমনি অক্ষয় দেখতে পাচ্ছি। একে কেউ ধ্বংস করতে পারে নি, না আমার পিতা, না ও নিজে, না কাল, না আমার অহংকার, না আমার জীবনের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা। অমরত্বের অনুভব হচ্ছে আমার--

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।

যে কথা কোনো দিন কোনো শাস্ত্র পড়ে বুঝতে পারতাম না, পারি নি, সে কথা এত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—মরে না, মরে না, প্রেম মরে না, ভবানীপুরের বাড়ির দরজার কাছে ওর দুই হাতে বিধৃত আমার আত্মা এখনও স্থির আছে, এই তো অসীম সীমার মধ্যে তরঙ্গিত, এই তো আমি দূরে এবং নিকটে, এখানে অথচ এখানে নয়!

আমি অবিশ্বাসী। আমি নাস্তিক। কোনো কুসংস্কারে আমার আস্থা নেই—কিন্তু আমার শরীর মনে যা ঘটছে আমার অবিশ্বাসের ভিত টলিয়ে দিচ্ছে—কেউ আমাকে বলুক আমি কি? আমার সেই ষোল বছরের সত্তার দেহহীন অস্তিত্ব কোথায় বাস করছিল এতদিন? আমি সুমিতাকে লিখলাম, তোমাদের আর প্রতিবাদ লিখতে হবে না। আমার কাছে এখন এ সব ক্ষুদ্র সত্যমিথ্যা এক হয়ে গেছে! আমি আর কিছু চাই না, কিছুই নয়, শুধু একবার ওকে দেখতে চাই। এতদিন রেখেঢেকে লিখছিলাম, এখন জানাচ্ছি এই প্রেম পরম সত্য, এর কাছে আমার আজকের বাস্তব জীবন ছায়া হয়ে গিয়েছে—ওর যা খুশি লিখুক, সম্মানই হোক আর অসম্মানই হোক জীবনে এইটুকুই তো স্বীকৃতি দিয়েছে আমায় —ওর দেওয়া অপবাদও আমি মাথা পেতে নিচ্ছি।

তুচ্ছ ভয়টা আমার কেটে গিয়েছে কিন্তু আমি অবসাদে ভুগছি। সমস্ত জীবনটা যেন আমার হাত থেকে খসে পড়ে গেল—আমি শূন্য হাতে বসে আছি। আমি সেরগেইকে লিখলাম—'আমার মনে হয় সময়ের সমুদ্রতীরে এমবারকেশন কার্ড হাতে নিয়ে বসে আছি কিন্তু জাহাজ আসছে না। কতদিন আমি অপেক্ষা করব ভাই, ওকে না দেখে আমি মরতে পারব না।'

সুমিতার চিঠি পেলাম, ও লিখছে—

'আপনার চিঠি পেয়ে কয়েকদিন এত অভিভূত ছিলাম যে কি লিখব ভেবে পাই নি। সেরগেইয়ের সঙ্গে কথা হল, সেদিন বললাম, truth is stranger than fiction ! লেখক যখন ঐ উপন্যাসটি লিখেছেন,

তখন কি জানতেন ভবিষ্যতের সত্য বর্তমানের কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যাবে। ঐ বইটির বিরুদ্ধে যত অভিযোগ ছিল তুলে নিচ্ছি। সত্যি কথা বলতে কি উপন্যাসের শেষ অংশ ট্র্যাজিক কিন্তু আজকের ট্র্যাজিডি তার চেয়ে বড়। মানুষের জীবনশিল্পীর হাত আমাদের হাতের চেয়ে অনেক পাকা।...

সুমিতা আরও লিখেছে, 'অনধিকারচর্চা যদি ক্ষমা করেন তো একটা কথা বলতে চাই—আপনি লিখেছেন এই অনুভূতি এত প্রবল যে আপনার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত ভেসে যাচ্ছেন, কিন্তু আপনার অন্তরের মধ্যে বসে যিনি সত্যকে স্বীকার করার নির্দেশ দিচ্ছেন তিনি কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নন?'

বিনিদ্র রাত্রে আমি সেরগেইর সঙ্গে কথা বলি—সত্যিই সেরগেই তুমি কোথা থেকে পাতাল ফুঁড়ে উঠে আমার জীবনটাকে ওলটপালট করে দিলে? যে ক্ষতর মুখটা চল্লিশ বছর ঢাকা ছিল, আমি শান্তিতে, সুখে ছিলাম, আজ তার ঢাকনা খুলে গেল। এখন রক্তক্ষরণ বন্ধই হয় না, রক্তে ভিজে যাচ্ছে আমার বিছানা-বালিশ, আমার বিনিদ্র রাত্রির আকাশ রক্তে লাল হয়ে গেল—

চোখ চেয়ে দেখি আমার স্বামী বিছানায় বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন—তাঁর চোখে জল—"তোমার কি হয়েছে আমায় বলবে না?"

এঁকে বলতে হবে, অনেকদিন থেকে আমার বন্ধুরা বলছে, ওঁকে বলুন। আমার বন্ধুরা সকলেই আমার স্বামীকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। তারা বরাবর বলছে, উনি খুব সহানুভূতির সঙ্গেই চেষ্টা করবেন আপনার সন্তাপ দূর করতে। কিন্তু আমি ইতস্তত করছি। আমি ভাবছি ওকে কষ্ট দেওয়া হবে। আমার কি অধিকার আছে এঁকে কষ্ট দেবার। কষ্ট কি না হয়ে পারে? আমাদের আটত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনে যার অস্তিত্ব এঁকে এক মুহূর্তের জন্য স্পর্শ করে নি, যার নামটাও ওঁর জানা নেই—অদেখা অজানা সেই ব্যক্তি কি হঠাৎ কোনো গুহা থেকে বেরিয়ে আসবে, বোতলের মুখটি ফাঁক হতেই যেন একরাশ কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া আকাশবিলম্বী হয়ে দৈত্য হয়ে গেল? এ সংসারের সঙ্গে যার কোনো যোগ

নেই, যার কোনো চিহ্নই আমার চারপাশে কেউ দেখে নি, তেতাল্লিশ বছর আমি যাকে চোখে দেখি নি, বাল্যকালের সেই স্মৃতি কি আজ এত বাস্তব হয়ে ওঁর এতদিনের সংসারকে টলিয়ে দিচ্ছে? এটা কি উনি সহ্য করতে পারবেন? এই সব ভেবেই আমি বলি নি। গোপন করার জন্য নয়। কোনো কিছু গোপন করার মতো আমার মনের অবস্থা নয়। বাস্তব সংসার আমার কাছে মরীচিকার মতো হয়ে গেছে। . "আমি তোমাকে বলতে চাই, কিন্তু তোমার কষ্ট হবে।"

"তোমাকে কষ্ট পেতে দেখে, আরও কষ্ট হচ্ছে।"

তখন আমি আমার স্বামীকে সমস্ত বললাম—। উনি স্তম্ভিত হয়ে গেছেন, "এই আটত্রিশ বছর আমরা পাশাপাশি আছি আমি কিছু জানতে পারি নি? তুমি আমায় বল নি কেন গো, বল নি কেন? এত কষ্ট পাবার তো কোনো দরকার ছিল না।"

আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। এরকম পরীক্ষায় কি কেউ পড়েছে কখনো। ইনি আমার জন্য এত করেছেন, আমাকে এত ভালোবাসেন, আমার সুখই ওঁর সুখ আর আজ এই বৃদ্ধ বয়সে আমি কিনা এঁর মাথায় আকাশ ভেঙে ফেলতে উদ্যত। যে সব দিয়েছে, সে কি দেখবে সে কিছু পায় নি, তা নয়, তা কখনই নয়, আমি কাঁদছি "বিশ্বাস করো আমি তোমায় ঠকাই নি।"

"সে প্রশ্নই ওঠে না, সে কি তোমাকে বলতে হবে, আমার কোনো বঞ্চনা কোথাও নেই, কখনো এক মুহূর্তের জন্য মনে হয় নি যে এর চেয়ে বেশি কিছু হতে পারে।" উনি এখন অনেক কথা বলছেন, "আমি যা পেয়েছি তা অতুলনীয় অতুলনীয়, আমার কোনো ক্ষোভ নেই, শুধু দুঃখ এই তুমি এত কষ্ট পেলে। আর সেই ভদ্রলোক তাঁর জন্যই

"ওর কথা ছাড়, প্রবঞ্চক, উচিত শাস্তি হয়েছিল।"

"ছিঃ, ও রকম করে ভাবলে তুমি শান্তি পাবে? শত হলেও তুমি তোমার মা-বাবার কাছে ছিলে—আর বিদেশী একটি ছেলে, ঐ সামান্য বয়স, কয়েক

ঘণ্টার মধ্যে তাড়িয়ে দিলেন, সে বনেজঙ্গলে ঘুরতে লাগল, কি কষ্ট ! তোমার বাবাকে ক্ষমা করা যায় না সত্যি।” উনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, আমি অবাক হয়ে দেখছি উনি কোনো ক্ষয়ক্ষতি অনুভব করছেন না। ক্ষয়ক্ষতি ওঁর হয়েছে কি?

“বিশ্বাস কর গো আমি এতদিন কষ্ট পাই নি, কষ্ট পেলে কি তুমি টের পেতে না? এই তো পেলে।”

“তা ঠিক, কষ্ট পাও নি, আমি তো তোমায় কখনো কষ্ট পেতে দেখি নি।”
“কষ্ট যদি পেতাম, তাহলে তুমি কি সুখী হতে পারতে?”

“তা তো ঠিকই—তবে এই অর্ধশতাব্দী পরে তোমার কষ্ট হচ্ছে তার জন্য? কি আশ্চর্য কথা বলছ গো?”

“হ্যাঁ তাই, আমিও কম অবাক হই নি, একেক সময় আমার মনে হয় আমার মাথা খারাপ হয়ে যায় নি তো, এরকম কখনো হয়! আমার খুব অন্যায় হচ্ছে, তাই না? বল বল আমায়।” আমি কাঁদছি, কাঁদছি, অনেক দিন পরে স্বামীর সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে পেরে আমি যেন খোলা বাতাসে এসেছি—আমার কান্নাটা তাই মুক্তি।

“কি বলব তোমাকে ন্যায় কি অন্যায়, এমন ঘটনা কি আমি জীবনে দেখেছি, না শুনেছি, না জানি, আমি এর বিচার করবার কে? আমার দুঃখ শুধু এই যে, তোমার এত কষ্ট আমায় দেখতে হচ্ছে। কিন্তু জানো আমার মনে হয় তোমার ভালোই হবে, আমি বরাবর দেখে আসছি তোমার জীবনের ভিতরে একটা উদ্দেশ্য কাজ করছে।”

আমার স্বামীকে বলে আমি শান্তি পেলাম। কারণ ওঁর চেয়ে বড় সুহৃদ আমার আর কে আছে? আমার সকল অপরাধের ক্ষমা, সকল দুঃখের সান্ত্বনা ওর কাছে ছাড়া আর কোথায় পাব?

এই সময়ের কথা লেখা খুব কঠিন, কারণ লেখবার কোনো ঘটনা নেই– ব্যাকুলতা শুধু কবিতায় বা গানে প্রকাশ করা যায়, অন্য কোনো উপায়েই নয়। আমি আবার বহুদিন পর কবিতা লিখছি, গভীর রাত্রে যখন ঘুম হয় না আমি পাশের ঘরে বসে কবিতা লিখি। কোনো দিন তো ওর বিষয়ে কিছু লিখি নি। প্রথমে যা লিখেছিলাম ছিঁড়ে ফেলেছি, এখন লিখব, স্বীকৃতি দেব, স্বীকৃতি দিই নি বলেই এই দুর্ভোগ হচ্ছে আমার, আর কিছুই নয়। যার যা পাওনা চুকিয়ে দিতেই হবে।

সেরগেইর একটা চিঠি পেলাম – ওদের চিঠির পথ চেয়ে থাকি আমি, মনে হয় যেন ওরই খবর পাচ্ছি।

প্রিয় অমৃতা দেবী,

আপনি আমার উপর যে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন তাতে আমি এত অভিভূত হয়েছি যা প্রকাশ করবার সাধ্য আমার নেই। আমি শুধু ভাবছি এ বিশ্বাসের আমি যোগ্য কি না। আমি ভাগ্যের খেলা দেখছি। আমি অবাক হয়ে গেছি, যা হয়ে গেছে আর আমাদের সাক্ষাতের পরে যা হল তাই ভেবে। ভারতে আমার মহত্তম অভিজ্ঞতা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া। আমি যখন বালকমাত্র আমার ভাগ্যের সূত্রে বাঁধা হয়ে সেই সময়ের সঙ্গে এই সাক্ষাৎ যুক্ত আছে। ঐ সময়ে আমি দুটি বই পড়েছিলাম– 'অমৃতা' ও 'সাধনা' এই দুটি বইয়ের গভীর প্রভাব আমার উপর পড়েছিল—এবং ভারতীয় জগৎ আমাকে সারা জীবনের মতো মুগ্ধ করেছিল...আমি আপনাদের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হলাম—পড়তে লাগলাম, আমার বাকি জীবনটা ভালো বা মন্দ যা কিছু হয়ে উঠেছে তা এই জন্যই হয়েছে। অবশেষে আমি নিমন্ত্রিত হয়ে আপনার দেশে গেলাম—সেখানে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবার সৌভাগ্য হল। আপনার গভীর বেদনা দেখেই আমি বুঝলাম, আমরা কি, আত্মা কি। আমি এখন স্বীকার করছি যে যদিও আপনার চিঠি পেয়ে আমি অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছি তবু তখনও আপনাকে দেখা মাত্রই আমি বুঝেছিলাম, আপনার ভিতরের অবস্থাটা কি।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম এবং আপনাকে বলেছিলামও যে সময় ও বিস্মৃতি কেবল আমাদের চেতনার উপরের আচ্ছাদনটাই স্পর্শ করে কিন্তু আমাদের যথার্থ স্মৃতি এক পরমসদ্বস্তু (absolute) কাজেই আমরা এক ভাবে অবশ্যই অমর। আমার এই কথায় চিরকালই দৃঢ় বিশ্বাস কিন্তু মানুষ হিসাবে আমাদের প্রত্যেক জ্ঞেয় বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দরকার হয়। আপনি আমাকে অমরত্বর

অলঙ্ঘ্য ও বিপুল প্রমাণ দিয়েছেন। প্রমাণ পেলাম যে আমাদের চৈতন্য খুবই বাহ্যিকভাবে কালের দ্বারা আক্রান্ত হয়, ইচ্ছা করলে আমরা কালের প্রভাব কাটিয়ে কালজয়ী হতে পারি। বিস্মৃতিই মৃত্যু—এই বিস্মৃতিকে সরিয়ে রাখলেই অমরত্ব লাভ হতে পারে, আমরা 'অমৃতা' হতে পারি।

আপনার কষ্ট যতই প্রবল হোক আপনাকে বুঝতে হবে যে এ সংসারের সমস্ত কর্তব্য সুসম্পন্ন করে আপনি এখন ঈশ্বরের করুণার মধ্যে বাস করছেন (grace condition) এ অবস্থা দুঃখ সুখের অতীত অবস্থা। কেবল প্রেমই কালকে ও বিস্মৃতিকে জয় করতে পারে। মানুষের ধ্বংস হয়ে যায়, মানুষ কালের কাছে পরাজিত হয় যখন তার ভালোবাসার শক্তি, প্রেমের কালজয়ী শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। আপনার চিঠি পাওয়ার চেয়ে আনন্দ আমার আর কিছু নেই।...আমি সর্বদা আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু থাকব।

সেরগেইর চিঠিটা আমাকে ভাবাচ্ছে, সত্য কি, অমরত্ব কি? অমরত্বর আস্বাদ আমি পাচ্ছি কারণ যা মরে গিয়েছিল তার সঞ্জীবিত রূপ আমি মন দিয়ে ছুঁতে পারছি। ঐ যে অমল একগাদা কাগজ নিয়ে ঘরে ঢুকছে এটা কি বেশি সত্য, ঐ যে দেখতে পাচ্ছি লাইব্রেরী ঘরে ক্যাটালগের বইয়ের উপর ঝুঁকে আমরা ক্যাটালগ করছি তার চেয়ে? অতীত কি বর্তমানের চেয়ে মিথ্যা? সে কি কোথাও চলে গেছে, না কি এইখানে স্তব্ধ হয়ে আছে? মনের ঢাকনাটা খুলে গেছে—একে একে ছায়ামূর্তিরা উঠে এসে তাদের অস্তিত্ব বাস্তব করে তুলছে। এক এক সময় ভয় হয় আমার এই আবেগ যেন এক উষ্ণ তপ্ত প্রস্রবণ পৃথিবীর গহ্বর থেকে উঠে এসে চারিদিকের মাটিতে যা ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি যেন এক অজ্ঞাত গভীর থেকে এই দাহকারী প্রেম হঠাৎ উঠে এসে আমার চারিদিকের সযত্নরক্ষিত বাগানের উপর ছড়িয়ে পড়ছে। আমি ভয়ে ভয়ে আছি, হে ঈশ্বর এর ফুল পাতা শুকিয়ে যাবে না তো !

কখনো কখনো উনিশ শ' ত্রিশ সাল আর উনিশ শ' বাহাত্তর সাল এমন ভাবে মিশে যায় যে আমি বিপদে পড়ি— অনুভূতির এই প্রত্যক্ষতাকে আমি কিছুতেই ভাষা দিতে পারি না। কারণ এই ধরনের অভিজ্ঞতার জন্য হয়ত ভাষাই তৈরী হয় নি। এরকম তো সচরাচর ঘটে না, এক বছর আগেও আমাকে কেউ বললে আমার বিশ্বাস হত না। তবু আমি বলবার চেষ্টা করছি, যদি কোনো দিন এই জীবনোপন্যাস প্রকাশিত হয় তাহলে হয়ত মনোবিজ্ঞানীরা এর কারণ, উৎপত্তি সবই নির্ণয় করতে পারবেন।

রাত্রি গভীর হয়েছে, আমি শুনলাম ঢং-ঢং করে দুটো বাজল। আমি দেখতে পাচ্ছি শান্তি আমার পাশে শুয়ে আছে—নিচে পিয়ানো বাজছে, তো বাজছেই। বিছানায় এপাশ ওপাশ করছি আমি—"ভাই শান্তি, ঘুম আসছে না রে!"

"আমারও না। ইউক্লিডদা পিয়ানো বাজিয়েই চলেছে।" "দেখ তো কি অন্যায়।" আমি উঠে বসেছি বিছানায়—

"যাই ওকে বারণ করে আসি—"

শান্তি বলছে—"না না, এখন না কাল কোরো।"

আমি খাট থেকে নেমে পড়েছি, একটা অব্যক্ত আকর্ষণ আমাকে ওর দিকে টানছে—বাজনাটা যেন মন্ত্র, আমার সত্তা মন্ত্রাবিষ্ট হয়ে গেছে। আমি একবার এখনই ওর কাছে যাব, যাব, না যেয়ে উপায় নেই, ও ডাকছে, আমাকে ডাকছে, আমি দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। শান্তিও উঠে পড়েছে, "কি করছিস রু?"

"একটু বলে আসি বাজনাটা থামিয়ে দিক।"

"পাগল হয়েছিস নাকি, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখ দুটো বেজেছে, এত রাতে কখনো যায়?"

"যদি রাত আটটায় যাওয়া যায় তাহলে দুটোয় গেলে কি হয়?"

"তা যায় না। পুরুষ মানুষের ঘরে রাত্রে কখনো যায় না।"

"তুমি যে যাও?"

"আমি আবার কোথায় যাই, আচ্ছা মেয়ে তো।"

"সব ঘরে যাও, কাকার ঘরে, বাবার ঘরে""

"রাত দুটোয়? কখনো না, তাছাড়া আমরা তো আত্মীয়—।" আমার রাগ হচ্ছে, রীতিমত রাগ হচ্ছে, আমি ওর হাতটা সরিয়ে দিয়ে দরজার দিকে এগোচ্ছি—আমি যাবই। একটু গিয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বলে আসব, এখন বাজিও না। তাতে কি দোষ হবে? শান্তির আস্পর্ধা বেড়ে গেছে। ছড়ি ঘোরাচ্ছে আমার উপর। শান্তি দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছে, আমায় যেতে দেবে না।

"তোমার বাড় বেড়েছে, না? নিজেকে মনে করেছ কি?" আমি ওকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। শান্তিরও রাগ হয়েছে, ও বলছে "কি মনে করেছি নিজেকে? দেখবে কি মনে করেছি, ডাকব মামীমাকে?"

সাপের মাথায় মন্ত্র পড়ে গেছে, আমি বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদছি।

"ভাই শান্তি তুই তো জানিস আমাদের মধ্যে কি হয়েছে—এতে পাপ হচ্ছে না তো?"

শান্তি গালে হাত রেখে ভাবছে, "তা হচ্ছে বৈকি।"

"কার হচ্ছে? ওর না আমার ?".

শান্তি চিন্তান্বিত, "আমার তো মনে হয় দুজনেরই হচ্ছে।"

"কখনো না কিছুতেই না। আমার কেন পাপ হবে, আমি কত ওকে বারণ করি।"

"তাহলে ওর ঘরে যেও না আর।"

আমার মুখের অবস্থা দেখে শান্তি গলে গেছে—"পাপের ভাবনা ভাবছ কেন ভাই? তোমার যা ইচ্ছা কর, সকালবেলা যেও, আমি কখনও কাউকে বলব না।" এটা কিন্তু উনিশ শ' তিয়াত্তর সালের জানুয়ারী মাস, ঘড়িতে দুটো বাজছে ঢং ঢং। আমি বিছানায় উঠে বসেছি, আমার মনে হচ্ছে তাড়াতাড়ি

নিচে নেমে যাই, নৈলে শান্তি আমায় আটকাবে। আমি খাট থেকে নামতে যাচ্ছি—কে বললে, "কোথায় যাচ্ছ?"

"নিচে—"

"নিচে কোথায় যাবে, রাত্রি দুটো বাজে"—

"দুটোই বা কি আর আটটাই বা কি", পিছন থেকে শান্তি আমায় ধরেছে—আমি হাত ছাড়িয়ে নিতে গেলাম, আর তখনই বুঝতে পারলাম এটা তিয়াত্তর সাল আর আমাকে ধরে আছেন আমার স্বামী, শান্তি নয়। আমি কাঁপছি, ভয়ে কাঁপছি, একি বিপদ হল আমার—সময়হারা হয়ে গেলাম---আমি আমার স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলাম, "বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও—তুমি ছাড়া আমাকে কে বাঁচাবে, আমার মহাপাপ হচ্ছে—তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি।" উনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছেন, "আমার কোনো কষ্ট নেই। শুধু একটি কষ্ট এই যে তোমাকে শান্তি দেবার কোনো উপায় এখন আমার হাতে নেই। তবে যেটুকু আছে আমি করব। তুমি নিশ্চয়ই যাবে, একবার গিয়ে তাঁকে দেখে আসবে।"

"কি হবে যদি সবাই জেনে ফেলে?"

"কি করে জানবে, জানবে কেন?"

"আমিই হয়তো বলে ফেলব, আমার কিছু মনে থাকছে না, কিছু না, কে আমাকে ডাকছে বল তো, কে ডাকছে? সে কি একজন আগন্তুক হতে পারে? আজ বেয়াল্লিশ বছর যাকে আমি দেখি নি সে তো stranger একজন। মির্চা নিমিত্ত মাত্র, অন্য কেউ আমার সমস্ত মনটাকে বদলে দিচ্ছেন, আগুন যেমন জলকে বদলে বাষ্প করে দেয় তেমনি সম্পূর্ণ পরিবর্তন অনুভব করছি। সে বলছে সত্যকে দেখ, সত্যকে দেখ, জানি আমার এ ভাবটা বেশি দিন থাকবে না। আমি সংসারে ফিরে আসব, আসতেই হবে, কিন্তু আজ এই মুহূর্তে তুমি বিশ্বাস করবে আমি কতখানি বদলে গেছি? আমি রমাকেও ক্ষমা করে দিয়েছি, ওর উপর একটুও রাগ নেই আমার। ওর অল্প বয়সের কথা

মনে পড়ছে, তখন ও খুব মিষ্টি মেয়ে ছিল, ও আমার মার সব কেড়ে নিয়েছে ঠিকই কিন্তু নিজেও কষ্ট পেয়েছে। শুধু বাইরের জিনিস পেল বলে ও ক্রমাগত অসঙ্গতভাবে পাগলের মত বাবার বইগুলোর মধ্যে নিজের নাম ঢোকাচ্ছে– যে ব্যক্তির আমাদের মত ছ'টা সন্তান চোখের সামনে দপ দপ করছে, যার প্রতিপ্রাণা স্ত্রী বর্তমান, তাঁর কতটুকু বেচারা পেয়েছিল বল তো? ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গিয়ে এসব ভাবি, জানো রমাকেও হয়ত এখন ভালোবাসতে পারি, বিশ্বাস করো, ওকে ভালোবাসছি আমি। রমাকে একদিন আমি বলেছিলাম, যাকে ভালোবাসা যায় তাকে কি কেউ নিন্দিত, অপমানিত করতে পারে? কিন্তু আজ আমার মনে হচ্ছে রমা তো নিমিত্তমাত্র– এ কার খেলা খেলছি আমরা? যা বাইরে থেকে ক্ষতি মনে হয়, অন্তরের দিক থেকে তাই হয়ত লাভ। —হেথায় যা মনে হয় শুধু বিফলতাময় অনিত্য চঞ্চল, সেথায় কি চুপে চুপে অপূর্ব নূতন রূপে হয় সে সফল?' বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বাবাকে বলেছিলেন, 'তোমার পতন হবে', পতনের বীজ বাবা সঙ্গে করেই এনেছিলেন, সে তাঁর আকাশস্পর্শী অহং—আমরা সর্বরকমে সেই অহংটাকেই রক্ষা করতে চেয়েছি—আমরা কত সময় ভেবেছি, বাবা কেন এ দেশের প্রেসিডেন্ট হলেন না, তাঁর কি ক্ষমতা কম ছিল? শুধু ওরই জন্য সর্বস্ব খুইয়ে ওরই আশ্রয়ে তাঁর নামহীন, যশহীন অবস্থায় প্রাণ গেল। কিন্তু আজ আমি ভাবছি প্রেসিডেন্ট হলেই কি চূড়ান্ত লাভ হত? হয়ত তার চেয়ে বড় লাভ হয়েছে—হয়ত যাবার আগে সম্পূর্ণ অহংশূন্য হয়ে, মাথা নিচু করে গিয়েছেন, বাইরের দিক থেকে সমস্ত হারিয়ে হয়ত অন্তরের দিক থেকে উন্নত হয়ে তাঁর সত্তার পূর্ণতা হয়েছে, তাঁর বিরাট প্রতিভার মধ্যে যে ত্রুটিটুকু ছিল হয়ত চোখের জলে তা ধুয়ে তিনি মহিমান্বিত হয়ে গেছেন। রমা এর নিমিত্ত হয়েছে, আমরা নয়। আজকে আমি বুঝতে পারছি এ জগৎটা আমরা যেমন দেখি এ তেমন নয়– বুঝতে পারছি 'ঢাকনা খোলার' অর্থাৎ 'অপাবৃণু' কথাটার অর্থটা কি–

সত্যের মুখটা যে দেখাচ্ছে আমাকে সে কে? সে কখনো আমার পূর্বপরিচিত অর্ধবিস্মৃত একজন মানুষ মাত্র হতে পারে না।”

আমি ওকে দেখছি, ওর সঙ্গে কথা বলছি, ওর সঙ্গে ঝগড়া করছি—আমার ঝগড়ার কারণ রিণা আমাকে বইটা শোনাচ্ছে। বইটাতে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা। আমাদের জগৎটা ও বুঝতেই পারে নি। আমি ওকে বলছি তুমি মনেও করো না মির্চা, যে তোমার বই পড়ে তোমার স্মৃতি জেগে উঠেছে বলেই পড়ছি তা একেবারেই নয়, আসলে স্মৃতি প্রাণ পেয়েছে বলেই তোমার লেখা পড়লাম। না হলে আগেও তো কতবার শুনেছি, কখনো ইচ্ছেও হয় নি পড়বার। এই বই পড়ে স্মৃতি তো জাগবে না, স্মৃতি বিভ্রান্ত হবে, কারণ বইটা সত্যের মুখোশ পরা কল্পনার বিকার। ও ধরেই নিয়েছিল আমার মা-বাবা ওর মতো একটি পাত্র ধরবার জন্য ফাঁদ পেতেছেন। আমিও সেই ফাঁদের একজন কারিগর, এরকম, একটা কথা প্রথমেই ধরে নিয়েছে বলে ও আমাকেও বুঝতে পারে নি। বুঝেও বুঝতে পারে নি আমার মন। আমি তো কোনো দিন বলিই নি ওকে আমার মনের কথা। তা তো বলাই হল না, সময় পাওয়া গেল না, তাই ও আমার মুখে এমন সব কথা ঢুকিয়েছে যা আমি বলতেই পারি না, যা আমার ভাষাই নয়। ওর অতৃপ্ত মন যা পায় নি, বইতে তারই আয়োজন করেছে। সাইকোলজিতে এর একটা নাম আছে, কি নাম তা জানি না, আমি ঐ বিদ্যাটার অনুরাগী নই—মানুষের অপার রহস্যময় মনের নাবিক হতে চাওয়া স্পর্ধা মাত্র। তবু আমি বুঝতে পারছি ওর মন, এ মন আমার বিপরীত, মিথ্যার দরজা দিয়ে কখনো সত্যের সামনে পৌঁছনো যায় না। মিথ্যার জঞ্জাল দিয়ে সত্যের মুখ ঢাকা থাকে, তাকেই তো অপাবৃত করতে হবে। সেইজন্যই এই কলম ধরেছি।

বই পড়ছি আর ওকে সমালোচনা করছি, আমি জানি বাবার উপর রাগ করবার ওর সঙ্গত কারণ আছে, কিন্তু যার এত নিন্দা করছে এই বইতে, যে

নিন্দা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়, তাঁকেই আবার গুরু বলে বই উৎসর্গ করছে, তাঁর শিষ্য বলে গৌরব করছে কি করে? এরকম মন আমি চিনি না, এ 'ইউটিলিটেরিয়ান' মন—কিংবা কি রকম আমি জানি না। এই সমস্ত আলোচনা আমি ছোট্ট ছোট্ট বিষাক্ত তীরের মত ছুঁড়ে মারছি—কি আশ্চর্য সে তীর শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে, লক্ষ্যে পৌঁছচ্ছে না, ওর প্রতি আমার ক্রোধ যেন ছোট ছোট ঢেলা, আমার এই হৃদয় তরঙ্গের উপর স্থির থাকছে না, এক মুহূর্তে গড়িয়ে পড়ে তা ফসকে যাচ্ছে, সরে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে।

এতকাল যার কথা কিছু জানতাম না চারদিক থেকে যেন একটা চক্রান্ত হয়েছে, আমি নানা লোকের কাছে থেকে বার বার ওর খবর পাচ্ছি। এমন একটা যোগাযোগের সৃষ্টি হয়েছে যে এই সময়টায় ভাগ্য আমাকে ওর কথা শোনাবে, জানাবে। 'স্মরণে' একটা কবিতা আছে, মৃত পত্নীকে উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'এ সংসারে একদিন নব বধূবেশে তুমি যে আমার পাশে দাঁড়াইলে এসে, রাখিলে আমার হাতে কম্পমান হাত, সে কি অদৃষ্টের খেলা সে কি অকস্মাৎ, শুধু এক মুহূর্তের নহে এ ঘটনা, অনাদিকালের এই আছিল মন্ত্রণা।'

আমরা নিজেরা কি কিছু করি ? না আমরা সূত্রবদ্ধ ক্রীড়নক? এতদিন যার চিহ্নমাত্র ছিল না, হঠাৎ সে কি করে এত বড় হয়ে দাঁড়াল, আর ঠিক এখনই কেন বার বার ওর খবর পাচ্ছি।

আমার বন্ধুর স্বামীর সঙ্গে ওর দু বছর আগে দেখা হয়েছে, আর আমি এখন সে কথা শুনলাম। তিনি বলেছেন, অধ্যাপক ইউক্লিড খুব চমৎকার মানুষ আর কলকাতার কথায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। কলকাতার অনেক রাস্তা ওঁর চেনা, আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, 'বকুলবাগান রোডটা' দেখেছি কিনা। চল্লিশ বছর আগে তিনি কলকাতায় ছিলেন কিন্তু তাঁর সব মনে আছে, কলকাতা তাঁর স্বপ্নের দেশ।

আমি ওর কথা আরও শুনেছি, ও এক কল্পনার জগতে বাস করে। ভারতই ওর ধ্যানের বস্তু। ওর লেখার মধ্যেও বাস্তব জগতের চেয়ে কল্পনার ও অলৌকিকের স্থান বেশি। ও নিজেকে ভারতীয় বলে।

আমি যত ওর খবর পাচ্ছি তত আরো উতলা হয়ে উঠছি। আমি ভালো করে বুঝতে পেরেছি ওর সঙ্গে একবার দেখা না হলে আমার এ যন্ত্রণা কিছুতে দূর হবে না। অথচ আমি এও ভাবি, আমি দেখব কাকে? সেই তেইশ বছরের ছেলেটি কোথায়! আর সে-ই বা দেখবে কাকে ? কোথায় সেই ষোড়শী কন্যা ! ও তো আমাকে দেখতে চায় না, কাজেই ও কাকে দেখবে তা নিয়ে আমি ভাবি না কিন্তু আমি যাকে দেখতে চাই, তাকে পাব কোথায়? আমি কি একজন তেইশ বছরের বালককে দেখতে চাই? বালক? নয়তো কি? আজকের আমার কাছে বালক, আমার নাতি হতে পারে। যদি আজ তেইশ বছরের মির্চাকে দেখতে পেতাম তাহলে নিশ্চয়ই তার সঙ্গে আমার সৌহার্দ্য হতে পারত না। অন্যদিকে আমি আজ যাকে দেখতে পারি সে মির্চা তো বৃদ্ধ, তাকে তো চিনিই না—সে তো একজন অপরিচিত, আগন্তুক, তাকে দেখে আমি কি করে শান্তি পাব? আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না আমার অতন্দ্র রাত্রির এই ব্যাকুলতা যা অহরহ কোনো অকারণ বেদনায় অনির্দেশ্য অভি্সারে বেরিয়ে পড়তে চায় সে কি কোনো অপরিচিত একটি ব্যক্তির জন্য হতে পারে? না এ আর কোনো অবস্থান থেকে আর কোন শক্তি আমায় ডাকছে, অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে? এমন কি কেউ থাকতে পারে, যিনি সব জ্ঞান, সব প্রেমের কারণ। সেখান থেকেই বার্তা আসছে? আমার চিরসংশয়ী মন এসব কথা মানতে চায় না, অথচ সন্দেহও ছাড়ে না।

আমার এই জীবনসায়াহ্নে প্রত্যুষের আলো এসে পড়েছে। সকাল সন্ধ্যা এক হয়ে গেছে, সময় যেন চিরস্থির।

মাঝে মাঝে সেরগেইর কথা আমার মনে হয়—এই কি অমরত্বের আস্বাদ? আমার সেই ছোটবেলার কবিতাটা আমি এতদিনে বুঝতে পারছি—কি মনে করে তখন লিখেছিলাম তা জানি না—'কালের যবে হারিয়ে যাবে মুহূর্ত নিমেষ—' সেই সর্ব অভিজ্ঞানশূন্য কালের স্পর্শহীন আলিঙ্গনে আমি বিধৃত, আমার অতীত ও বর্তমান এক হয়ে গেছে—এ তো অমরত্বই। তাই যদি হবে, তবে এত কষ্ট পাচ্ছি কেন? চোখের জলে দিশাহারা ? আমি বুঝতে পারি না সত্যই এটা কষ্ট না অমৃতের স্বাদ। যদি কষ্ট হয় তবে তো নিষ্কৃতি চাইব—আমি কি নিষ্কৃতি চাই? আমি কি ভাবতে পারি এই কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা শূন্যে মিলিয়ে যাক, আমি আবার আমার ঘর-সংসার বিষয় সম্পত্তি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকি? আমার বয়সে লোকেরা সকলেই তো তাই আছে। তারা কল্পনাও করতে পারে না, নাতি নাতনী পরিবৃত হয়ে, বাস্তব সংসারে বসে কেউ এমন একটা স্বপ্নের জগতে চলে যেতে পারে—দেহহীন, স্পর্শহীন শুধু একটা অস্তিত্বের সংবাদ তাঁর চারপাশের দেওয়ালগুলো তুলে নিয়ে যেতে পারে। সংসারের ঘর্ষণে মানুষের মনে কড়া পড়ে যায়—বৈষয়িক মন তখন হিসাব কষে, আমারও তো তাই ছিল—বাড়িঘরই তো করলুম এত দিন, কাণাকড়ির হিসাব করেছি, আর আজ ? এখন এই মুহূর্তে যদি কেউ বলে সব ছেড়ে শূন্য হাতে চলে এস তাকে দেখতে পাবে, আমি কি যাব না? আমায় যদি কেউ বলে থিয়েটার রোডে একটা চারতলা বাড়ি চাও, না ওকে একবার দেখতে চাও, আমি কি বলব তাতে কোনো সন্দেহ আছে? এই যে অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে, এতে আমি অসুখী নই, আমি কখনো চাই না এটা নষ্ট হয়ে যাক। আমার বয়সের কোনো মানুষের মন অনুভূতির এই তীব্রতা ফিরে আসা আমি সৌভাগ্য বলেই মনে করি।

কার, এ করুণা বুঝিনা বুঝিনা আর
কার হাতে আছে অফুরাণ ভাণ্ডার
জল নেমে যাওয়া ভাঁটার কাদার পরে

গান কে জাগায় জল কল্লোল স্বরে
কী সৌভাগ্য কী সৌভাগ্য হায়
কে পাঠায় ডাক অজ্ঞাত মোহানায়—

এই অজ্ঞাত মোহানার দিকে তাকিয়ে আমি আর কাউকেই নয় আমাকেই লাভ করছি—যাজ্ঞবল্ক্য যা বলেছেন, মানুষ অন্য কাউকে কিছু দিতে পারে না, নিজেকেই দেয়—আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ঃ ভবতি—পতির প্রতি প্রেম, পুত্রের প্রতি প্রেম সব আমাদের নিজের জন্যই, আমার আত্মাকেই তা পূর্ণ করছে। ওকে মনে পড়ে আমি আর কাকে কি দিলাম—এ জগতকে দেখবার একটি তৃতীয় নয়ন আমিই লাভ করলাম।

আমার আত্মীয়দের মধ্যে কারু কারু ধারণা যে, যে-স্মৃতি আমি এই চল্লিশ বছর ভুলে দিব্যি ঘরসংসার করেছি আজ এই বয়সে হঠাৎ তা মনে জাগিয়ে তুলবার কি হল—এবং কেনই বা আমি মনের জোর করে তা ভুলে যাচ্ছি না। এর কোনো উত্তর আমার জানা নেই। শুধু আমি অন্তরে বুঝতে পারছি কায়াহীন এই প্রেম আমার দেহে মনে এমন আশ্চর্য সঙ্গীত বাজাচ্ছে যা আমি এতদিন জানতাম না, যা পথে কুড়িয়ে পাবার বস্তু নয়। 'কৃষ্ণপ্রেম কি চাইলে মেলে, অনুরাগ না হলে হৃদ্‌কমলে—কৃষ্ণপ্রেম কি ন'কড়া ছ'কড়া, কুড়িয়ে নেবে যারা তারা ??

সেরগেইর কথা ঠিকই, এর মধ্যে অমরত্বের সংবাদ আছে, সুরের মধ্যে অশ্রুজলের আভাসে, প্রেমের মধ্যে চির অতৃপ্তি বসে থেকে যে অশেষের সংবাদ দেয় আমি তাই পাচ্ছি। আমি কোনো মতেই আর ভুলে যেতে চাই না। তাছাড়া আর অন্য যে যাই বলুক আমার স্বামী তো বলেন না। তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়, তিনি আমাকে বলেছেন সেদিন যে, সংসারে ঠিক একই ঘটনা দু জায়গায় ঘটে না, প্রত্যেকটি ব্যাপারকে আলাদা বিচার করতে হয়—"এটা তো সত্যিই যে তোমার জীবনের সব অংশের সঙ্গে আমার যোগ নেই, তুমি যখন কবিতা লেখ কি ভাব আমি জানি না, তোমার লেখার জগৎও আমার পরিচিত নয়, তোমার কর্মের জগৎও সবটা আমি জানি না, তেমনি এও তোমার একটা ভাব, এতে আমর ক্ষতি কি?" আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, যে উনি কোনো ক্ষয়ক্ষতি অনুভব করছেন না। যদি করতেন তাহলে আমার ভারি মুশকিল হত। আমি তো ওকে দেখতে যাবার কথা ভাবতেই পারতাম না। কারণ আমার স্বামীর মনে কষ্ট দিয়ে আমি কখনো কোনো মূল্যবান বস্তু পেতে পারি না, তাহলে যে ভালোবাসা লাঞ্ছিত হবে তার মতো আর পাপ নেই— সেই পাপের পসরা মাথায় নিয়ে আমি কি তীর্থযাত্রায় যেতে পারি?

ক্রমে ক্রমে এমন অবস্থা হচ্ছে যে আমার কাজকর্ম করাই মুশকিল হচ্ছে। বাইরের লোকজনের সঙ্গে নানা বিষয়ে আমি কথা বলব কি করে? দিল্লী চলেছি

কাজে, এখন সেখানে গিয়ে ডেপুটি-সেক্রেটারীর ঘরে বসে যদি আমার চোখে জল আসে তাহলে উপায় হবে কি? আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি স্বাভাবিক মন ফিরিয়ে আনতে। আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকি, আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে, ভৃত্যরা ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে যায়—আমার এ বয়সে চোখ দিয়ে জল পড়ার একমাত্র কারণ হতে পারে পুত্রবধূর সঙ্গে কলহ! আমার বয়সী শ্বশ্রুমাতাস্থানীয়া সমস্ত বঙ্গমহিলার সেটি একটি কর্তব্য, ভৃত্যকুল সে রকম তো কিছু দেখছে না। তাছাড়া কোনো দুঃখজনক ব্যাপার ঘটলে তার আলোচনা শোনা যায়। বাড়ির সকলকেই তা স্পর্শ করে, কিন্তু তাও নয়। সকলেই তো মানুষ, ওরাও আমার অস্বাভাবিক অবস্থা লক্ষ্য করছে এবং কিছু বুঝে উঠতে পারছে না—আমিও লজ্জা পাই কিন্তু আমার মন আমার বশে নেই, একেবারে নেই। যেতে যেতে সামনে দেখি একটা গাড়ি চলেছে, আমার মনে হয় নেমে যাই। ওর মধ্যে হয়ত সে আছে, আর কেউ বিদেশে যাচ্ছে শুনলে আমার মন হু হু করে ওঠে। এই অসহ্য বিরহভার আমার বৃদ্ধ শরীর বহন করতে পারবে না বলে আমার ভয় হয় – অসুস্থ হতে আমার ইচ্ছা নেই তাহলে ওর সঙ্গে আর দেখা হবে না। কিন্তু আশ্চর্য আমার শরীর ভালো হয়ে গেছে—এই ক'মাসই না আমার হার্টে কষ্ট হয়েছে, না ব্লাড প্রেসারের।

যারা আমাকে বলে একটু চেষ্টা করলেই তুমি এই স্মৃতির প্রকোপ থেকে উদ্ধার পেতে পার, তাদের সঙ্গে আমি মনে মনে তর্ক করি, প্রশ্নোত্তর করি। কারণ এ প্রশ্ন আমারও। তারা বলে তুমি যত ভাববে তত তোমায় এ-চিন্তা পেয়ে বসবে তুমি কষ্ট পাবে। অজ্ঞ জনের বিজ্ঞের মতো এ কথা সাধারণভাবে সত্য হলেও এ ক্ষেত্রে সত্য কি? চল্লিশ বছর যা আমাকে উদ্বিগ্ন করে নি, যখন আমার বয়স কম ছিল, যখন হয়ত কোনো সম্ভাবনাও ছিল, তখন যার স্মৃতি মনের উপর ছায়ার মতো ভেসে গেছে আমাকে তার বজ্রমুষ্টিতে ধরে নি, যেমন প্যারিসে যখন শুনলাম ও দুটো ব্লক ওদিকে থাকে তখন আমি পোপেস্কুর

সঙ্গে ওকে দেখতে যেতে পারতাম– তারপর ? তারপর কি হত কে জানে। আমার তখন বয়সই বা কত ছিল? যদিও আমি ভাবছিলাম আমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে এসেছি আমি তো বৃদ্ধা একজন—আমরা বাঙালী মেয়েরা ঐ রকমই ভাবতে অভ্যস্ত, কিন্তু আমার বয়স ছিল চল্লিশ মাত্র। এখন ষাটের ঘরে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারি যে ও বয়সটা বেশি নয়।

অথচ তখন তো এমন করে হৃদয় মন্থন হল না, এখন কেন হচ্ছে তবে এই বৈতরণীর ঘাটে দাঁড়িয়ে? বৈতরণীর ঘাট? এটা আমি বলছি, জানি বলেই বলছি, এটা কথার কথা, বয়সের অনুভূতি আমার হচ্ছে না, আমার বার্ধক্যের খোলস ঝরে পড়ে গেছে। এ কি কেউ ইচ্ছে করে করতে পারে? বা ইচ্ছে করেই বন্ধ করা যায়? মির্চা ইউক্লিড যেদিন আমার বাবার টেবিলের সামনে বসেছিল, বাবা বললেন, এই আমার ছাত্র, এখানে থাকবে, সে কি তিনি ঘটিয়েছিলেন? আর ১লা সেপ্টেম্বর যে সেরগেই সিবাস্টিয়ান এল তাকে কি আমি ডেকে এনেছিলাম?—‘অনাদিকালের এই আছিল মন্ত্রণা’—যেদিন পৃথিবী নেবুলা ছিল, তখনকার সঙ্গে কার্যকারণে যুক্ত এই ঘটনা! এই কথাই ডি প্রফাণ্ডিস কবিতায় আছে—‘Where all that was to be in all that was.'

কেউ কেউ বলে তুমি যদি একটু স্মৃতি রোমন্থন কর তাতে তো ক্ষতি নেই, কিন্তু যাবে কোথায়? দেখবে কাকে? আবার কেউ বা বলে দেখলে ভালোই হবে তোমার মন মোহমুক্ত হবে, সেই তরুণ যুবার প্রতি যে মোহ তা কেটে যাবে। আমার সংসারের মন, উপরের মনও তাই বলে, আমি ভাবি আমি দেখতে পাব অপরিচিত এক বৃদ্ধকে, অমনি আমার লজ্জা হবে, মনে হবে, এ কাকে দেখতে এলাম। কিন্তু আমার গভীরের মন বলে এ সে বস্তু নয়—যাকে তুমি দেখতে চাও সে চোখে দেখার নয়। তার বয়স হয় না। যেমন তোমার হয় নি। বয়স তো একটা আবরণ মাত্র, সেটা খুলে ফেলা যায়—কেউ সাধনা করে খোলে, কারু উপর করুণা হলে সে নিজের সত্তাকে পায়—কার করুণা? জানি

না তো। কিন্তু আত্মার স্বরূপ আমি বুঝতে পারছি। আমার কোনো সংশয় থাকছে না। যে জানে না তাকে এ অনুভূতি বোঝানো যাবে না। অন্ধকে যেমন আলোর অর্থ বোঝানো যায় না। তর্কের অতীত এই উপলব্ধির কথাই বলা হয়েছে যা বুদ্ধি দিয়ে বোঝা য;;য় না, শাস্ত্র পড়ে জানা যায় না। 'ন মেধয়া বহুধা ন শ্রুতেন'। আজ বুঝতে পারছি কালজয়ী এই প্রেমকে আর সংসার জয় করতে পারবে না, এ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে, আমাকে সংসারের আবর্ত থেকে বহন করে নিয়ে যাবে দূরে—যথা নদীনাং বহবাহম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখাদ্রবন্তী —নদীর বহুমুখী জলস্রোত যেমন সংসারের বিচিত্র আকর্ষণ পার হয়েও সমুদ্রাভিমুখী হয়।

ওকে একবার দেখে আসতে আমায় হবেই, কিন্তু যাওয়া তো সোজা নয়। অনেক ব্যবস্থা চাই—তাছাড়া আমি তো ওকে আগে জানাতে চাই না, কারণ তাহলে নিশ্চয় ও দেশ ছেড়ে চলে যাবে। আমি বুঝতে পেরেছি ও আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় না, বা পারবে না। কেন পারবে না তার সঠিক কারণ আমি বুঝতে পারছি না। আমার বিষয়ে অমন একখানি কাব্য লেখবার পরে অপরাধবোধ জন্মাতে পারে কি? না তা নয়--সে বুঝতেই পারে নি যে এটা অন্যায় হয়েছে, যেমন সেরগেইও পারে নি। ওদের দেশে ওসব কিছু নয়। এখন আমার কাছেও নয়, বাইরের আসঙ্গ জলের উপর হাওয়ার ঢেউ, আমি এত বোকা নয় যে ঠিক সেজন্যই উতলা হয়েছি। আমার ক্ষোভের কারণ ও সত্যের সঙ্গে ভেজাল মিশিয়েছে।

তবে ও আমাকে সারাজীবন এড়িয়ে গেল কেন? আমি 'জ'-কে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, "বলতে পার তুমি, আমি যদি যাই সে আমার সঙ্গে দেখা করবে?"

"নিশ্চয় করবেন। যিনি আপনার কথা আমায় অমন করে বলেছেন তিনি দেখা করবেন না, এ কথা আপনার মনে হল কেন?"

"চিঠির উত্তর দেয় না যে!"

"চিঠির উত্তর দেয় নি? সে কি ?"

"আচ্ছা, 'জ' হতে কি পারে বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না, হতে কি পারে সেজন্যই চিঠির উত্তর দেয় না?"

"তা হতে পারে বৈকি।"

"কি আশ্চর্য! এ কি একটা রাখবার মত প্রতিজ্ঞা ?"

"তা কেন, সত্যবাদী কি কেউ হয় না?"

যাবার কথা আমি ভাবি, দিনের বেলা আমি নানা চেষ্টা করি, সোজা তো নয় আজকাল বিদেশে যাওয়া। কিন্তু রাত্রে আমার ভয় করে। মনে হয় কোথায় যাব একলা? রাস্তার মাঝখানে যদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই, যদি স্ট্রোক হয়। পার্বতীর স্বামীও তাই বলেছেন, "সে ভদ্রলোকের যেরকম বর্ণনা শুনছি, তিনি যে কি রকম ব্যবহার করবেন তাও তো জানা নেই, তোমরা যে অমৃতাকে একলা ছেড়ে দিচ্ছ, অসুস্থ হলে কি হবে?" সবাই ভাবছে, আমিও। কেবল আমার স্বামী আমাকে আশ্বাস দিচ্ছেন, "কিছু হবে না, কোনো ভয় নেই, কেউ তোমাকে কষ্ট দেবে না অসুস্থ হবে না। সব ব্যবস্থা হবে তুমি নির্বিঘ্নে ঘুরে আসবে। আমার অসুখ সম্বন্ধে আমার স্বামী সর্বদা চিন্তিত কিন্তু এখন ওঁর চিন্তা নেই। আমি অবাক হয়ে গেছি, আমি যদি 'দশ পা' পিছাই উনি 'বিশ পা' এগিয়ে দেন। আর এটা এত অবলীলাক্রমে করছেন যে আমরা সকলেই বিস্মিত। "যাবে, তুমি যাবে, সেখানে গিয়ে তোমার এই fairy tale -টা শেষ করে আসবে।"

সেদিন Air India-র আপিসে বসে আছি, আমাদের সাহায্য করছেন যে ব্যক্তি তাঁর নাম পুরোহিত। এয়ার ইণ্ডিয়ার আপিসে বসে আমার ভয় করছে। এত অজ্ঞাত দেশে কি করে যাব? এর আগে যখন বিদেশে গিয়েছি হয় কোনো দলের সঙ্গে, নয় নিমন্ত্রিত হয়ে। বিদেশে তারাই আমার সব ভার নিয়েছে, তা

না হলে একলা কি যেতে পারি? নিমন্ত্রণের অপেক্ষা করছি, যদি নিমন্ত্রণ আসে তবেই যাওয়া হবে—নৈলে একা একা শুধু ওকে দেখতে যাওয়া অসম্ভব। আমি বললাম, "আজকে টিকিট করা থাক।"

ঠিক আসবে আমার স্বামী বললেন, "কেন? টিকিট করা হোক না, নিমন্ত্রণ আসবে, দেখো।"

"না, না, আজ থাক, আমার ভয় করছে।"

'তোমার ভয় করছে কেন, আমারই তো ভয় করবার কথা!"

'তোমার আবার ভয় করবে কেন?"

"করবে না?" উনি খুব হাসছেন, "তুমি পুরোহিতের সাহায্য নিচ্ছ।"

অনেক দিন পরে খুব হাসছি, মন হাল্কা হয়ে গেছে, স্বচ্ছ, উদার, শুভ্র হাস্যধারা এই নিরভিমান ব্যক্তিটি উৎসারিত করতে পারেন।

নিমন্ত্রণ আসবে কি আসবে না, এই নিয়ে সংশয়ে আছি। আমি যাদের সঙ্গে নানা রকম কাজে এদেশে যুক্ত আছি তারাই আমার নিমন্ত্রণ করবে। তবে যদি সম্মেলন হয় তবেই করবে, তা না হলে সামনের বছর আমায় নিয়ে যাবে ঠিকই। তারা তো জানে না আমার তাড়াটা কি। সম্মেলন কবে হবে কে জানে। সেরগেই আসার পর ছ'মাসের উপর হয়ে গেল, কম দিন নয়। এই ছয় মাস আমি কোনো রাত্রে এক ঘণ্টার বেশি ঘুমোই নি, কিন্তু তাতে আমার শরীর খারাপ হচ্ছে না, বা দিনেও ঘুম পাচ্ছে না।

সেদিন একজন অধ্যাপক দেখা করতে এসেছেন, তিনি একটা বড় কাজের ভার নিয়েছেন। নানা কথার মধ্যে হঠাৎ বললেন, "আমার এক জ্যোতিষী আছেন তাঁর কথাতেই আমি এই কাজের ভার নিয়েছি।"

আমি বিস্মিত, অনেক জ্যোতিষী দেখেছি আমি, ঠিকমত কাউকে কিছু বলতে শুনি নি, সবাই আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ে। আর তারপরই, স্বস্ত্যয়ন কর -যেন এখানে দুটো ফুল ফেলে বিশ্বের অমোঘ নিয়মকে বদলে দেবে।

আমি বললাম, "আপনি এসব বুজরুকিতে বিশ্বাস করেন?"

"বুজরুক অনেক আছে, সবাই নয়।"

"আমাকে একবার নিয়ে যাবেন?" হাসি পাচ্ছে 'আমার, মানুষ যখন দুর্বল হয়ে যায় তখন তার মেরুদণ্ডও বেঁকে যায়। আমার তাই হয়েছে। এখন অলৌকিকে নির্ভর করতে হচ্ছে! এসব ভাবছি, আরো ভাবছি দেখাই যাক না। ক্ষতি তো কিছু নেই। অধ্যাপকের সঙ্গে জ্যোতিষীর বাড়ি গেলাম। তিনি আমায় পৌঁছে দিয়ে চলে গেলেন। জ্যোতিষী নিবিষ্ট মনে আমার রাশিচক্র দেখছেন। আমি ভাবছি কার সাধ্য আছে, আমার কি হচ্ছে তা বলতে পারে? আমার বয়সই আমার বর্ম।

জ্যোতিষী বললেন, "আপনি কি জানতে চান ?"

"আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলুন—অতীত শুনতে চাই না—অবশ্য জীবনের আর বেশি বাকি নেই, তাই ভবিষ্যৎও নেই।"

"তা নয়, আপনি অনেক দিন বাঁচবেন। আর খুব শীঘ্র, আমি তারিখ বলছি, লিখে দিচ্ছি, ১১ই এপ্রিলের মধ্যে আপনি সমুদ্র পার হবেন—বিদেশ যাবেন।"

"কি করে যাব, আমার কাছে তো টাকা নেই?"

"চেষ্টা করুন, নিমন্ত্রণ আসবে, টাকা আসবে।"

"আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি, একে আমার পরিচয়টাও দিই নি, এত কথা বলে কি করে?

“তারপর? বিদেশে গিয়ে আমার লাভ কি হবে?” 1

“সেখানে গিয়ে একজনের সঙ্গে আপনার দেখা হবে, সারাজীবন আপনি যাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।”

আমি যথাশক্তি নির্বিকার থাকতে চেষ্টা করছি—গম্ভীরভাবে বললাম—”সে লোকটি কি রকম?”

“ম্লেচ্ছ।” চমকে উঠেছি আমি, সাবধানে কথা বলছি।

“ম্লেচ্ছর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিশেষত্বটা কি?”

ভদ্রলোক এবারে একটি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করলেন, “রোমান্টিক”।

“হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ”—আমি হাসছি—”জ্যোতিষীমশায়, আপনি কাকে কি বলছেন? আমার চুলের দিকে দেখুন, বরফ পড়েছে সেখানে।”

আমার হাস্যোচ্ছ্বাসে তিনি বিরক্ত, “আমি কারু চুল, দাঁত বা নখ দেখি না, আমি তার গ্রহনক্ষত্রের দিকে দেখি।”

এবার আর সন্দেহ নেই—অনাদিকালের এই আছিল মন্ত্রণা' তেতাল্লিশ বছর পরে মির্চা ইউক্লিডের সঙ্গে অমৃতার দেখা হবে। এ গভীর রহস্যের অর্থ বোঝার সাধ্য কি আমার, সামান্য আমার?

“জ্যোতিষীমশায়, আপনি তো এক ভয়ানক কথা বলছেন”, হালকা সুরে কথা বলছি আমি, “যদি এমন ঘটনা ঘটেই তাহলে অপমান হবে না আমার। নিন্দা হবে না?”

“না, না, নিন্দা হতে যাবে কেন?”

“কেন নয়? এ বয়সে রোমান্টিক দেখা হওয়া ভালো?”

‘কেন নয়? কেন নয় ?” ভদ্রলোক বিরক্ত, “অপমান হবে কেন ? মানহানি যোগই যে নেই।”

আমার নিমন্ত্রণ এল, টাকাও। একে একে সব জটিল গ্রন্থি খুলে যাচ্ছে, যাবার পথ সহজ হয়ে আসছে। কি আশ্চর্য—কে আমাকে হাত ধরে এই অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে? সাধারণ একটি বাঙালী ঘরের মধ্যবিত্ত সংসারের

মধ্যে বসে জীবন এত বদলে যেতে পারে? আমার বন্ধুরা বলছে এই জীবনোপন্যাসটা লিখতে। মির্চা যা লিখেছে সেই অসমাপ্ত কাহিনী সমাপ্ত করা উচিত। জীবনে যখন সমাপ্ত করতে চলেছি সেই উনিশ শত ত্রিশ সালের আরম্ভকে, সাহিত্যেই বা হবে না কেন? এই তো এসেছে সেই ‘last of life for which the first was made-'

জীবনী লেখার কথা হলেই আমি রবীন্দ্রনাথের কথাই ভাবি।

বার্ধক্যে বাল্যকালের কথা স্পষ্ট করে মনে পড়ে। তাঁকেও দেখতাম সর্বদা অল্পবয়সের গল্প করতেন। সেই থেকেই তো ‘ছেলেবেলা’ লেখার সূত্রপাত। আমি তখন অনেকবার তাঁকে বলেছি, আপনার জীবনটা লিখুন—এখন না হোক পরে প্রকাশিত হবে। বার বার বলছি অন্তর্‌জীবনটা লিখুন। তিনি বলতেন “অন্তর্জীবনই তো লিখছি—আর কি শুনতে চাও, আমার রোমাণ্টিক লাইফ? “আমি শুধু নয়। অনেকেই শুনতে চাইবে। আপনার এই দীর্ঘজীবনে কত মানুষ আপনাকে ভালোবেসেছে, বাসবে না কেন? ভালোবাসার যোগ্য আপনি, আপনি সামনে থাকলে তো আর ও বাড়ির পঞ্চাননকে ভালোবাসা যায় না। কিন্তু সেই ভালোবাসাকে আপনি যে ভাবে মর্যাদা দিয়ে, তাকে যথাস্থানে রেখে তার মাধুর্য বিকাশ করে, তার থেকে যতটুকু গ্রহণীয় তা নিয়ে তাকে সার্থক করেন এও একটা কবিতা এবং এ কবিতা আপনার রচনার চেয়ে কম সুন্দর নয়। কম আশ্চর্য নয়। এ যদি আপনি না লেখেন—এ তো হারিয়ে যাবে।” আমি তাঁকে আরো বলতুম—”এর পরে আপনার জীবনের বহু অর্থবহ ঘটনা যেমন তেমন লোক তাদের নিজের মনের মাপে বুঝবে—ইতরজনের জন্য ইতরভাবে লিখবে যার নাম রিসার্চ— আপনি মানুষটি কি তা যারা কিছুই জানে না, তারাই আপনার জীবন লিখবে— এবং লিখবে তাদের খাট কলমে, ছোট মনের ছোট ছোট ছায়া ফেলে। আপনার সবচেয়ে বড় কাব্যটি হারিয়ে যাবে।”

তিনি বলতেন, “যা যাবার তা যাবেই, আমার কতটুকু রাখতে পারবে তুমি? রাখতে পারবে এই শরীর? আমার এই হাতখানা কি রাখা সম্ভব হবে? যা যাবার তা চলে গিয়ে যা থাকবার তা রইল আমার গানে কবিতায়।”

তিনি আরো বলতেন,—যে পথ দিয়ে চলে এসেছি সে পথে আর ফেরা যায় না, সে বড় বেদনা।—আজ বুঝতে পারছি সে কথার অর্থ, যখন পিছনের দিকে তাকিয়ে আমার বর্তমান বেদনার ভারে দিশাহারা।

তবে একথাও ঠিক অতীতকে আমি ডাক দিয়ে আনি নি—সে দরজা ভেঙে আমার বর্তমানে প্রবেশ করে বর্তমানের সঙ্গে মিশে গেছে। যার কথা চল্লিশ বছর শুনি নি, এই ক'মাস ধরে ক্রমাগত শুনছি। আমি শুনেছি ওর স্ত্রী আছেন কিন্তু কোনো সন্তান নেই। ওরা দুটি প্রাণী এক বাড়িতে থাকে, ও দিনরাত্রি নিজের লাইব্রেরীতে বইয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। তার জীবনে বই পড়া ও লেখা ছাড়া আর কিছু নেই। কথাটা আমায় ভয় দেখাচ্ছে, তাহলে যে মানুষকে আমি দেখতে যাচ্ছি সে একটা পুরো মানুষই নয়। যার বুকের উপর, পায়ে নূপুর, চোখে কাজল, হাতে নাড়ু, বালগোপাল নৃত্য করে নি সে কি করে সম্পূর্ণতা পাবে? শুনছি তার স্ত্রী খুব পাহারাদার, কেউ কেউ বলছে, আমার কোনো চিঠি সে পায় নি। কিন্তু একথা আমার বিশ্বাস হয় না। আমার চিঠিতে এমন কিছু ছিল না যে সেজন্য সেটা দেওয়া হবে না। আমাকে সে ঈর্ষা করবেই বা কেন, আমি তো অতীতের একটা স্বপ্নমাত্র। সেই যে আঠারই সেপ্টেম্বর উনিশ শ' ত্রিশ সালের দুপুরবেলা মির্চা আমাদের বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল তারপর তার একটি চিঠি বা অস্তিত্বের কোনো চিহ্ন আমি পাই নি। সেই দুঃখেই তো আমার বুকের একটা পাশ জ্বলে গিয়েছে, ধিকি ধিকি জ্বলছে —অবিশ্বাসের বিষাক্ত ধোঁয়ায় আমার ভালোবাসার শ্বাস রুদ্ধ হয়েছে। আর আজ এতদিন পরে শুনলাম সে কারু কাছে বলেছে—"আমি তাকে একটা ছবি পাঠিয়েছিলাম স্বর্গদ্বার থেকে, আমি তো তাকে লিখতে পারতাম না, তাই খোকার মাধ্যমে পাঠাতাম—ঐ ছবিতে আমার মুখে দাড়ি দেখে সে খোকাকে বলেছিল, 'পাশ থেকে ছেঁটে ফেলে যেন'।"

আমি ভাবছি, তাই কি? এরকম ছবি কি আমি দেখেছি? কখন দেখলাম, কোথায় দাঁড়িয়েছিলাম ? আজকাল আমার কাছে উনিশ শ' ত্রিশ সালের ঘটনাগুলো ছবির মত ভেসে উঠছে, আমি দেখতে পাই বাবা যখন বলছেন, "একমুখ দাড়ি রেখেছে", তখন বাবা কোথায় দাঁড়িয়েছিলেন, আমি কোথায়

ছিলাম। কিন্তু খোকা যখন আমায় এ ছবি দেখাল, তখন আমিই বা কোথায় ছিলাম, সে-ই বা কোথায়! এ দৃশ্য তো মনে পড়ছে না। তাছাড়া আমি ওর ওরকম ছবি দেখলে শুধু বলব—দাড়িটা পাশ থেকে ছেঁটে ফেলে যেন, আর কিছু না, তাই কি হতে পারে? পারে না, পারে না, আমি নিশ্চয় কেঁদে কেঁদে বলব, "ও খোকা আমাকে একটু দেখা করিয়ে দাও ভাই।" এ সব তো কিছু মনে পড়ছে না। আমি ভাবছিই, ভাবছিই, ভাবতে ভাবতে মনে হচ্ছে ছবিটাই শুধু পাঠাল আমাকে, তাহলে চিঠিও কি পাঠিয়েছে? নিশ্চয় চিঠি লিখেছে, কারণ আমাকে ছবিটা দেখাতে লিখেছে—তাহলে সে চিঠি তো আমি দেখি নি।

আমি এখন জানি খোকা ওর কাছে মাঝে মাঝে টাকা চাইত এবং সেই টাকা আদায়ের জন্যই সে ওর কাছে আমার উপর নির্যাতনের অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী বলে ওকে বিপর্যস্ত করে ওর কাছ থেকে টাকা নিয়েছে। আমি স্থির করলাম খোকার কাছে যাব। এখন আর আমার লজ্জাই বা কি, সে তো কত যুগ আগের কথা।

একদিন সন্ধ্যাবেলা খোকার বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলাম। ওর দুরবস্থা কোনো দিন ঘুচল না, ঘুচবে কি করে, ওর বারটি সন্তান। সবাই বড় হয়েছে অবশ্য, তবু ওদের তিন পুরুষের অক্ষয় দারিদ্র্য। বাড়ির সামনে পৌঁছে দেখি বাড়িটা অন্ধকার। কলকাতার একটা বিশিষ্ট পাড়াতেই ওরা থাকে, অনেক দিন আছে, চারদিক আলো ঝলমল, শুধু এই বাড়িটাই অন্ধকার। কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর খোকা বেরিয়ে এল। বহু বছর পর ওকে দেখলাম। একেবারে বৃদ্ধ হয়ে গেছে, ওর কুৎসিত চেহারা আরো কুৎসিত হয়েছে। বিরাট থ্যাবড়া নাক ও মুখের পাশে লোলচর্ম ঝুলে এসেছে, ও বললে, "কে? কে?"

"আমি, আমাকে চিনতে পারছ না?"

অন্ধকারে কিছুক্ষণ ঠাহর করে বললে, "ও রু! অনেক দিন পরে তোমায় দেখলাম, কি ব্যাপার?"

"আলো নেই কেন?"

"সে তো বোঝা শক্ত নয়, বিল দিতে পারি নি বলে কেটে দিয়েছে।" তারপর, "ভিতরে আসবে? একটা মোমবাতি নিয়ে আসি"

মোমবাতি এনে খোকা আমায় দেখছে, "তুমি এখনও খুবই সুন্দর আছ রু। তোমার বয়সে এরকম ক'জন আছে? আজকালকার মেয়েদের যা ছিরি"

"তাই নাকি? খুব আনন্দ পেলাম শুনে, খোকা তোমার কাছে মির্চার যে চিঠিগুলো ছিল দাও তো!"

"মির্চার চিঠি! এতকাল পরে তাকে মনে পড়ল?"

"আমার জীবনী লিখব, তাতে ওর কথা তো লিখতেই হয় একটু, নয় কি?"

"যদি তোমার সাহস থাকে তাহলে নিশ্চয় লিখবে। আর জীবনীটা যদি শুধু সাধুতার বড়াই করবার জন্য লেখ তাহলে লিখবে না।"

"আমি ভেবেছি মির্চার কথা খুব ভালো করে লিখব।"

"খুব খুশি হলাম শুনে, সত্যি আনন্দ হচ্ছে, সবাই বলে তোমার খুব সাহস আছে। আমাদের ছেলেবেলাটা কি সুন্দর ছিল রু, কি মধুর সে দিনগুলো। আর কি চমৎকার ছেলেই ছিল মির্চা, খোকা স্মৃতি রোমন্থন করছে "অমন করে এক ঘণ্টার মধ্যে ওকে তাড়িয়ে দেওয়া, মামার কোনো বিচার ছিল না, একটা ক্ষ্যাপাটে ছোট্ট মেয়ের কথা শুনে এমন কেউ করে..." ও বকেই চলেছে।

"খোকা চিঠিগুলো দাও তো। আমার তো কিছু মনেই পড়ছে না। চিঠিগুলো পড়লে হয়ত অনেক কথা মনে পড়বে। ক'টা চিঠি বল তো?" আমি মনে মনে আন্দাজ করছি দশ মাসে ক'টা লিখতে পারে, মাসে দুটো লিখেছে হয়ত।

"তা অনেক, কিন্তু সে সব চিঠি তো আমি ছিঁড়ে ফেলেছি!"

"ছিঁড়ে ফেললে কেন?"

"সাবধান হবার জন্য, কে কখন দেখে ফেলে।"

"খোকা ওর দাড়িওলা ছবিটা কই, সেটা তো ছেঁড়বার দরকার ছিল না।"

"সেটা তো তোমায় দিয়েছি।"

“কখনো নয়। সে ছবি আমি দেখি নি। দেখলে ভুলতাম না।”

“ইঃ রে! একটা মানুষকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে দিব্যি সংসারধর্ম করে, এখন আবার বলা হচ্ছে ভুলতাম না।”

“খোকা দাও, ছবিটা দাও, চিঠি কিছু না কিছু আছে, দাও তো।”

“আচ্ছা, চল্লিশ বছর আগেকার চিঠি কি আমি পকেটে করে ঘুরছি ? খুঁজি, তুমি সাতদিন পরে এস।”

সাতদিন পরে গেলাম, রাগে আমার অন্তরটা জ্বলে যাচ্ছে—এত চিঠি লিখেছিল আর আমি কিছু জানি না— সে চিঠি তো আমাকেই লেখা নিশ্চয়, এই মূর্খ লোকটাকে এত চিঠি লিখবে কি কারণে!

বেশ কয়েকদিন ঘুরিয়ে তারপর খবর পাঠাল সে চিঠি পেয়েছে। সন্ধ্যাবেলা আবার গেলাম—খোকা উপর থেকে নেমে এল, স্থূল লোমশ শরীর, খালি গা, লুঙ্গি পরা। লুঙ্গির পাশে চিঠি ক'টা গোঁজা। ওর ঐ উলঙ্গ ঘর্মসিক্ত শরীরের সঙ্গে চিঠিগুলো লেগে আছে দেখে আমার গা শির শির করতে লাগল।

হাত বাড়িয়ে দিলাম—”দাও।”

“অনেক খুঁজে এই তিনটে চিঠি পেয়েছি। আরো খুঁজবো।”

চিঠিগুলো নিয়ে মোমবাতির আলোয় পড়তে শুরু করেছি, খোকা বলছে, “বাড়ি গিয়ে পড়ো রু—একটু গল্প করা যাক, ছোটবেলার গল্প ; জানো আমি তোমাদের দুজনের ছায়া কাঁচের কপাটে দেখেছিলাম। তারপর মির্চাকে বললাম, এস এই চেয়ারটায় বোসো, তারপর আমি গিয়ে দাঁড়ালাম, দেখেছ? ঐখানে তোমাদের ছায়া দেখেছি আমি। ও তো চমকে উঠল। খোকা বকেই চলেছে, আমি চিঠি পড়তে শুরু করেছি—অপূর্ব চিঠি—একটি ইউরোপীয় মন প্রাচীন ভারতের জাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় বিকশিত হচ্ছে আর প্রেমের দহনে দাহ্যমান, সেই সুন্দর মনের ছবি দেখতে পাচ্ছি। চিঠিগুলি জীর্ণ হয়ে এসেছে। বোঝা গেল এ চিঠির আগেও সে লিখেছে।

প্রিয় খোকা,

স্বর্গাশ্রম, ঋষিকেশ ১০ই নভেম্বর ১৯৩০

ব্রহ্মপুরী অরণ্যে অনেক দিন নির্জনে কাটিয়ে কাল রাত্রে আশ্রমে ফিরে তোমার চিঠি পেলাম। তোমার ও আমার মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হতেই পারে না। কিছু কিছু ঘটনা তুমি জানতে না তাই আমি খুলে লিখেছি। লোকে আমায় শ্রীচৈতন্য বলে বলুক, এই সস্তা রসিকতা আমায় স্পর্শ করে না। আমি সুখী হয়েছি যে আমার বন্ধু দু'জন তা বিশ্বাস করে না। আমার বৈরাগ্যের কথা যখন ভাববে তখন ইয়োরোপীয়দের মত ভেব না। ভারতীয় হও। তুমি আমার চেয়ে ভালো বুঝবে কেন যীশুকে মরুভূমিতে বিশ বৎসর সাধনা করতে হয়েছিল, তার বাণী পৃথিবীতে প্রচার করবার আগে। ভেবে দেখ, যিশু মাত্র আঠার মাস প্রচার করেছিলেন এবং এ পৃথিবীকে বদলে দিয়েছিলেন। আর আমি আমাদের সময়ের অনেক বুদ্ধিযুক্ত মস্তিষ্ক ও মনের কথা জানি যারা সারা জীবন প্রচার করলেও তাদের নিজের মনেরও পরিবর্তন করতে পারে না। আমি তাড়াতাড়ি সংসারে ফিরতে চাই না। রামকৃষ্ণের দরজার কাছে সারা বিশ্ব এসে গ‌ে‌েল যখন তিনি সিদ্ধ হলেন। আর স্বামী বিবেকানন্দ সারা পৃথিবী ঘুরলেন তবু কাউকেই দীক্ষিত করতে পারলেন না। অনেক বাগবিস্তারে লাভ নেই—'সাধনা' অর্থ দেশবিদেশে বক্তৃতা দিয়ে ঘোরা আর বই লেখা নয়। অথবা এ কালের অসংখ্য গাধার কানে মন্ত্র দেওয়াও নয়। অন্তত আমার কাছে সাধনার অর্থ অন্য কিছু ও অনেক বেশি কিছু।

আমার বাবা মা ও বোন আশা করে আছেন আমি বাড়ি ফিরব তাই আমি অনেক দিন তাঁদের কাছ থেকে কোনো চিঠি পাই নি। কারণ আমার অল্পদিনের জন্য দেশে যাওয়া সবই ঠিক হয়েছিল। আমার বই 'যে আলো নিবে গেছে' ১৮ই সেপ্টেম্বর আমার বন্ধুর কাছে পৌঁছেছে, অদ্ভুত ব্যাপার না?

এই চিঠি অমৃতাকে দেখিও—ইতি মির্চা।

চিঠিটা পড়ছি আর বুঝতে পারছি বাবার উপর রাগে ওর মন জ্বলে যাচ্ছে। তাঁর লেকচার দেওয়া দেশ বিদেশে, বিদ্যা অর্জন ও বিদ্যাদান কিছু ওর ভালো লাগছে না, কিন্তু মনে মনে তাঁকে অনেক বড় ভেবেছিল বলেই ঐ সব মহাপুরুষদের সঙ্গে তুলনা করেছে। বাবার এটাই দুর্ভাগ্য যে তাঁর প্রিয়জনদের কাছে তিনি দেবতা হতে চেয়েছিলেন—যদি তা না হয়ে একজন দোষগুণযুক্ত মানুষ হতেন তাঁরও দুর্ভোগ হত না—আমাদেরও না।

প্রিয় খোকা,
স্বর্গাশ্রম
২৫শে নভেম্বর ১৯৩০

আমি তোমার চিঠির অপেক্ষায় ছিলাম ও তাড়াতাড়ি পড়ছি। আমি বাড়িতে ঐ বিষয়ে কেন লিখছি না? আমার বোনকে লিখেছি খানিকটা। ওরা কেউই আমার বিষয়ে, আমার চিন্তাধারা সম্বন্ধে এত বেশি জানে না যে আমার চিঠি পেয়ে সবটা বুঝতে পারবে। ওরা জানে আমি একটি হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করব ঠিক করেছি এবং ভারতে আরও পাঁচ বছর থাকব। ওরা আমায় দোষ দেবে কারণ ওরা এইটুকুই জানে। কিন্তু আমার অন্তরের কথা আমি কাউকে বলি না...কখনই বলি না...যা হোক ওদের বলব, তবে এখনই নয়। আমি প্রত্যূষের অপেক্ষায় আছি, তোমার কি মনে হয় প্রভাত হতে অনেক দেরী হবে? দেখছ তো আমার সাহিত্যিক খ্যাতি কি কাজে লাগল? কাজেই আমি এখন সাহিত্য বা যশ ইত্যাদি গ্রাহ্যই করি না। আমি রাত্রি দিন উপনিষদ পড়ছি, আর বেদের অংশবিশেষ। আমি গুরুকুলে গিয়েছিলাম—আর্য সমাজের দ্বারা চালিত এই কলেজটি বিখ্যাত—এখানে বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক বিষয়ে বক্তৃতা করতে নিমন্ত্রিত হয়েছি, আমি রাজি হয়েছি কারণ গুরুকুলে সংস্কৃতে

কথা বলার সুযোগ পাব। এখানে ছাত্ররা পুরাতন ভারতের মহাভাবে উদ্বুদ্ধ—গাছের নীচে পবিত্রভাবে খোলা ব::াতাসে এরা বাস করে। এখন কেবল এই জীবনটাই আমি সহ্য করতে পারছি। তুমি জিজ্ঞাসা করেছ অল্পদিনের জন্যও দেশে যাচ্ছি না কেন? কারণ তাহলে ওরা আর আমায় আসতে দেবে না! ওরা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝবে ভারত আমায় কি শিখিয়েছে। ওরা ভয় পেয়ে যাবে আর আমায় ইয়োরোপে আটকে রাখবে। ইয়োরোপ এখন আমার স্বপ্নের মহাদেশ—ওখানে আমি মুক্ত ছিলাম, আমার বয়স কম ছিল, ওখানে থাকতে জীবন সম্বন্ধে উদাসীন ছিলাম এবং শান্তিতে সুখে ছিলাম। এখন এসব আমার কাছে স্বপ্ন। সিসিলির তীর আর রোমের ধ্বংসাবশেষ, ফ্লোরেন্সের ঘন নীল আকাশ আর সুইজারল্যাণ্ডের নির্জনতা, হয়ত এসব আমি আর কখনো দেখব না। আমাকে এখানে থেকে যুদ্ধ করতে হবে। এই ভারতে থেকে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করব আমি। ভারতই আমায় বন্ধন দিয়েছে, ভারতই মুক্তির পথ দেখাবে। আমি কাউকে ঠকাচ্ছি না, আমাকেও না, আমার দেশকেও না, কাজেই দেশে ফিরে গিয়ে আমার আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে বাজে কথা বলে কিংবা আমার যোগ বিষয়ে বিদ্যা সম্বন্ধে বড়াই করে লাভ কি—যখন সত্য হচ্ছে যন্ত্রণা, শুধু যন্ত্রণা। আমি চাই তুমি আর একটু সহানুভূতির সঙ্গে বোঝ। তুমি এখনও জান না আমার কি ভয়ানক সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে, তার গভীরতা কতদূর। আমি এখানেই থাকব। আমি পাগলের মত সংস্কৃত ও ভারতীয় দর্শন পড়ছি। একটা বাতি পেয়েছি, অনেক রাত অবধি পড়ি। এখানটা খুব ঠাণ্ডা, খুব নির্জন, কয়েকজন পণ্ডিত আছেন। অমৃতাকে আমার ওই ছবিটা দয়া করে দেখিও—সে জানে আমার কত কষ্ট যে তাকে আমার একটা ছবি পাঠাবারও অধিকার নেই। ভালোবাসা জেন—ইতি মির্চা।

প্রিয় খোকা,

স্বর্গাশ্রম ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩০

তোমার চিঠি পড়লাম। তোমাকে ক্ষমা করবার কথাই ওঠে না। তুমি ঠিকই করেছ, তোমার বন্ধুকে তোমার বিপদের কথা লিখেছ, আমারই ত্রুটি যে তোমাকে সাহায্য করতে পারছি না।...আমি পাগলের মত কাজ করছি। উপনিষদের তত্ত্ব নিয়ে আমার প্রবন্ধ শেষ করছি। উপনিষদের কথা এইটুকু বলতে পারি যে এই বই আমার এ জীবনের সান্ত্বনা, আমার মরণেও সান্ত্বনাস্থল হবে। আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি তখনই সাহিত্য লিখি—অবসর বিনোদনের জন্যও নয় বা নাম-খ্যাতির জন্যও নয়— আমার সম্পাদকের প্রতি কর্তব্যের খাতিরে। লেখাই আমার বৈকালিক বিশ্রাম—তাই আমি অনেক কাজ করছি।...এখন তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি অমৃতাকে আমার ছবিটা দেখিয়েছ? সে এখন কি করছে? তুমি প্রতি চিঠিতেই লিখছ এর সংকট এখনো কাটে নি। কিন্তু এ কথায় তো কিছু বোঝা যায় না, এ তো একটা কথা মাত্র। তুমি আশা করি বুঝছ ওর খবরের জন্য আমি কতটা উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। আমি জানি, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে ঠিক যা করা উচিত সে তাই করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে, কিন্তু আমি ওর কথা আরও জানতে চাই। তুমি কেন ওকে আমার চিঠিগুলি দেখাচ্ছ না? যখন সে একলা থাকে তখন তাকে আমার চিঠিগুলো দেখাও ও তার মনের কথা আমায় যে করেই হোক জানাও। তার মনের ঠিক কি অবস্থা আমি জানতে চাই। এ কথা লিখে লাভ নেই যে সে অতীতের কথা ভুলবে না—কারণ 'অতীত' কথাটাও একটা কথা মাত্র। আমার কথা বুঝতে পারছ তো?...

আমার যে উন্মত্ত অভিজ্ঞতা হল (তুমি তাকে প্রেম বলতে পার) যা গত তিন মাস ধরে আমাকে অসীম যন্ত্রণাবিদ্ধ করেছে- -এখন তার শুভ দিকটা দেখাতে শুরু করেছে। ঐ মেয়েটি আমার জীবনটাকে বদলে দিয়েছে, বদলে একে সহস্রগুণে ভালো করেছে। আমার এই জাগরণ সূর্যোদয়ের মতই মহিমাময়। আমি সত্যকে দেখেছি এবং সামাজিক জগতের ও বিদ্যার জগতের নোংরামিও

দেখেছি। চতুর্দিকের ভীরুতা ও নোংরামির মধ্যে আমি নিজেকে পবিত্র মনে করছি। যত মিথ্যার বেসাতি দেখছি, আমার শান্তি হচ্ছে যে আমি দুঃখ পাচ্ছি, আমি এ জীবন উপভোগ করতে চাই না ও করব না, আমি সুখ চাই না, চাই না—ইতি তোমার বন্ধু মির্চা।

...চিঠিগুলি পড়ছি আর ভাবছি মির্চা বেনা বনে মুক্তা ছড়িয়েছে। বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল আমায় লিখবে না তাই খোকাকে লিখেছে—ও নিশ্চিত ছিল খোকা আমাকে চিঠিগুলো দেখাবে এবং আমি যথাকর্তব্য করব। ওর বিশ্বাস ছিল আমি ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করব। এত বিশ্বাস ছিল আমার উপর আর আমি কি করলাম? সারা জীবন ধরে ভাবলাম যে ও আমাকে ঠকিয়েছে। করতে তো আমিই পারতাম, এ আমার দেশ, আমার কত বন্ধু ছিলেন, তাঁরা সবাই শ্রেষ্ঠ পুরুষ। আমার কি সহায় কেউ ছিল না? তবে কেন করলাম না? কারণ আমার ধারণা ছিল এ বিষয়ে যা কিছু করণীয় পুরুষকেই করতে হবে, মেয়েরা কেন এগিয়ে যাবে, উপযাচিকা হবে! এও একটা কুসংস্কার এবং দম্ভ। আমি একটা বোকা অপদার্থ মেয়ে ছিলাম। অবশ্য আমি জানতাম না যে বাবা পুলিশ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে আমাকে চিঠি লেখবার চেষ্টা করলে ওকে দেশ থেকে বের করে দেবেন। তিনি ওকে লিখেছিলেন, ‘তুমি আমার গৃহ অপবিত্র কর;;ছ—তুমি ছিলে তৃণাচ্ছাদিত সর্প, আর সাপ যখন মাথা তোলে তখনই তাকে মারতে হয়। তাই আমি করেছি...'কাজেই ওর কোনো উপায় ছিল না, অথচ সারা জীবন আমি ওকে সন্দেহ করে কষ্ট পেয়েছি। আর এদিকে খোকা ওকে মিথ্যা কথা বলেছে, অন্তত ছবিটার কথা যখন বলেছে যে আমায় দেখিয়েছে তখন চিঠির কথাও বলেছে, কাজেই এটা কি অসম্ভব যে ওরও মনে হয়েছে আমি ইচ্ছে করেই কিছু করলাম না, আমারও সত্য ছিল না।...আমার বাড়ির দু মাইলের মধ্যে এই চিঠিগুলো ছিল আর আমি তেতাল্লিশ বছর পর পেলাম। এই হচ্ছে

কর্মফল, ভবিতব্য। খোকা বড় বড় করে কথা বলে যাচ্ছে, "পরে পোড়ো। এখন একটু গল্প করা যাক—"

আমি বললাম "উল্লুক", রাগে কাঁপছি আমি। ও চমকে উঠেছে। আমার মতো পরিশীলিত মহিলার মুখে এমন একটি ইতর দুর্বাক্য উচ্চারিত হতে পারে তা ও ভাবতেই পারে নি। "কি বলছ রু, কি বলছ?"

"কিছু না, একটা জন্তুর নাম।"

"কাকে বলছ?"

"ঐ জন্তুকে। খোকা এসব চিঠি আমায় কেন দেখাও নি?"

'দেখিয়েছিলাম তো।" "

"দেখিয়েছিলে? মিথ্যেবাদী! কেন দেখাও নি বল।"

"দেখালে তুমি কি করতে? তোমার করার কি ছিল ?"

আমি তাকিয়ে দেখছি ঐ লোকটার দিকে— মুখে ঘাম চক্ চক্ করছে— মোমবাতির আলোকে ওকে এক আদিমগুহাস্থিত জন্তুর মত মনে হচ্ছে। কেন এই লোকটা এমন শত্রুতা করল ? এসব প্রশ্নের কোন উত্তর নেই এবং উত্তর পেয়েই বা কি হবে?

"চলি খোকা। এই চিঠি তিনখানা যে এতদিন রেখেছ সেজন্য ধন্যবাদ।" মনে মনে ভাবছি ওর উপর মিথ্যা রাগ করছি, এ চিঠি পড়ে কি ও বুঝতে পারে, হয়ত বা ভালো করে পড়েই নি। ব্যাগটা খুলে চিঠিগুলো ভরছি, খোকা বললে, "জানো তো কি দিনকাল পড়েছে, কত দিন রোজগার নেই, যদি পঞ্চাশটা টাকা দাও কাল র্যাশন তুলতে পারি।" আমি টাকা ক'টা ফেলে দিয়ে চলে এলাম – আমার গা ঘিঘিন্ করছে। খোকা পিছন থেকে ডেকে বলছে—"ওঁ কোথায় আছে জান?"

"নিশ্চয়ই—"

"কোথায় বলতো?"

"ঠিক যেখানে ছিল সেইখানে ।"

খোকা বিস্মিত, "এ আবার একটা ঠিকানা হল?"

"আর কোনো ঠিকানা আমি জানি না ভাই।"

আমি অবাক হয়ে ভাবছি উনিশ শ ত্রিশ সাল যেন মন্ত্রণা করছিল আমাদের মিলন হতে দেবে না আর এই উনিশ শ তিয়াত্তর মন্ত্রণা করেছে আমাদের দেখা হবে। আমার আত্মবিশ্বাস বাড়ছে, আমি হয়ত গিয়ে পৌঁছতে পারব। আমি অবাক হয়ে গেছি ১৯৩০ সালে যে এরকম চিঠি লিখেছে, এত সত্যে স্থির – ১৯৩৩ সালে সে ওরকম বই লিখল কি করে? আমার ভয় হচ্ছে ওর এই যে সুন্দর নরম মনটা এই চিঠির ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাচ্ছে সেই মনট বেঁচে আছে– না পাণ্ডিত্যের চাপে শুকিয়ে গেছে। ওর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শুনছি আর ভয় পাচ্ছি আমি। আমি জানি বিদ্যার গুরুভারে মানুষ পিষ্ট হয়ে যায়। আমার বাবাও বলতেন, "বিদ্যা আমাদের অনেকেরই পিঠের বোঝা, ভারবাহী জন্তুর মতো আমরা চলেছি, একমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই দেখেছি বিদ্যা তাঁর রক্তে চলে গিয়ে দুদিকে পাখা গজিয়ে দিয়েছে, ঐ বিদ্যাই তাঁকে লঘুভার করে আকাশে ওড়াচ্ছে।"

যাবার সময় যত এগিয়ে আসছে– আমি বুঝতে পারছি না হঠাৎ কোথা থেকে এ আবর্ত এসে এই জীবন-নদীর মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছে, কি এর উদ্দেশ্য, কি-ই বা পরিণাম!

আমার স্বামী আমাকে আশ্বাস দিচ্ছেন, "তুমি নিশ্চিত জেনো তোমার জীবনে এতে কোনো সুফল ফলবে। এর কোনো উদ্দেশ্য আছে, আমাদের দুজনেরই লাভ হবে।"

"তোমার আবার কি লাভ হবে!"

লাভ হবে না? লাভ তো হচ্ছে। আমি শুধু নয় আমরা সকলে তাঁকে আরো চিনছি, আমরা তাঁকে ভক্তি করছি। উনিও নিজেকে চিনছেন। কতটা ভালোবাসা, কতটা ধৈর্য, কতটা নিরভিমান হতে পারেন তার পরীক্ষা দিচ্ছেন,

এবং অবলীলাক্রমে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন। আমি মাঝে মাঝে ভাবি আমাদের একটা সাধারণ সংসারের মধ্যে বসে আমার স্বামী যা হয়েছেন ঋষিকেশের ঐ গুহায় বসে সেই জজসাহেব মৌনী সাধু তা হতে পারলেন কিনা!

আমি স্বপ্নাচ্ছন্নের মত কাজগুলো করে যাচ্ছি! যে সমস্ত নিমন্ত্রণ পেয়েছি তার জন্য লেখা লিখছি, বৈষয়িক কাজগুলো সবই করে যাচ্ছি কিন্তু এ সমস্তে স্পৃহাশূন্য আমার মন, ভাবাবিষ্ট। এই কথাটা লেখবার জন্যই এই কলম ধরেছি, বাল্যকালে কি হয়েছিল তা লেখবার জন্য নয়। কারণ বাল্যপ্রণয় ও মধ্যপথে তার অকস্মাৎ অপঘাতমৃত্যু কোনো বিশেষ ঘটনা নয়, এরকম সর্বদাই হয়েছে, হচ্ছে, হবে। বহু লোক লিখে গিয়েছে অনেক জোরালো কলমে। আমি লিখছি বেয়াল্লিশ বছর পরে যা ঘটল সেই বিশেষ ঘটনাটার জন্য, কারণ এ এক বিস্ময়কর ঘটনা, হয়ত বা অভূতপূর্ব। মুশকিলও হয়েছে অভূতপূর্ব বলেই–এ ভাব প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই–যা বলতে চাইছি বলা হচ্ছে না। বাক্যগুলি যেন নিষ্প্রাণ ছায়ামাত্র – আমার অনুভূতিকে ধারণ করবার অযোগ্য।

মির্চার বিষয়ে নূতন করে মনে পড়বার প্রায় বছর খানেক আগে থেকেই অর্থাৎ সেরগেই আসার আগে থেকেই আমি আমার ভিতরে একটা অদ্ভুত ব্যাকুলতা অনুভব করেছিলাম সেকথা আগেই বলেছি–সেই ব্যাকুলতার তীব্রতা আমি বোঝাতে পারছি না। মনের ভিতর সেই গানটার সুর ভেসে আসত–"আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী"–আমার এই ভাব কেবল সুরেই প্রকাশ্য। আবার চঞ্চলতা এতদূর হয়েছিল যে আমি একে ওকে তাকে বলতাম, "আমি দেশের বাইরে যাব, কোথাও যাব, একটু ব্যবস্থা করা যায় না?" আমাদের একজন সহকর্মী আছেন পাদ্রী, তাঁর অনেক জানাশোনা, তাঁকে ধরে পড়তাম বার বার–"আমায় একটু বাইরে কোথাও যাবার ব্যবস্থা করে দিন।"

"কোথায় যেতে চান?"

'যে কোনো জায়গায় দেশের বাইরে–

“আমি মুখ ভার করতাম। এ ব্যক্তি করে দেবে না। “আচ্ছা আচ্ছা ব্যবস্থা করা যাবে, তা কোথায় যেতে চান তা তো বলবেন?”

“জাপানে, আমেরিকায়, ইংল্যাণ্ডে— যে কোন জায়গায়।” ভদ্রলোক আমায় লক্ষ্য করছেন, “you are an amazing woman.” এই ব্যাকুলতা যেন চন্দ্রোদয়ে চঞ্চল সমুদ্রের মতো, যেন কোন অজ্ঞাত শক্তি বহুদূর থেকে আমাকে আহ্বান করছে। আমার বন্ধন খুলে দিচ্ছে— ‘দিগন্ত হতে শুনি তব সুর, মাটি ভেদ করি ওঠে অঙ্কুর। কারাগারে লাগে নাড়া।'

“কেন, এদেশ দোষটা করল কি?”

আমার কারাগার ভাঙবে, মির্চা তার নিমিত্ত মাত্র। কিসের কারাগার ? এই জগৎটাকে পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে যে রকম চিনেছি, জেনেছি এবং যে জানাটাকে ধ্রুব বলে মেনেছি, সেই মূঢ় বিশ্বাসের কারাগার। আমি জানি অল্প কয়েক দিনই আমার এ ভাবটা থাকবে, চিরদিন থাকতে পারে না, কিন্তু অল্প সময়ের জন্য হলেও সেই কারাগারটা আমার পক্ষে ভাঙলো, আমি মহাকালের এক আশ্চর্য রূপ দেখতে পেলাম। আমি অন্য কোনো অবস্থানে উন্নীত হয়ে দেখলাম যাকে আমরা অতীত বলে ভাবছি, প্রকৃতপক্ষে তা অতীত নয়, তা কোথাও চলে যায় নি। তার আদিও নেই, মধ্যও নেই, অন্তও নেই। ‘নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং, পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপম্’ এ দেখে লাভ কি হল? আমি আকূল হয়ে জিজ্ঞাসা করি যদি কোনো ঈশ্বর থাকো তো বল, লাভ কি হল আমার? কিন্তু উত্তর তো আমিই জানি, লাভ লোকসানের কথার তো খতিয়ান এখানে হবার নয়। এমন অনেক ঘটনা ঘটে যার কোন সার্থকতা নেই বাস্তব জীবনে, অথচ সেই অবান্তর অনর্থক ঘটনাগুলি দিয়েই মানুষের জগৎটা তৈরী, পশুর নয়। এই আট মাস ধরে আমি অন্তত এটুকু বুঝতে পারলাম—আমি পশু নয়, আমি মানুষ, বিশ্বরূপ দেখবার অধিকার আমার আছে।

মহাকাল আমাকে কোলে তুলে নিয়ে নৃত্য করছেন, তাঁর জটার বাঁধন খুলে আমার চোখমুখ সর্বশরীর আবৃত করছে। আমার অগ্রপশ্চাত, পূর্ব পশ্চিম, দূর ও নিকটে এক হয়ে গেছে, আমার কারাগার চুরমার হয়ে গেছে, লজ্জা, ভয় আত্মীয়-স্বজনের বন্ধন সব ঝরে পড়ে গেছে। শুধু প্রেম, কালজয়ী প্রেম ঐ উজ্জ্বল নীলাকাশে ধ্রুবতারার মত আমায় পথের নির্দেশ দিচ্ছে। আমাকে মহাসমুদ্র পার করে নিয়ে যাবে।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে আমার ইচ্ছা হল আমার স্বামীকে প্রণাম করব। তাঁর ভালোবাসার স্নিগ্ধ বাতাস আমাকে ঘিরে আছে, আমার শরীর মন জুড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এখানে প্রণাম করা যাবে না। উনি অপ্রস্তুত হবেন। তাই আস্তে আস্তে বললাম "সারা জীবন তুমি আমায় এত স্বাধীনতা দিয়েছ।" উনি একটু একটু হাসছেন "তোমার স্বাধীনতা কি আমার পকেটে থাকে যে মাঝে মাঝে বের করে দেব? তোমার স্বাধীনতা তোমারই বস্তু।"

ন হন্যতে ।। চতুর্থ পর্ব

মহানগরীর রাজপথে আমি সদ্য পরিচিত ‘জন্’কে বললাম, “আমরা যখন উডল্যাণ্ডের রাস্তায় যাব তখন তুমি আমায় বোলো।” ওর ঠিকানাটা আমি সংগ্রহ করেছি, অনেক কষ্টে। দেশেই সংগ্রহ করেছি ওর ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর, এত কষ্ট করে সংগ্রহ করার দরকারই ছিল না। কিন্তু দেশে ওটা জোগাড় করাই একটা অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঠিক ঠিকানা চাই আমার, এতদিন তো গরঠিকানায় ঘুরলাম কত।

গাড়ি চলেছে, নূতন দেশ, নূতন শহর, অচেনা মুখ পার হয়ে হয়ে আমার চিরপরিচিত কোনো লক্ষ্যের দিকে। আমার মন আচ্ছন্ন। আমি যেন ঘুমের ঘোরে আছি। আমার এই শরীর, আমার এত দিনের জীবন, তার সঙ্গে যে-আমি এই ঠিকানা হাতে করে বসে আছি তার দূরত্ব অনেক। এই দুইকে এক করে রাখা বড় শক্ত হচ্ছে। শক্ত হচ্ছে মনে রাখা—আমি কে।

জন্ বললে, “আমরা এইবার উডল্যাণ্ডে ঢুকলাম।”

দুপাশে কি বিস্তৃত বনশ্রেণী না শহরের বাড়ি? আমি জানি না। আমি দেখতে পাচ্ছি ছোট ছোট বাগানওয়ালা বড় বড় বাড়ি— আবার কখনো দেখছি বড় বড় গাছে ছাওয়া ছায়াচ্ছন্ন পথ উডল্যাণ্ড, কোনটা সত্য? কে জানে? একটা দৃশ্য ভিতরে, একটা বাইরে। ভিতরেরটাই সত্যতর, কারণ মনই দেখে, মনই দর্শক, আমি যে জগতে এখন বাস করছি সেটা মনোজগৎ। কতদিন কত বিনিদ্র রাত্রে এই রাস্তাটার কথা ভেবেছি যেন গাছের ছায়ায় ঢাকা বাঁকা পথ—যদি গাছ নাও থাকে তবু সে ভাবনাটা যাবে কোথায়? আমি চোখ অর্ধেক বুজে বসে আছি— আর উডল্যাণ্ড যেন কোন মহাশূন্য থেকে ভেসে ভেসে আসছে—টুকরো টুকরো রাস্তা, ছায়াময়।

গাড়ি থামল। মলি বললে,"অমৃতা, এই মেয়ে তোমায় নিয়ে যাবে যেখানে যেতে চাও ।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমরা কি অধ্যাপককে ফোন করেছিলে জানো তিনি কখন তাঁর ঘরে থাকবেন ?"

"করেছিলাম। কিন্তু তাঁর সেক্রেটারী বললে তাঁর সময়ের কোনো ঠিক নেই।" শার্লি অল্প বয়সের মেয়ে—এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। আমরা একটা কাফেটেরিয়াতে খেতে বসলাম। শার্লি খাবার রাখল টেবিলে, আমি খাদ্যগুলো চিনতে পারছি না, ক্ষণে ক্ষণেই হাত থেকে কাটা পড়ে যাচ্ছে। শার্লি একটু বিস্মিত। রাস্তায় বেরিয়ে আমি বললাম— "থিয়োলজিক্যাল কলেজটা কোথায় জান?"

সে বললে, "এই তো একটা ব্লক পরে।"

"হেঁটে যেতে পারব তো?"

"সে কি, ঐ তো একটা ব্লক ওদিকে, পারবে না কেন?"

আমরা এগোচ্ছি, আমি গল্প করবার চেষ্টা করছি খুব সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে। —"তুমি কারু সঙ্গে দেখা করবে ঐ কলেজে ?"

"হ্যাঁ, আমার বন্ধু আছেন একজন।" "তিনি জানেন তুমি আসছ?"

"না—"

"কতদিন পরে দেখা হবে?"

"মাত্র বেয়াল্লিশ বছর।"

"বেয়াল্লিশ বছর তোমাদের দেখাই হয় নি? তাহলে তো কেউ কাউকে চিনতেই পারবে না।"

"আমার তো তা মনে হয় না। বেয়াল্লিশ বছর এমন কি বেশি সময় ? এই পৃথিবী কত দিনের পুরানো, সূর্যের জন্মের তারিখই বা কে জানে?" হঠাৎ আমার মনে হল এই স্বগতোক্তিগুলো জোরে জোরে করা উচিত হয় নি, ও কি ভাবল কি জানি। শার্লি কিন্তু বিস্মিত নয়, তার বিস্ময় অন্য কারণে। সে

বলছে, "বেয়াল্লিশ বছর পর কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়াটা কি রকম আমি ভাবতেই পারি না।"

"পারবে, সময় হোক।"

"ড্রামাটিক।"

"সকলেই তো বলে জীবনটাই ড্রামা, দেখি কি রকম ড্রামা হয়।"

শার্লি বললে, "এই তো পৌঁছে গেছি।" হঠাৎ যেন মহাশূন্য থেকে জাদুকরের দণ্ড লেগে একটা সাইনবোর্ড বাগানের উপর জেগে উঠল। একটা সাইনবোর্ড মাত্র ঠিকানা লেখা, সেটা কি এত অর্থবহ হতে পারে। আমি কি হোলি গ্রেইল দেখেছি?

বাড়ির বড় দরজার কাছ পর্যন্ত আমি বাতাসে ভেসে চলেছি—শার্লি দরজাটা খুলল, পাশে প্রকাণ্ড বোর্ডে অনেকের নাম লেখা আছে। ও জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কার সঙ্গে দেখা করতে চাও?"

আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, কথা বলা অসম্ভব, আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম "ও উনি—বিরাট মানুষ, বিখ্যাত ব্যক্তি.. "

আমি এগিয়ে চলেছি, শার্লি আমার হাতের ভিতর হাত গলিয়ে ধরে নিয়ে চলেছে, কেন কে জানে? আমি কি অশীতিপর বৃদ্ধা? আমি বললাম, "এঁর খ্যাতি কি জন্যে ?"

"উনি যে মহাপণ্ডিত।"

পণ্ডিত! আমার মনটা আবার চুপসে গেল। কার সঙ্গে দেখা করতে এলাম! আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "শার্লি, উনি পণ্ডিত না জ্ঞানী?"

শার্লি হকচকিয়ে গেছে, সে বললে, "তা জানি না, আমি সামান্য ছাত্রী, ওঁকে তো চিনি না।"

আমরা লিফ্‌টের কাছে এসেছি—একজন দাঁড়িয়েছিল সে বললে, "এটা প্রাইভেট লিফ্‌ট—বাইরে থেকে যাঁরা আসেন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়, মাত্র তো তিনতলা।" শার্লি খুব শক্ত গলায় বললে, "লিফটের দরজা খুলুন, ইনি কাল রাতে বহু হাজার মাইল পার হয়ে এসেছেন—এক পাও সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারবেন না।"

আমি ভাবছি কেন একথা বলছে— আমি কি কাঁপছি? শার্লি আমাকে ধরে আছে লিফটের মধ্যেও। কি জানি কোথা থেকে এই ঘোর বিদেশে আমার একটা ছোট্ট মা এসেছে—আমাকে যেন কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে!

লিফট তিনতলায় থামল। আমরা একটা লাইব্রেরীতে এসেছি। আমি যেন ঘুম থেকে চোখ মেলে দেখলাম—ওঃ একটা লাইব্রেরী, শুভারম্ভ, আমি লাইব্রেরী পার হয়ে একটা গলিতে পড়লাম—দুধারে ঘর—একটা ঘর পার হয়ে চলেছি, শার্লি একটু থেমে বললে, "ঐ তো অধ্যাপক আছেন ভিতরে।"

আমি ভিতরে ঢুকলাম।

ঢোকামাত্র, একেবারে সেই মুহূর্তে বৃদ্ধ ব্যক্তিটি একটা শব্দ করল, "ওহ্" তারপর উঠে দাঁড়াল, আবার বসে পড়ল, আবার দাঁড়িয়ে উঠল, তারপর আমার দিকে পিছন ফিরল। এ কি কাণ্ড! আমায় কি চিনতে পেরেছে ? কি করে পারল? আমার দিকে তো তাকায় নি, এতদিন পরে কি পায়ের শব্দে চিনবে? অসম্ভব, যাই হোক এ তামাসাটা শার্লির সামনে হওয়া উচিত নয়। দরজার কাছে ফিরে এসে দেখি শার্লি চিত্রাপিতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তার চক্ষু বিস্ফারিত। দুটি বৃদ্ধ বৃদ্ধার এই অভিনব সাক্ষাৎকারের একমাত্র দর্শক। আমি বললাম, "শার্লি তুমি চলে যাও একটু পরেই আমি তোমার কাছে আসছি।"

আমার মন এখন শান্ত, স্থির, কোনো উত্তেজনা নেই, যা করবার ছিল করা হয়েছে। "এই বিরাট শহরে আজ তোমার প্রথম দিন, পথ হারাবে না তো?"

"না না, পথ হারাব না।" মনে মনে বলছি এতদূর যখন পৌঁছতে পেরেছি সময়ের মহাসিন্ধু পার হয়ে তখন মহাজগতেও আর আমি পথ হারাব না।

দরজার কাছ থেকে ফিরে মির্চার কাছে আর পৌঁছতেই পারি না, ঘরময় বই ছড়ানো, বইয়ের পর্বত চারদিকে, ঘরের ছাদ পর্যন্ত। আমার কেমন যেন গা ছমছম করছে, আমার হাত পা কাঁপছে শীত নয় ভয়ে। শুনেছি পাথর চাপা পড়ে সুকুমার জীব জীবাশ্ম হয়ে যায়, ওর তেমন কিছু হয়নি তো?...আমি ওকে দেখছি—মাথায় একেবারে চুল নেই, ঘাড়ের কাছে পাকা চুল—তেমনি পাতলা চেহারা—আর তেমনি চঞ্চল— একবার টেবিলের উপর থেকে কাগজ তুলে নিচ্ছে—আবার রেখে দিচ্ছে। ওর পাতলা শরীর যেন বাতাসে কাঁপছে।

"মির্চা তুমি মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন?"

"তোমায় আমি দেখব না, আমি অন্য লোকের জন্য অপেক্ষা করছি।"

"কার জন্য অপেক্ষা করছ, কার জন্য?"

"একজন ইনকাম ট্যাকস অফিসারের জন্য।"

"ইনকাম ট্যাকস অফিসার?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।"

'বোকামি কোরো না মির্চা, জান আমি কে?" ওর উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলে যাচ্ছি, "চিনতে পেরেছ আমায়? জানো কে আমি, কে আমি?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, (সার্টেনলি, সার্টেনলি)" ও মাথা নাড়ছে, এ যে সে-ই মির্চা একেবারেই সেই তেইশ বছরের ছেলে, ওর তেষট্টি বছরের মধ্যে সে-ই বসে আছে, আমাকে ও বলত, "তুমি 'ভীষণ' কথাটা খুব ব্যবহার কর—সব কিছুই তোমার 'ভীষণ'।" ওকথা আমায় আরো অনেকে বলেছে, আমি হয়ত আজও ওরকম বলি, ও যে রকম "সার্টেনলি, সার্টেনলি" বলে মাথা নাড়ছে। কি মহারহস্য,কি অপার বিস্ময় - আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে এই তো ওকে চিনতে পারলাম। সে এই— সে এই, অন্য কেহ নয়— আর আমি? আমি কে?

আমিও সে, ‘অক্ষয় তার সপ্তদশী মন করতে পার আজো অন্বেষণ’—”বলো বলো আমি কে, বলো তবে।”

“তুমি অমৃতা। যে মুহূর্তে তুমি এদেশের মাটিতে পা দিয়েছ সেই মুহূর্তে জেনেছি আমি।...”

“কি করে জানলে?” নীরবতা।

“বল, বল, বল না।”

“হুঁঃ, এড্ বলেছে।”

“এড্ জানতই না আমি কবে আসব।”

“Well, I knew—আমি জানতে পেরেছি ব্যাস্।”

“ফের, ফের, প্রিয়তম মির্চা, আমি কতদূর থেকে এসেছি তোমাকে দেখব বলে, তুমি ফিরবে না, আমায় দেখবে না?”

“শোনো অমৃতা”, সে তার অস্থির হাতটা দিয়ে বইয়ের তাকটা ধরে আছে—যেন তা না হলে পড়ে যাবে—”শোনো বলি সমস্ত ব্যাপারটাকে আমি অন্যভাবে দেখেছি— আমি তো বলছি না আমারটাই ঠিক। হয়ত তোমারটাই ঠিক, হয়ত কেন নিশ্চয়ই তোমারটাই ঠিক।”

“আমার চিঠির উত্তর দাও নি কেন? চিঠি পেয়েছিলে?”

“হ্যা ছোট, দুচার লাইন।”

“তা হলই বা, উত্তর দিলে না কেন? ভদ্রতাও তো আছে।”

“ভদ্রতার কথা কে ভাবছিল?” তারপর একটু থেমে, “ঐ তো বলছি আমার সেই অতুলনীয় অভিজ্ঞতা এত সুন্দর যে আমি ভাবি নি আর তাকে স্পর্শ করা যায়—তাই তোমাকে আমি দেশকালের অতীত করে রেখে দিয়েছি।”

“আসল কথা তুমি ভেবেছিলে আমি আমার নূতন জীবনে তোমায় ভুলে গিয়েছি।”

“না না না অমৃতা, একবারের জন্য এক মুহূর্তের জন্য ভাবি নি তুমি আমায় ভুলতে পার।” ও একটা বই তাক থেকে নামিয়ে ফেলল,

"শুধু আমি জানতাম না যে তুমি আমায় দেখতে চাও—"

"কেন?"

"আমরা তো জানি কত সুন্দর জিনিস আছে, সুমেরু শিখর আছে, তুষারমৌলি হিমালয় আছে, আমরা কি যেতে পারি? জানি তারা আমারই আছে, তবু কি পেতে পারি? তাই বলে সেটা ভোলা নয়, সে আমার গোপন বিশ্বের গোপনতম সত্তায় লগ্ন সুন্দরতম স্বপ্ন।"

"এই তো পারলাম আমি, এই তো এলাম।"

"তুমি যে অমৃতা, indestructible অমৃতা — তুমি যা পার আমি কি তা পারি? তোমার সংস্কৃতি কত হাজার বছরের পুরানো, তোমার ইতিহাস আর আমার এক তো নয়—অমর ভারতের——"

"তাই নাকি? আমি তো শুনলাম তুমিও ভারতীয় ?"

"ওঃ হ্যাঁ, আমি তো সকলকেই বলি আমি ভারতীয়।"

"আমি এ সব কিছু শুনতে চাই না, তুমি ফের মির্চা আমি তোমায় দেখব আজ।" ও দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু স্থির নয়— আমাদের মধ্যে অন্তত তিন গজ ব্যবধান, আমি জোরে জোরে কথা বলছি—আমাদের তো বয়স অনেক, কানের জোর নিশ্চয় কম।... .ওকে উদ্ভ্রান্ত মনে হচ্ছে।

"কি করে তোমাকে দেখব আমি? দান্তে কি কখনো ভেবেছিল তার বিয়াত্রিচেকে এই শরীরের চোখে আর দেখবে?"

আমিও কাঁপছি, ওর পাগলামি দেখে আমার রাগ হচ্ছে। এ লোকটি ঠিকই এক অবাস্তব জগৎ সৃষ্টি করে তার মধ্যে বাস করছে। কোথা থেকে দান্তে বিয়াত্রিচে নিয়ে এল –"স্থান কালের অতীত আবার কি? আমি কি ভূত হয়ে গেছি নাকি? কোন স্বপ্নজগতে কল্পনার ধোঁয়াটে স্বর্গে বাস কর তুমি মির্চা? আমি এই বাস্তব জগতের রক্তমাংসের অমৃতা, তোমার পড়ার ঘরে দাঁড়িয়ে আছি।

এটা সত্য। এ সত্য তোমাকে স্বীকার করতে হবে। তোমার পলায়নী মনোবৃত্তি ছাড়ো তো।”

“কি করে কি করি আমি অমৃতা, তোমার যে স্বামী আছেন, আমারও স্ত্রী আছেন, এখন কি বলি বল?”

আমি বিস্মিত, হতবাক। মির্চা বলে কি?

“—মির্চা, তুমি এত পড়লে তোমার প্রজ্ঞা হল না? প্রেম কি একটা বস্তু যে তুমি একজনের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অন্যকে দেবে? একি বিষয় সম্পত্তি ? সোনার গয়না ? এ তো একটা আলো মির্চা, একটা আলো। যেমন বুদ্ধির আলো, জ্ঞানের আলো, তেমনি প্রেমের আলো। বুদ্ধির আলোরও সীমা আছে, তার একটাই ক্ষেত্র, কিন্তু প্রেমের আলো সবচেয়ে জ্যোতির্ময়, তা সব কিছুর সত্যরূপ দেখায়—এ আলো জ্বললে ত্রিভুবন প্রেমময় হবে —অপ্রিয় প্রিয় হবে—তুমি বিশ্বাস কর মির্চা তোমাকে মনে পড়বার পর আমার স্বামী আমায় কাছে প্রিয়তর হয়েছেন, এতো ভালো তাঁকে আগে কখনো বাসি নি। বিশ্বাস করবে তুমি?”

ও ঘাড় নাড়ছে “নিশ্চয় নিশ্চয়, সত্য সত্য—”

“কি সত্য?”

“তুমি যা বলছ তা ধ্রুব সত্য, তুমি সব সময়ই নির্ভুল সত্য বল।” ,

“হ্যা, সত্যের পরে মন, আমি করেছি সমর্পণ। তাই তো আমি সত্যকে স্বীকৃতি দিতে এসেছি। কাজটা সোজা হয় নি মির্চা, সংসার, সমাজ, আত্মীয়স্বজন, পুত্রকন্যা সকলের সামনে সম্মানের উচ্চাসন থেকে মাটিতে নেমে আসা। কেউ কেউ হয়ত ভাবছে আমার ভীমরতি হয়েছে। আরো বেশি লোক যখন জানবে কি ভাববে তারা— আমাদের দেশ তো জানো? আমার গায়ে ধুলো দেবে। বেয়াল্লিশ বছর পর তোমায় দেখতে আসা কি সোজা কথা !”

“একেবারেই নয়, আমি তো কিছুতে পারতাম না। কতবার আমার স্বপ্নের ভারতে যাবার সুযোগ এসেছে আমি যাই নি – কি করে যাব ওখানে?”

“কেন আমি আছি বলে?”

ও মাথা নাড়ছে—"তাই তো..."

"আর আমি তো তুমি আছ বলেই এলাম। আমি এত সাহস কোথা থেকে পেলাম বলত?"

"আমিও তো তাই ভাবছি, কোথা থেকে পেলে?"

"গান্ধীজীর কাছ থেকে। আমি ভাবলাম উনি যদি পারেন আমি কেন পারব না? আর তাই যদি না পারি তবে ওঁর মৃত্যুদিনে বক্তৃতা করে কি হবে! আমি খুব বক্তৃতা করি তো।"

"গান্ধী কি এত বড় হয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, উনিশ শ' ত্রিশে তুমি ওঁকে যা জানতে তার চেয়ে অনেক বড় হয়েছিলেন। উনি যে মানুষের কাজে নেমেছিলেন, শুধু তো পুঁথি পড়ছিলেন না।...তাই তো তোমায় জিজ্ঞাসা করছি, তোমার বইতে ও কি চরিত্র এঁকেছ আমার, ওখানে তো আমাকে পেলাম না আমি।"

"ফ্যান্টাসী, ফ্যান্টাসী, তোমাকে আমি রহস্যময়ী এক দেবী করতে চেয়েছিলাম যার কাজের কোনো ব্যাখ্যা নেই। অঘটন-ঘটন পটিয়সী কালীর মতো।"

"খবরদার আমাকে কালীর সঙ্গে তুলনা করবে না...চিরকাল তোমার এই...আমি এত কি কালো?..."

"আচ্ছা, আচ্ছা, দুর্গার মতো, যে অসম্ভব কাজ করতে পারে; inscrutable, এক হাতে অস্ত্র, অন্য হাতে বরাভয়—an enigma, the enigma that you were.'

"আমি তোমায় বলছি ফ্যান্টাসীর সৌন্দর্য আছে, সত্যের সৌন্দর্য উজ্জ্বলতর, কিন্তু অর্ধসত্য ভয়ঙ্কর। তোমার বইটা তাই আমার কাছে বিভীষিকা। তাছাড়া আমি খুব সহজ সরল একটা ছোট মেয়ে ছিলাম মির্চা, মাঝে মাঝে দার্শনিকের ভান করতাম এই পর্যন্ত, রহস্যটা তোমার সৃষ্টি—তুমি রহস্য ভালোবাস। কিন্তু এবার আমি অসম্ভব কাজ করতেই এসেছি—" ও পিছন ফিরে আছে, আমি ওর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছি—আমার অন্তর নিষ্কম্প, স্থির—ওর এই

রহস্যের ঘোর আমি কাটাব—এই বাস্তব পৃথিবীর মাটিতে আমরা পরস্পরকে দেখব।

"প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।"

মির্চা ফিরল না, ওর মাথা নিচু-কিছুতেই ফিরছে না।

"কি চাও তুমি অমৃতা??"

"শান্তি, তোমার কাছে শান্তি চাই আমি।"

"হাঃ হাঃ হাঃ" ও পাগলের মত হাসছে। "তোমাকে আমি কি করে শান্তি দেব যখন আমার নিজেরই শান্তি নেই? How can I give you peace when I have no peace in me..."

কি হবে, ভয়ে আমি উতলা—ওর মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল নাকি? এত সুন্দর এত গভীর এত পরম সত্যকে ও স্পর্শ করতে পারে না? হঠাৎ আমি বললাম—"মির্চা তুমি যে কী চমৎকার পিয়ানো বাজাতে, বাজাও তো এখনো?"

"না না, সে কবে ছেড়ে দিয়েছি।"

"কেন?"

"কী দরকার, সময় নষ্ট—"

আমি ভাবছি কি দিয়ে ও বাজাবে সঙ্গীত, ওর আঙ্গুলগুলোই যে বইয়ের মলাটের মতো শক্ত, সেখানে শিরা-উপশিরা শুকিয়ে গিয়েছে হবে না আর হবে না, সেই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ আর ঝরবে না।

"মির্চা, এই যে আমি তোমার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছি রক্তমাংসের মানুষ, আমি কোনো সিম্বল নয়, মিথ্ নয়, আমি একজন সুখদুঃখকাতর অপার সম্ভাবনাময় মানুষ। বিয়াত্রিচে ভূত হয়ে স্বর্গে গিয়েছিল, সেখানে দান্তের সঙ্গে দেখা হল কিন্তু আমি যে এই জীবনে এলাম এটা কি কিছুই নয়!"

ও পিছন ফিরেই বলছে, একটু হাঁপাচ্ছে—"বিস্ময়! কি পরম বিস্ময়, সত্যই তো, আমি তো তাই পেসিমিস্টদের বলি, জীবনের কি অপার সম্ভাবনা কে জানে, কে জানে কি হতে পারে! কোনো দিন ভাবি নি তোমাকে দেখব!"

“তবে ফের।”

মির্চা ফিরল। কিন্তু মুখ তুলছে না, মুখ নিচু করে আছে—আমাকে দেখবার জন্য এখনও প্রস্তুত নয়। আমি মিনতি করছি, “কেন তুমি আমার দিকে দেখছ না? তুমি যে তোমার বইতে লিখেছ, যে দিন আমার সঙ্গে দেখা হবে আমার চোখের দিকে তাকাবে, সে কথা ভুলে গেলে ?”

“সে তো অনেকদিন আগের কথা। চল্লিশ বছর, হায় চল্লিশ বছর।”

“জান লোকে আমায় জিজ্ঞাসা করে কতদিন তুমি আমাদের বাড়িতে ছিলে—আমার মনে পড়ে না—কতদিন ছিলে বল তো?”

“হাজার বছর—”

“তবে? তবে তুমিও কি জান না তুমি কে, আমরা কি? আমি তো সেই তোমাকেই দেখতে এসেছি যাকে weapon cannot pierce, fire cannot burn—শস্ত্র ছেঁড়ে না অগ্নি দহে না যারে—”

ও সংস্কৃততে বললে, “ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে—'

“তবে? সে-ই তুমি, যার আদিও নেই অন্তও নেই—নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিমসেই তোমাকেই আমি দেখতে চাইছি—আমার দিকে একবার তাকাও। বিশ্বাস করো, এক মুহূর্তে তোমায় চল্লিশ বছর পার করে দেব—দেখবে আমরা সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি যেখানে প্রথম দেখা হয়েছিল। আমার দিকে তাকালেই তুমি অমর হবে মির্চা, অমর হবে।”

মির্চা মুখ তুলল।...আমি দেখলাম ওর চোখের দৃষ্টি স্থির। কি সর্বনাশ! যা ভয় করেছিলাম তাই হয়েছে—ওর চোখ দুটো পাথর হয়ে গিয়েছে। ও আর কোনো দিনও আমায় দেখতে পাবে না। কি হবে! কি হবে! হা ঈশ্বর উপায় কি! ও চোখে আমি তো আর আলো জ্বালতে পারব না। আমার হাতে তো প্রদীপ নেই—এত পথ চলতে চলতে কখন যে তেল ফুরিয়ে সলতে পুড়ে নিবে গেছে। ভয় পেয়ে আমি আর অমৃতা নেই—একজন মরণশীল মানুষ হয়ে গেলাম। ওর মতো ভাবতে লাগলাম—হায় চল্লিশ বছর—বড় যে দেরী হয়ে গেল—

একটা বুকভাঙ্গা কষ্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস হয়ে ঘরের মধ্যে পাক দিয়ে ঘুরছে, এবার আমি পিছন ফিরলাম। ঐ দরজার কাছে পৌঁছতে হবে। ঐ পিতলের হ্যাণ্ডেলটা ঘুরাতে হবে— তারপর দরজা খুলবে। আমি ঐ একই পথে হেঁটে হেঁটে শার্লির কাছে যাব। বইয়ের পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলেছি হঠাৎ পিছন থেকে মির্চার গলা শুনতে পেলাম—যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসছে—

“একটু দাঁড়াও অমৃতা— why are you breaking down now when you were so brave for so many years—এতদিন এত সাহস দেখিয়ে এখন তুমি ভেঙে পড়লে কেন? আমি বলছি আমি যাব তোমার কাছে, এখানে নয়, সেখানে গঙ্গার তীরে আমার সত্যস্বরূপ তোমাকে দেখাব, I will show you my real self on the shores of the Ganges...”

আমি নৈরাশ্যবাদী নই তাই এতক্ষণ আমার ভাঙ্গা বুকের মধ্যে আশার একটা টুনটুনি পাখি ডানা ভেঙে পড়ে ধুকধুক করছিল। মির্চার কথাটা কানে আসা মাত্র একটা কাণ্ড হল। সেই ছোট্ট পাখিটা হঠাৎ ফিনিক্স হয়ে গেল—ফিনিক্স পাখি কেউ দেখেছ? ঠিক এ্যালবাট্রস-এর মতো দেখতে—সেই বিরাট খগেন্দ্র তার শুভ্র বিপুল পক্ষ দুটি বিধূনিত করে আমাকে নিয়ে ঊর্ধ্বগামী হল, আর তখন ওর পড়ার ঘরের ছাদটা প্যাণ্ডোরার বাক্সর মতো খুলে গেল—দেওয়ালের বাধা চলে গেল, আর বইয়ের পাথরগুলো জলের ঢেউ হয়ে গেল, আমি জলকল্লোল শুনতে পেলাম।

আশার মায়ায় গড়া সেই ব্যাবৃতপক্ষ মহাপক্ষী লেক মিশিগান পার হয়ে অজ্ঞাত মহাদেশের দিকে যেতে যেতে আমায় বললে- ‘কোনো ভয় নেই অমৃতা, তুমিই ওর চোখে আলো জ্বালবে।”

আমি ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “কবে? কবে ?” সে বললে, “যে দিন ছায়াপথে তোমাদের দেখা হবে, তার তো আর বেশি দেরী নেই—”

অজো নিত্যঃ শাশ্বতঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।

এই আত্মা জন্মরহিত শাশ্বত ও পুরাতন
শরীরকে হনন করিলেও ইনি নিহত হন না



জন্ম ঃ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯১৪
মৃত্যু ঃ ৪ঠা ফেব্রুআরি, ১৯৯০

পরিচিতিঃ-

জন্মঃ- ১ সেপ্টেম্বর ১৯১৪ চট্টগ্রাম জেলা, ব্রিটিশ ভারত (বর্তমান বাংলাদেশ)

মৃত্যুঃ- ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ (বয়স ৭৫)কলকাতা, ভারত

শিক্ষাঃ- স্নাতক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

উল্লেখযোগ্য রচনাবলিঃ- উদিত,হিরন্ময় পাখি,ন হন্যতে (আত্মজীবনী মুলক উপন্যাস)

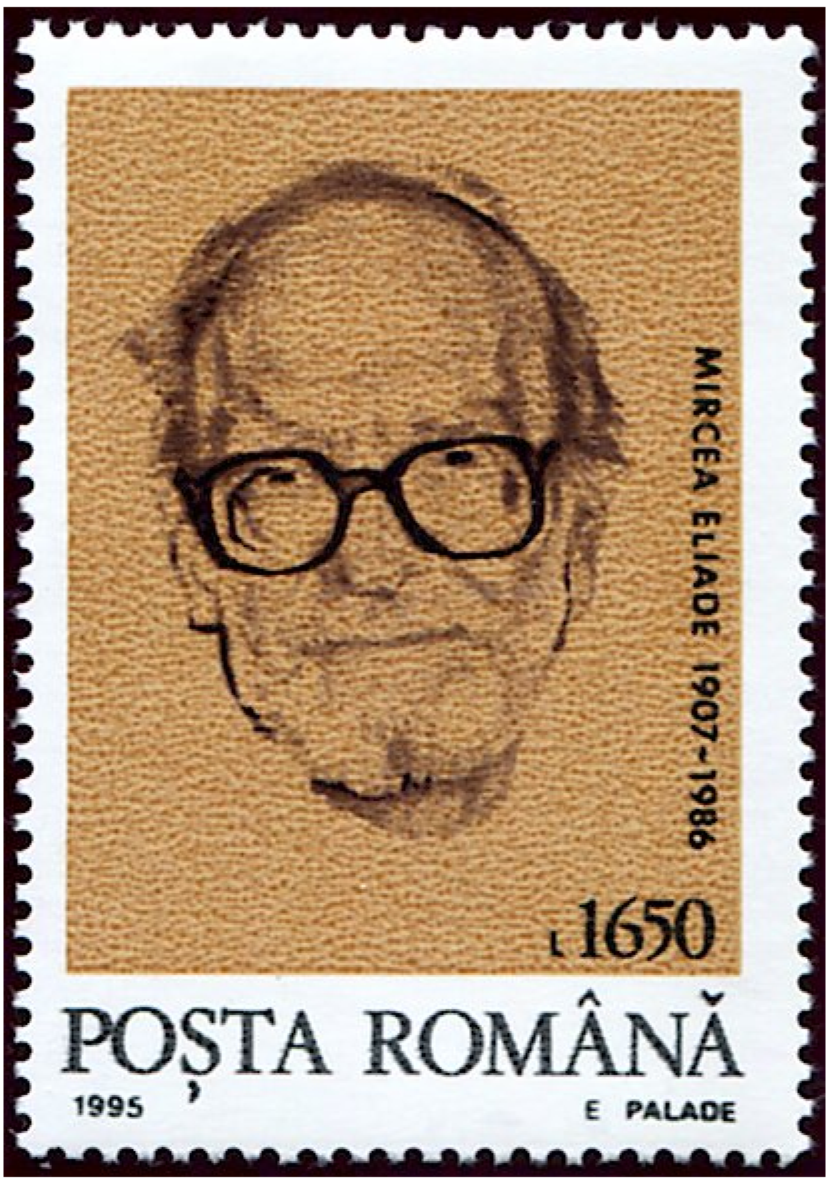
সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৭৬), পদ্মশ্রী (১৯৭৭), বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা (২০১২)

দাম্পত্যসঙ্গীঃ- (১৯৩৪-১৯৯০)বিজ্ঞানী ডঃ মনোমোহন সেন, মংপু তে কুইনাইন কারখানার ডিরেকটর।



In 1973, Devi arranged to be invited by the University of Chicago to give lectures on Tagore and showed up at Eliade's office unannounced. She had several meetings with him over the two months that she was there, condensing them into the one meeting described at the end of her book.


Mircea Eliade
1907-1986
3L
2007
MOLDOVA


MIRCEA ELIADE 1907-1986
L 1650
POȘTA ROMÂNĂ
1995
E PALADE

In 1941, Dasgupta allegedly had an affair with Surama Mitra, a very talented student who had been working with him for the previous ten years. The scandal created - according to some witnesses through actions of his daughter Maitreyi as revenge for her father prohibiting her relationship with Mircea Eliade - made Dasgupta to abruptly lose his family, friends, reputation and fame.

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ভারতের প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ও বোম্বে টকিজ-এর প্রতিষ্ঠাতা হিমাংশু রায়ের ভগিনী হিমানী দেবীকে বিবাহ করেন। তাদের ছয় সন্তান- তিন কন্যা ও তিন পুত্র। দুই লেখিকা মৈত্রেয়ী সেন (১৯১৪-১৯৮৯) ও চিত্রিতা দেবী (গুপ্ত) (১৯১৯-২০০১)। সর্বকনিষ্ঠা কন্যা হলেন সুমিত্রা মজুমদার। পুত্রেরা হলেন - শুভায়ু দাশগুপ্ত, সুগত দাশগুপ্ত ও অধ্যাপক শুভচারী দাশগুপ্ত। সর্বকনিষ্ঠা কন্যা সুমিত্রা মজুমদার ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে গোয়ায় মারা যান। অবসরের পর পারিবারিক অশান্তির জেরে অধ্যাপক দাশগুপ্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে হিমানী দেবীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হন। সেই সময় তাঁর সেবাশুশ্রূষার ভার নেন তার এক ছাত্রী সুরমা মিত্র(১৯০৭-১৯৯৮)। সুরমা ছিলেন ভারতের প্রথম মহিলা ডক্টরেট। অবস্থার পরিপেক্ষিতে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা বিবাহ করেন। স্ত্রী সুরমা বিবাহের পর গবেষণার জন্য লণ্ডনে যান। সেসময় সুরেন্দ্রনাথও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার আমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে যান। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে স্ত্রী সুরমা লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন-এর অধ্যাপিকা হিসাবে যোগ দিলে, সুরেন্দ্রনাথ লখনউ-এ বসবাস করেন।